Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

নন্দন

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

VOL-3 No-1

সম্পাদক

সুভো ঠাকুর

লেখক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবোধকুমার সান্যাল

পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শম্ভু মিত্র

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নীলকণ্ঠ

বিজন ভট্টাচার্য

কল্যাণ ভট্টাচার্য

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য

তিন টাকা

ডাক মাশুলের দরুণ

কলকাতার বাহিরে ৫

তিন টাকা

ছাপ্পান্ন নয়া পয়সা

শিল্পী সুভো ঠাকুর অঙ্কিত

প্রচ্ছদ-চিত্র "রকেট-বাহিনী"।

Once upon a time in ancient Hindusthan...

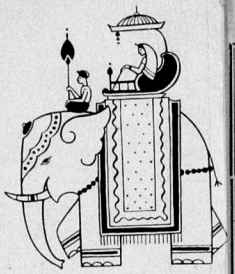

Thus begin the tales, heard at mother's knee,
conjuring up visions of kings and queens,
dressed in fine silk robes of exquisite designs,
riding out to breath-taking adventures on elephants
decorated with gay silk trappings. These
animal and human figures form part of the rich
storehouse of traditional Indian textile designs,
now being adapted by Priya Gopal Bishoyi
to suit the needs of modern taste.

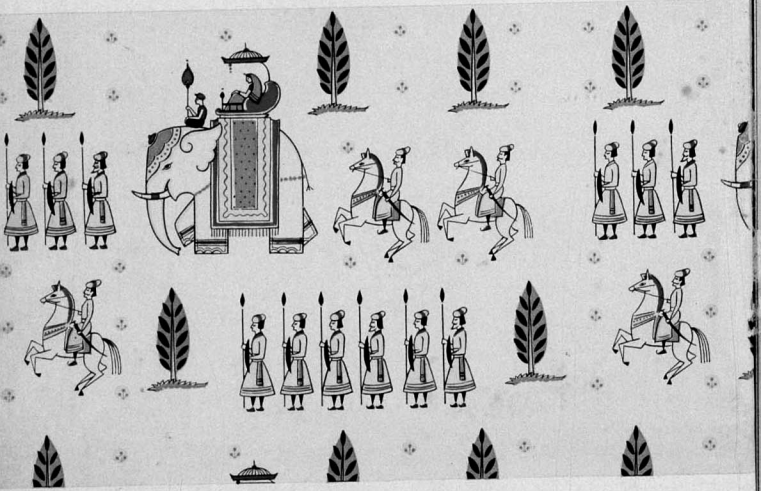

PRIYA GOPAL BISHOYI

ESTABLISHED IN 1862

Pioneer silk manufacturers of Bengal, originators of new and attractive designs and suppliers to all leading textile dealers.

70, KHENGRAPATTY STREET, CALCUTTA 7

Phone : 33-6402

Gram : RUMALIST

LALIT KALA ART PUBLICATIONS

* Popular
* Selective
* Quality Production

Already Published

Picture Cards : Set of 12 selected reproductions of Old Paintings in Post Card size.
Price Rs. 2.00 per set.

Mughal Miniatures—Rai Krishnadasa.
Krishna Legend—Dr. M. S. Randhawa.
Mewar Painting—Dr. Moti Chandra.
With short introductory text and plates in colour of rare and selected Paintings.
Price Rs. 10.00 each.

Portfolios : Contemporary Paintings. Nine Plates.
Price Rs. 8.75.
Ajanta Paintings. Twenty Plates.
Price Rs. 10.00.

Reproductions suitably mounted for ready framing.

Art Journal : Lalit Kala—Bi-annual.
Nos. 1 & 2 (Combined) Rs. 16.00.
Nos. 3 & 4 (Combined) Rs. 27.50 (Postage extra).

Pocket Books : Bendre.
Price Rs. 2.00.

" * *

All enquiries to the Secretary :

LALIT KALA AKADEMI

JAIPUR HOUSE NEW DELHI - 1

মেট্রিক পদ্ধতিটা কি?

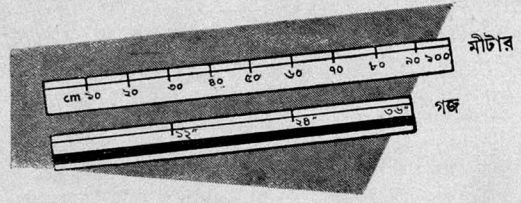

দৈর্ঘ্য মাপবার মূল একক মীটার থেকে মেট্রিক পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে। সমস্ত রকম দশমিক পদ্ধতির মতো এই পদ্ধতিতেও ১০ এর ভিত্তিতে হিসেব করা হয়। দৈর্ঘ্য, ওজন অথবা পরিমাণের যে কোন একককে আমরা একই ১০ সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করি।

মেট্রিক পদ্ধতিতে এককের গুণীতক, ডেকা (১০ গুণ), হেক্টো (১০ × ১০ = ১০০ গুণ), এবং কিলো (১০ × ১০ × ১০ = ১০০০ গুণ), এই উপপদগুলি দিয়ে বোঝানো হয়। এককের অংশগুলি, ডেসি (১/১০), সেন্টি (১/১০০) এবং মিলি (১/১০০০) এই উপপদ দিয়ে বোঝানো হয়।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ প্রবর্ত্তিত হচ্ছে।

মেট্রিক দৈর্ঘ্যগুলি জেনে নিন

দৈর্ঘ্যের মূল একক হোল মীটার
= প্রায় ৪০ ইঞ্চি
১ কিলোমীটার = ৫ ফার্লং

এককের অংশ
১০ মিলিমীটার = ১ সেন্টিমীটার
১০ সেন্টিমীটার = ১ ডেসিমীটার
১০ ডেসিমীটার = ১ মীটার

গুণীতক
১০ মীটার = ১ ডেকামীটার
১০ ডেকামীটার = ১ হেক্টোমীটার
১০ হেক্টোমীটার = ১ কিলোমীটার

DA-58/109

2

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সৌন্দর্যের সাধনায়

রূপসী রমণী মাত্রেই জানেন যে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারই সৌন্দর্য রক্ষা ও কমনীয়তা বৃদ্ধির সহায়তা করে।

অঙ্গরাগের জন্য বিশিষ্ট প্রসাধনী

প্রিয়া স্নো
ত্বক কোমল ও নির্মল রাখে

উষসী ফেস পাউডার
অভিজাত প্রসাধন রেণু

প্রিয়া সেন্ট্
অনবদ্য পুষ্পসার

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা * বোম্বাই * কানপুর

Phone : 23-3838

HIGH CLASS

PAINTS ENAMELS, VARNISHES
BRUSHES, DISTEMPER
BRONZE GOLD & ALUMINIUM PD.

ARTISTS' COLOURS & MATERIALS

A Speciality

ENGINEERING & SURVEY INSTRUMENTS
EDUCATIONAL DRAWING EQUIPMENTS
THEATRICAL AND CINEMA
MAKE-UP MATERIALS
DECORATIVE & HOME CRAFTS

FOR QUALITY
and SERVICE

G. C. Laha Pvt. Ltd.

LEADING ARTISTS' COLOURMAN

1, DHARUMTOLLA STREET,
CALCUTTA.

উৎসবের
অঙ্গ

PHILIPS ফিলিপস্

* * *

উৎসব মূর্ত হয়ে ওঠে আলো আর সংগীতে।
উৎসবের আনন্দ পরিপূর্ণ করে তোলে
ফিলিপ্‌স্‌-এর অগণিত শিল্প-সম্ভার।
ফিলিপ্‌স্‌-এর শিল্প-স্পর্শে আপনার উৎসব
মুহূর্তগুলি মধুর হয়ে উঠুক।

ফিলিপ্‌স্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

PSPH 87

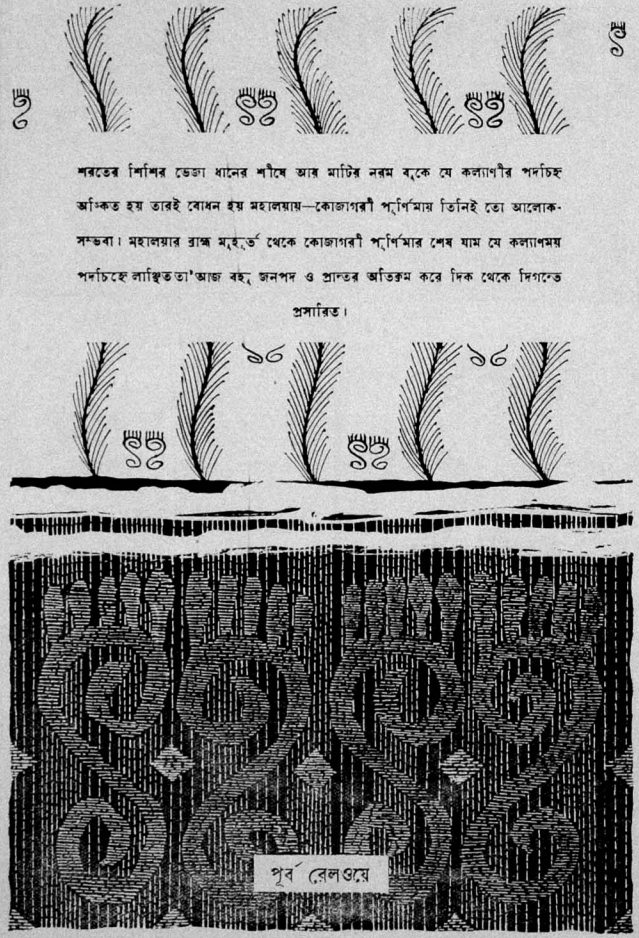

শরতের শিশির ভেজা ধানের শীষে আর মাটির নরম বুকে যে কল্যাণীর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় তারই বোধন হয় মহালয়ায়—কোজাগরী পূর্ণিমায় তিনিই তো আলোক-সম্ভবা। মহালয়ার ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে কোজাগরী পূর্ণিমার শেষ যাম যে কল্যাণময় পদচিহ্নে লাঞ্ছিত তা' আজ বহু জনপদ ও প্রান্তর অতিক্রম করে দিক থেকে দিগন্তে প্রসারিত।

পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি ব'লেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্লাভয়ের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেংস্নুঙ্ এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লিশস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলাণ্টিস (ইস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলাণ্টিস (ইস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

PTY 3084

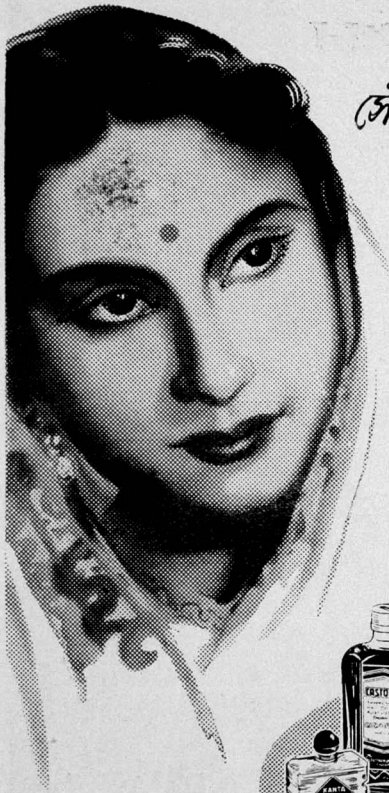

সৌন্দর্য্য সাধনায়...

শরতের নির্মল নীলাকাশের আলোর বাঁশীতে উৎসবের যে বার্তা আসে তাতে নরনারীর চিত্ত আনন্দমুখর হয়ে ওঠে।
নিজেকে ঐ পরিবেশের অনুকূল সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তোলবার আকাঙ্খাও জাগে সকলের মনে।
ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রীগুলি নরনারীর সৌন্দর্য সাধনায় বিশেষ সহায়ক।

- **লাবণি** স্নো এবং ক্রীম
- **মলয়** চন্দন সাবান
- **ক্যাষ্টরল** সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েল
- **কান্তা** মরমিয়া সুরভিসার
- **রেণুকা** ফেস ও ট্যালকাম পাউডার

প্রস্তুতকারক
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ
কলিকাতা ২৯

"Asses are not our companions!" Thus do the *Kuchigers* of Central and North India quickly distinguish themselves from the *Golekumhers*, makers of household earthenware, who travel from village to village with their merchandise loaded on donkeys. The *Kuchigers* are the proud moulders of clay dolls and images. They choose for subjects kings and queens, soldiers and lovers, as well as common human figures. The toys are given a coating of white and then brightly coloured. Indore is a large centre for the making of such toys and they are to be seen in profusion during festival days spread out for sale beside the city streets.

CAVALIER ON HORSEBACK

To see the toymakers of Central and North India at their work is one of the pleasures of motoring through the country.

DUNLOP

Founders of India's Tyre Industry

You see so much more when you go by road!

DC-506

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল সচল হয়ে
ছুটেছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

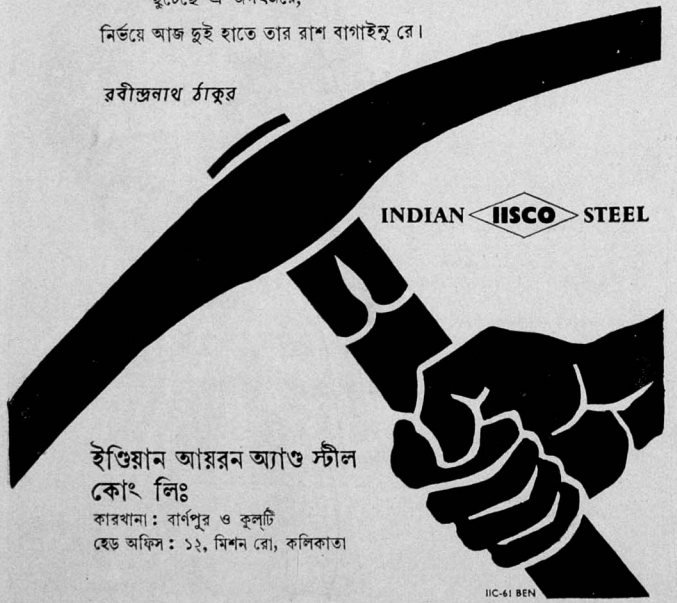

ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ
কারখানা : বার্ণপুর ও কুল্‌টি
হেড অফিস : ১২, মিশন রো, কলিকাতা

IIC-61 BEN

আপনার ত্বকও

চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে

অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী সৌন্দর্য্যের জন্যে কি করেন শুনুন। "আমার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখার জন্যে," তিনি বলেন 'আমি প্রতিদিন লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি।" স্নানে ও হাতমুখ ধুতে লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করা সত্যিই আনন্দদায়ক—লাক্স সাবানটি এত কোমল, এত সুগন্ধী। আপনিও আজ থেকেই লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিতে আরম্ভ করুন না কেন?

বিশুদ্ধ, শুভ্র
লাক্স
টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 569-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

Let

your

Savings g·r·o·w

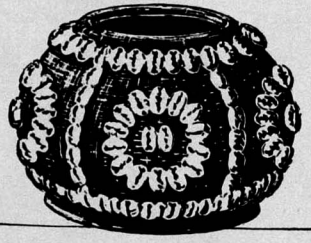

with

United Bank of India Ltd.

HEAD OFFICE: 4, CLIVE GHAT STREET, CALCUTTA-1

UBI-1-57

আপনার জীবন-বীমা
এজেণ্টের সঙ্গে
দেখা করার
এই তো সময়

থোকন সোনা, চাঁদের কণা। এমন থোকা বুঝি আর কারও নেই—গর্ব ও সুখের অন্ত নেই থোকাকে নিয়ে আপনার। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন তার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আপনার আজকের দূরদৃষ্টির জন্য আপনাকে নিয়েই তার গর্ব ও সুখের অন্ত থাকবে না। আপনার সন্তানের পরবর্তী জীবনে শিক্ষার ব্যবস্থা জীবন-বীমার সাহায্যে আপনি সম্ভব করতে পারেন। শিশুদের 'ডেফার্ড এন্ডাউমেণ্ট' বীমাদ্বারা তার সংসার জীবনে প্রবেশ পথ সুগম হবে। আপনার জীবন-বীমা এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করার এই-ই তো উপযুক্ত সময়! তিনি আপনার নয়নের মণি থোকার জন্য যথাযথ বীমা-নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনার এজেণ্টের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিন্।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

LIC-3C BEN

AERONAUTICAL SERVICES LIMITED.

Manufacturers of **GLIDERS** and Aircraft Components
AIRCRAFT Overhaul & Repairers

AIR SURVEY COMPANY
OF INDIA PRIVATE LIMITED.

AERIAL PHOTOGRAPHY & SURVEY
MOSAIKING
GEOPHYSICAL EXPLORATION
AIRCRAFT INSTRUMENT & ENGINE OVERHAUL

AIRWAYS (INDIA) LIMITED

AIR TRANSPORTATION

31, CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA-12

Telegram
AIRAID

Telephone
23-2602/03

৩টি কারণে

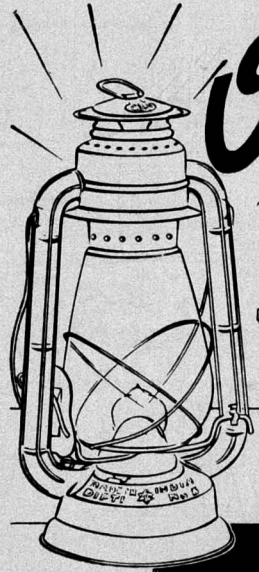

আজ
বেশির ভাগ
লোক কিনছেন

দীপ্তি

কেরোসিন
খরচ কমায়

গভর্ণমেণ্ট প্রশংসাপত্রানুযায়ী প্রতিটী দীপ্তি লণ্ঠন আপনাকে ৬টি বৃটিশ মোম বাতীর সমান আলো দেবে এবং এ আলো ধূম বর্জ্জিত হবে।

কখনও
খারাপ হয় না

আপনি যখনই কোন লণ্ঠন কিনবেন "দীপ্তি" কিনতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন যে "দীপ্তি" লণ্ঠন কিনলে এর কলকব্জা বিগড়োবার ভয় থাকে না। তাছাড়া নূতন "বারণার" আবিষ্কারের ফলে এর কেরোসিন খরচা ২০ ভাগ কমে গেছে। এর গঠন শুধু মজবুত নয় দেখতেও ভারি সুন্দর। জল ঝড় আর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সবরকম ঋতুতেও এর রং সুন্দর থাকে কারণ খুব ভাল আর দামী রং ব্যবহার করা হয়।

গঠনে শক্ত ও
মজবুত
দামে সস্তা

দীপ্তি লণ্ঠন
লক্ষ লক্ষ গৃহ
আলোকিত করে

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

হেড অফিস্: ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফ্যাক্টরী: আগড়পাড়া এষ্টেট

Progressive OM.3.Beng

বৈশিষ্ট্যে
ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয়...

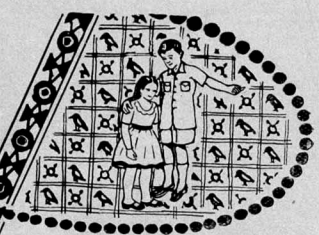

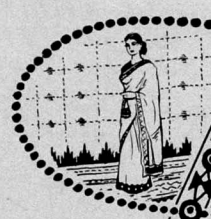

তন্তুজ

কাপড় কিনুন

বর্ণের সমারোহে,
বৈচিত্র্যের অভিনবত্বে,
বয়ণনৈপুণ্যে ও নক্সার
বাহারে **'তন্তুজ'** বস্ত্রের
তুলনা নেই। ঐতিহ্য ও
ও শিল্পচাতুর্য একে অপরূপ
বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

'তন্তুজ'
তাঁতের কাপড়

- বেশিদিন টেঁকে
- সকল পরিবেশেই শোভনীয়
- সকলের উপযোগী

**ওয়েষ্ট বেঙ্গল উইভার্স
কো-অপারেটিভ মার্কেটিং
সোসাইটি লিমিটেড**

১০, নির্মল চন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ (ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট)

With Compliments of :

THE BEHAR FIREBRICKS AND POTTERIES LTD.

Manufacturers & Exporters of
Quality REFRACTORIES for over 35 years.

Office :

22, STRAND ROAD,
CALCUTTA - 1

Works :

MUGMA P. O., E. RLY.,
DT. DHANBAD

Gram: 'FIREBRICKS', MUGMA.
Phone: Barakar 41.

Gram: 'BANCO', CALCUTTA.
Phone: 22-5952
22-3101

সব দেশেই সমাদৃত

সুনিপুন শিল্পপ্রতিভায়

মৌলিকতায়

আধুনিকতায় ও নির্ভরতায়

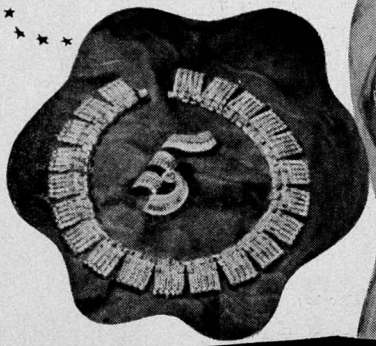

গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

হ্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১. বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ডিলিয়ান্টস

ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/১/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬

সোকানের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১,বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর - ৮৫৮

বাংলার কারুশিল্প

বাংলার কারু শিল্প চারুকলার অপূর্ব নিদর্শন। ন্যায়সঙ্গত দর বলে তার কদরও হওয়া উচিৎ ঘরে ঘরে। এ সব জিনিস শুধু যে সংগ্রহশালার গৌরব বৃদ্ধি করে তা নয়, গৃহের সৌন্দর্য্য ও সকলের আনন্দ বর্ধনেও এর তুলনা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

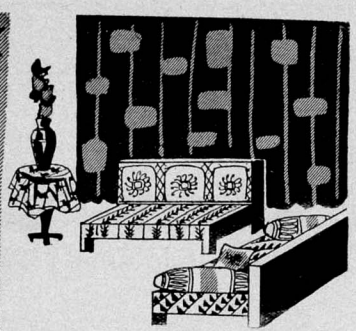

প্রসাধিকের অপরিহার্য্য মনোনয়ন

আধুনিক মন, গৃহসজ্জায় হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী ব্যবহার করে আনন্দ পায়। আধুনিক ও প্রাচীন নক্সায় সমৃদ্ধ এই বস্ত্রসামগ্রী, অতি সাধারণ গৃহকেও রমনীয় করে তোলে, নয়ন বিমোহন রঙ্গে পরিপূর্ণ করে তোলে।

ভারতের হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী শুধু রঙ্গের ঔজ্জ্বল্যের জন্যেই প্রসিদ্ধ নয়। বহু ব্যবহারেও এগুলির বুনানী বা রঙ্গের উজ্জ্বলতা কমেনা। কাজেই আধুনিক অফিসগৃহ, সুরুচি-সম্মত হোটেল, ক্লাব এবং বাড়ী সাজাবার জন্য, প্রসাধকগণ যে তাঁতের কাপড়ই বেশী পছন্দ করছেন এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

তাঁতের কাপড়

জীবনকে উজ্জ্বলতর করে

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড
শাহীবাগ হাউস, উইটেট রোড, বোম্বাই

DA-FO/221

উদয়ভিলা

বাংলার হস্তশিল্পে সমৃদ্ধি এনেছে

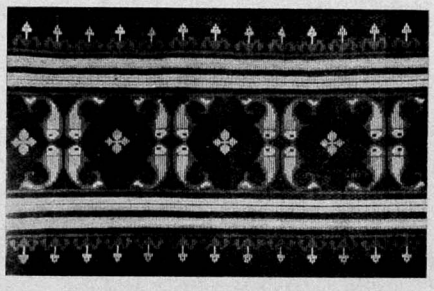

নারী সমবায় শিল্পাশ্রম

উদয়ভিলা, কামারহাটী, ২৪ পরগণা

ফোন : পানিহাটী ২৬৬, ২০৯

FOR HARDWARE, METAL AND MACHINE SPARES.

Please ask :

A. K. Nandy & Co. Private Ltd.

MANUFACTURERS, HARDWARE & METAL MERCHANTS

59, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA.

• শারদীয় •

সাদর সম্ভাষণ

সুস্থ ও সানন্দ উৎসবে এবারের পূজা

সার্থক হোক

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কলকাতা - ১৪

বাংলার গৌরব

উৎকৃষ্ট রেশম, গরদ, মটকা, বাপতা

ও

অন্যান্য খাদি বস্ত্রাদি এবং কুটীর শিল্পজাত সামগ্রীর

অভূতপূর্ব্ব আয়োজন!

আপনার

—শুভ-পদার্পণ—

প্রতীক্ষায়!

পশ্চিমবঙ্গ রেশমশিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

প্রধান কার্য্যালয় এবং বিক্রয়কেন্দ্র ঃ—

১২।১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১

অন্যান্য বিক্রয়কেন্দ্রসমূহঃ—

(১) ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

(কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নিকট)

(২) ১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

(গড়িয়াহাট)

(৩) ১১এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১৩

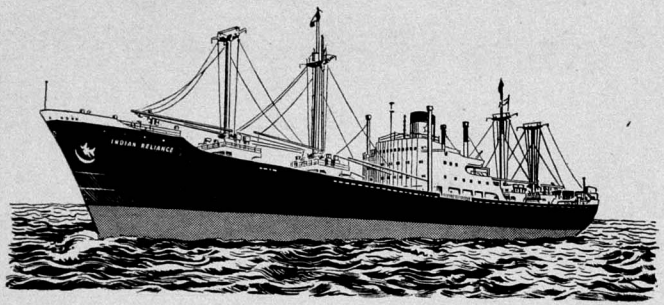

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিমিটেড

ভারত-যুক্তরাজ্য ও কন্টিনেণ্ট

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল

আমাদের উপকূলগামী জাহাজগুলি কলিকাতা, মাদ্রাজ, টিউটিকোরিন, কোচীন, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রধান উপকূল-বন্দরে নিয়মিত মাল বহন করে।

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্:

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন: ২৩-১১৭১ (৮টি লাইন)

আসামের কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যাদি

নির্মাণকুশলতা এবং মূল্যমানের বিচারে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

এই শিল্পদ্রব্যাদি হল:

বিবিধ নকশার রেশমবস্ত্র এবং সুতির কাপড়।
কাঁসার এবং পিতলের কাজ।
খোদাই-করা হাতির দাঁতের কাজ।
বেত এবং কাঠের কাজ।

আসামের কুটীরশিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে প্রগতিশীল শিল্প-সংস্থাগুলির শিল্প-ও-ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটিয়ে এসেছে। আসামে রেশম ও সুতি বস্ত্রের শিল্পীদের, কাঁসা ও পিতলের কারিগরদের এবং হাতির দাঁতের শিল্পীদের খ্যাতি আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এদেশের পুরানো (সাবেকী) কারিগরের ছেলেদের এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের আধুনিক পদ্ধতিতে কাঠের কাজ, ধাতুশিল্প, চামড়ার কাজ, বাঁশ-ও-বেতের কাজ, মাটির কাজ, কাগজ তৈরীর কাজ, পুতুল-ও-খেলনা তৈরীর কাজ, মাদুর বোনার কাজ, মৌমাছি সংরক্ষণের কাজ, তৈল বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের কাজ ইত্যাদি হরেকরকম কুটীরশিল্পে পারদর্শী করে তোলার জন্য কুটীরশিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়েছে।

রাজ্য সরকার কুটীরশিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নাম-করা বেসরকারী কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন শিল্পে যুবকদের শিক্ষিত করে তোলার কাজে নিযুক্ত, রাজ্য সরকার তাদের সরাসরি অর্থ সাহায্য করা ছাড়াও সুবিধাজনক হারে টাকা ধার দিয়ে থাকেন।

কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত এইসব জিনিস সুব্যবহার্য, টেকসই এবং সস্তা।

বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ:

সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র	আসাম সরকারের বিক্রয়কেন্দ্র	সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র
জোড়হাট ও ডিব্রুগড়	**৮, রাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা**	**গৌহাটি ও করিমগঞ্জ**

পূজা উপলক্ষে বিশেষ সুযোগ

আরো তাঁতের কাপড় কিনুন

যাবতীয় তাঁতের কাপড়ে
প্রতি টাকায় ১২ নয়া পয়সা
ছাড় দেওয়া হবে।
১৫ই নভেম্বর ১৯৫৮ পর্যন্ত
এই সুবিধা দেওয়া হবে।

●

উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ
হ্যাণ্ডলুম সেলস ডিপো,

কর্নাজউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স
এবং
গভর্নমেণ্ট সেলস এম্পোরিয়া

এই সকল স্থানে
উপরি-উক্ত তাঁতের কাপড়
কিনতে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি,—হাসি খুসির মেলা

সুপ্রসিদ্ধ কোলে RB বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক
আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১০

সুন্দরম্ সূচীপত্র

সুভো ঠাকুর	সম্পাদকীয়	কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	কবি-স্থপতি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঙালীর সংস্কৃতি ও সমস্যা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ছবি | চিত্রায়ন: বিনয় সরকার
অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	আচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্রায়ন সৃষ্টি	নীলকণ্ঠ	কিতাবপট্টি
প্রবোধকুমার সান্যাল	ইলাকা জয়শলমের	বিজন ভট্টাচার্য	রানী পালঙ্ক চিত্রায়ন: বিজন চৌধুরী
পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	কেন্দুলির মেলায় মকর-স্নান	কল্যাণ ভট্টাচার্য	পিকাসো
শম্ভু মিত্র	চর্চা ও শিল্পসম্ভোগ	ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীগৌরী
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	কবিতা	সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়	খেয়াল গানের ইতিহাস

অঙ্গসজ্জা: রণেন আয়ন দত্ত। **সহকারী:** বাদল ধর, প্রিয়গোপাল ভট্টাচার্য।

প্রকাশক ও মুদ্রক: সুভো ঠাকুর। চুয়াল্ল, গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু, কলকাতা-তেরো। মুদ্রণ: গসেন অ্যান্ড কোং (প্রিন্টার্স) প্রাঃ লিঃ ৭।১, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-বারো।

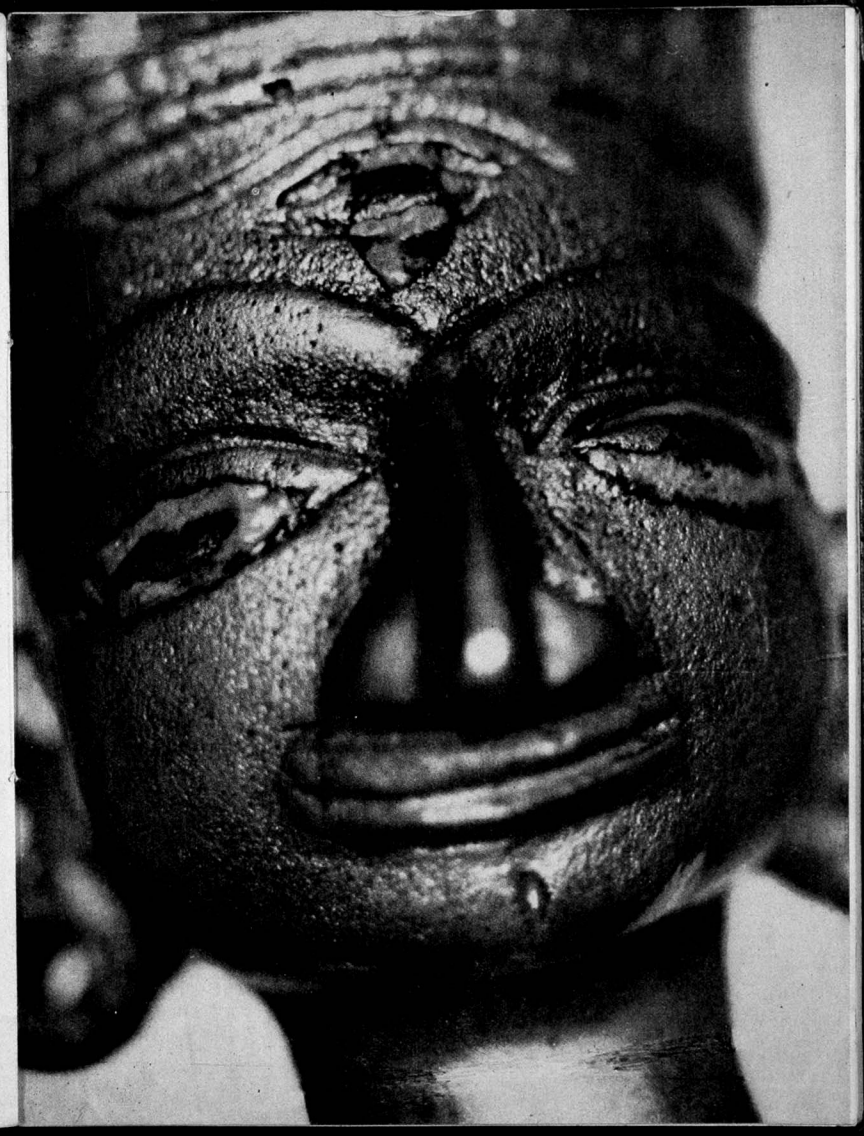

সুভো ঠাকুরের সংগ্রহের একটি দুষ্প্রাপ্য ও সুপ্রাচীন ধাতব দুর্গা-মূর্তি। মূর্তির মুখে আদিবাসী-দের শিল্প শৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়।

সুন্দরম্ সম্পাদকীয়

সুভো ঠাকুর সুন্দরম্‌কে এই শারদীয়া সংখ্যা নিয়ে আজ অবধি সগৌরবে তিনটি শরৎ পার কোরে আনলো। কিন্তু এবার সত্যি সত্যি দস্তুরমতো ও' দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর কিছুর জন্য নয়—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অদূর ভবিষ্যতে বাংলার সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ কল্পনা কোরে।

পত্রিকা প্রকাশন বা কাগজ বের করা, ও তাকে পুনরায় বন্ধ করা, অর্থাৎ উঠিয়ে দেবার ব্যাপারে, জোড়া-সাঁকো ঠাকুর বংশের যে বংশগত অধিকার, তা কুত্রাপি অন্য কারও আছে বোলে অজ্ঞাত। এক্ষণে গ্রহনক্ষত্রের ষড়যন্ত্র হেতু, অথবা আধিদৈবিক কারণ বশতঃ, সুভো ঠাকুরের যখন সেই বংশজাত হোয়ে আকস্মিক প্রাদুর্ভাব, তখন অধুনা তলায়মান সেই ঠাকুর পরিবারের তলদেশে নিতান্তই তলানির ন্যায় বিরাজিত হোলেও, এ ব্যাপারে ওরও হাতযশ কিছু কম্‌তি যায় না।

ওর হাতে-খড়ি যে কাগজ প্রকাশনে, তার নাম ছিল 'প্রভাত'—অবশ্য সেটা হাতে-লেখা কাগজই ছিল। কিন্তু তাও দুমাস পরে উঠে যায়। তখন ও'র বয়স বোধ হয় দশ কি এগারো অথবা এগারো কি বারো হবে। যাই হোক, তারপর থেকে ছাপার হরফে 'চতুরঙ্গ' (হুমায়ুন কবির সম্পাদিত চতুরঙ্গ নয়) 'ভবিষ্যৎ', 'অগ্রগতি', 'অতিক্রমা'— কত কাগজই না প্রকাশিত হোয়েছে, আর উঠে গেছে। তাদের আয়ুষ্কাল দু মাস থেকে দু বছরের মধ্যে। এর মধ্যে একমাত্র সচিত্র সাপ্তাহিক 'অগ্রগতির' আয়ুষ্কালই সবচেয়ে বেশী ছিল। ও' বিলেত চলে যাওয়ার পরেও ওর বন্ধুদ্বয় আশু চট্টোপাধ্যায় ও বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পরিচালনা ও সম্পাদনায় প্রায় চার বছরের চৌহদ্দি ছুঁতে সক্ষম হোয়েছিল 'অগ্রগতি'। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে 'অতিক্রমা' নামে যে পত্রিকাটি সুভো ঠাকুর ও শিল্পী রথীন্দ্রনাথ মৈত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, সেটি মাত্র একটি সংখ্যা বার হোয়ে বন্ধ হোয়ে যায়।

সুভো ঠাকুর বলে, সৃষ্টির আনন্দ গড়ার মধ্যে যেমন অগোচরে বিদ্যমান, ভাঙার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে সে তেমনি। আবহমানকাল থেকে ভাঙার মধ্যেই বীজের আকারে গড়ার স্বপ্ন বিরাজিত। যে ভাঙতে জানে, সেই আদতে গড়তে জানে—যে গড়তে জানে, সেই একমাত্র ভাঙার অধিকারী।

তাই সুন্দরম্ এখন যদি বন্ধ হোয়ে যায় তবে আফশোষের কি আছে? সুভো ঠাকুরের সম্পাদিত, লোকসানের এই সুন্দরম্ বন্ধ হোয়ে গেলে, নতুন সুন্দরম্ আরও যুগোপযোগী সুন্দরতর হোয়ে অন্য কোথাও অন্য কোনোখান থেকে—অন্য কোনো সুভো ঠাকুর না হোক, শুভ চৌধুরী, শুভ সরকার অথবা শুভ সিংহ ব্যবসায় লাভজনক উত্তম-অধমের নানাবিধ কতো সুচিত্র-কুচিত্র ছেপে, সেই সুন্দরম্‌কে কার্যকারিতায়, আরও কতো-না কৃতকার্যতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

কিন্তু সুভো ঠাকুরের পক্ষে সবচেয়ে মুস্কিল, সবচেয়ে বেশী গণ্ডগোল ঘটার সম্ভাবনা, ঐ 'যুগোপযোগী' ও 'লাভ-জনক' শব্দদ্বয় নিয়েই তো। ঐ শব্দদ্বয় নিয়েই তো জানি, অন্যপক্ষের সঙ্গে ওর তুমুল তক্‌রার লাগার সম্ভাবনা। নতুবা, সুন্দরম্‌কে লাভজনক, যুগোপযোগী করার প্রস্তাবনায় আসমুদ্র অন্তর্দ্বন্দ্বের তোলপাড় করা ঝঞ্ঝায় ও' অনন্যোপায় ভরাডুবি হোয়ে যাবে—তবুও ঐ ধরনের প্রস্তাবনায় রাজী হবে না। লাভের জন্য যুগোপযোগী কোরে কাগজ চালানো ওর পক্ষে তো দূরের কথা, এমন কি ওর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের পক্ষেও সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। কারণ ঠাকুর পরিবারের লোকেরা আজ পর্যন্ত যুগোপযোগী কোরে কোন কিছুই কোরতে সমর্থ হয়নি, পরন্তু তাদের নিয়েই তো যুগ তৈরী হোয়েছে এবং যুগান্তর ঘটেছে।

এই যুগপ্রবর্তনের পরিকল্পনা নিয়ে বারম্বার যে সব-কাগজগুলি প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে, প্রকাশিত হোয়েছে, সফলকাম হোয়েছে তাদের স্বীয় আদর্শে, আজ তাদের অদর্শন একান্তই স্বাভাবিক। কারণ স্বধর্ম-সাধন-শেষে প্রতিবারেই তাদের অবসান ঘটেছে। পরিকল্পনা

পূর্ণতা পাবার পর কাগজ বেঁচে থাকলে, তা থাকে তখন কেবলমাত্র বণিকবৃত্তি বা বাণিজ্যের প্রলোভনে।

সাময়িক পত্রিকার ব্যাপারী হওয়া, আর যুগ-পরবর্তন করা এক জিনিস নয়। এই কারণেই যুগ-পরবর্তনকারী 'বঙ্গদর্শন' আজ আর নেই। 'বালক', 'সাধনা', 'ভারতী' সব কটি কাগজই আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে। এমন কি এযুগের এই 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'পূর্বাশা'—আধুনিক বাংলার সমকালীন সাহিত্যকে যেসব কাগজ কোলেপিঠে মানুষ কোরলো, তারাও আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে হয়তো বাণিজ্যের দিক দিয়ে দুপয়সা আমদানী হবার আশা ছিল কিন্তু মরে যাওয়াই অথবা উঠে যাওয়াই তাদের পক্ষে হোয়েছে আজ শ্রেষ্ঠ সম্মান। সর্বসহা সর্ববহা ডবল-ডেকারি ওয়্‌নিবাস-মার্কা কয়েকটি সাময়িক পত্রের কথা বাদ দিয়ে, এইরকম আদর্শবাদী সব কাগজই অর্ধাভাবে অনটনে অকালে উঠে যেতে আদিষ্ট। নতুবা সেই সব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকরা কল্লোল-কালীন গোকুল নাগের দশা প্রাপ্ত হবার পথে দিনে দিনে গোকুলে পা বাড়াতে বাধ্য।

যাই হোক, নানা অবান্তর কথার অপর্যাপ্ত আমদানী হলেও আদৎ কথাটা সুরু হোয়েছিল কিন্তু সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ অবলোকনে সুভো ঠাকুরের একান্ত দুশ্চিন্তা নিয়ে। আধুনিক পত্র-পত্রিকার ঘোর অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কোরতে গিয়েই না—ওকে কেন্দ্র কোরে অতীতের অনেক কথা এলোমেলো এসেছিল গিয়েছিল—ঝিলমিল কোরেছিল চোখের সামনে।

সুভো ঠাকুর বলে, ইদানীংকার সাময়িক পত্র-পত্রিকার বহির্ভাগের এবং আভ্যন্তরীণ চেহারা—একমাত্র ও' কেন, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই দুশ্চিন্তার খোরাক জোগাতে বাধ্য। যাঁরা দেশকে এবং দেশের সাহিত্য-শিল্পকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁদের সেই সাহিত্যের ও শিল্পের ধারক ও বাহক, সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রতিও আগ্রহশীল হওয়া অতিশয় স্বাভাবিক।

অধুনা সেই সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে থেকে অতীব প্রচারিত কয়েকটি পত্রিকার আগাপাস্তালা অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ অবধি, নানা অছিলায় চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা ভঙ্গীর ছবিতে-ছবিতে ছয়লাপ! কখনও তাদের শরীর-চর্চার ছুতোয়, কখনো বা স্নানাগারের সামনে বিশেষ ভঙ্গীতে বিশেষ সলজ্জ (?) সজ্জায় দণ্ডায়মান—নানারূপ রঙিন ও এক রঙা আলোক চিত্রের এবম্বিধ অপূর্ব পসরা সাজিয়ে, উৎকৃষ্ট সাধারণের আরও উৎকৃষ্ট মনের উর্ধ্বলোকীয় মনস্তত্ত্বের তন্ত্রীতে, ঈষৎ সুড়সুড়ি প্রদানপূর্বক কিঞ্চিৎ অর্থের আমদানী কোরে থাকেন, ঐ সব পত্র-পত্রিকার কর্তাব্যক্তিরা।

সুভো ঠাকুর বলে, এঁরা অর্থের আমদানী করেন সে অতীব উত্তম কথা—সভ্যতার অতি-প্রাচীন ইতিহাসেও দেহ বিক্রয় কোরে অর্থের আমদানী করার নজীর দেখা যায়; এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের কথা হয় তখনই, লজ্জার কথা হয় তখনই, যখন গেণ্ডুলির মধ্যে সাহিত্যের ঘুষ দিয়ে সতীপনার ভান করা হয়।

অটুট স্বাস্থ্যের নিদর্শনস্বরূপ কেউ যদি নিরাবরণ দেহের সাবলীল চিত্র প্রকাশ করেন, তাতে আপত্তির কিছু নেই। বিদেশী বিখ্যাত শিল্পীদের নগ্নদেহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি—অসংখ্য নিদর্শনস্বরূপ তাঁদের শিল্পসম্ভার থেকে দেখানো যায়। নিরাবরণ দেহের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্যের প্রতি শিল্পীদের অর্ঘ্যদান আর রিরংসা-রঞ্জিত বিশেষ ভঙ্গীতে নেওয়া সিনেমা-জগতের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অঙ্গভঙ্গী সহ অর্ধ-উন্মুক্ত দেহের আলোকচিত্র কি এক বস্তু? আধুনিক বাংলার অতি-প্রচারিত পত্রিকাগুলির উচ্চমার্গের শ্রেষ্ঠতম শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন কিন্তু তাই! এইরূপ-রিরংসা উদ্রেককারী চিত্রের সহিত আবার ফাউস্বরূপ বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সাহিত্য-সৃষ্টির উপঢৌকনের যোগ-সালিসে এইসব নব সিনেমা-সাহিত্য-পত্রিকার যে রূপ প্রকটিত—তা দিবালোকে স্থির-মস্তিষ্ক লোকের বিস্ফারিত চোখে আতঙ্কের সৃষ্টি করে মাত্র।

এইসব পত্রিকায় সাহিত্যসমাজের হোমড়া-চোমড়া সমাজপতিগণ যাঁরা দিকে দিকে ন্যায়ের এবং অন্যায়ের, সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের মাহাত্ম্য ও তার মাপকাঠির কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সচরাচর প্রচার কোরে থাকেন, তাঁরাই (মনে রাখবেন, একান্ত অভাবের তাড়নায় নয়) অর্থের লোলুপতা বশতই শুধু নিজের নয়, দেশের ও দশের নিকট সাহিত্যের একগালে চুণ এবং আরেক গালে কালিমা লেপনপূর্বক দুপয়সা প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় তার সম্মানের মুকুট ধূলায় লুটিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা দ্বিধাগ্রস্ত নন।

তথাকথিত সাহিত্যিকদের এইরূপ লোলুপ স্বভাবের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণপূর্বক ঐসব পত্র-পত্রিকার স্বত্বাধিকারীরা ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট মোসাহেবস্বরূপ অর্বাচীনরা, তাদের কুলপতির অর্থের অহংকারে আটখানা—বাংলাদেশের সম্মানীয় সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আস্ফালনপূর্বক যেসব মধুর মন্তব্য কোরে থাকেন, তা লেখায় তো দূরের কথা—ফীটন-চালকরাও তা উচ্চারণ করতে লজ্জা পাবে।

এইসব সিনেমা-সাহিত্য-পত্রিকাগুলির কর্তারা সাহিত্যকে ঘুষ হিসাবে ব্যবহার করার মনোবৃত্তিতে স্বনামধন্য তিনটি লেখকের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের ও দশটি ছোট গল্পের ফাঁদ পেতে, অজ্ঞ পাঠকদের রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিনেমার বিজ্ঞাপনের ন্যায় বিজ্ঞাপনের ফাঁসে ফাঁসিয়ে, যে চালে এগিয়ে চলেছেন, তাতে সামনে বছর শারদীয়ায় দেখা যাবে—খান ইঁট অথবা পঞ্জিকার আকারের এই সব পত্রিকাগুলি পাঠকদের, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের তিনটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে ও দশটি ছোট গল্পেও সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছেন। এবং পঞ্জিকায় প্রকাশিত দাদের মলমের বিজ্ঞাপনের ন্যায় এইসব পত্র-পত্রিকারও বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাবে যে—তিন টাকা দিয়ে একটি পত্রিকা কিনলে তার সঙ্গে একটি রোল্ড গোল্ডের হাতঘড়ি, একটি ফাউন্টেন-পেন ও স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের তিনখানি কোরে উপন্যাস পুস্তক আকারে উপহার পাওয়া যাবে।

এরপর সুভো ঠাকুর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর পূর্বে সাময়িক পত্র সম্পাদনায় অথবা প্রকাশনার সূত্রে অভিজ্ঞতা-বশত দ্বিধায়, দুশ্চিন্তায়, স্বীকার কোরতে বাধ্য হয় যে—সেদিনের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা অনেক বেশী আদর্শবাদী, অনেক বেশী নিঃস্বার্থ, অনেক বেশী নির্লোভ ছিল। তখনকার দিনে এমন-কি অখ্যাত-নামা কোনো সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত অজ্ঞাত লেখকের লেখা নিয়েও চায়ের দোকানে তুমুল তর্কের ঝড়, আর আলাপ আলোচনা চলতো। বড় সাহিত্যিকদের, অখ্যাত সাহিত্যিকদের ভালো লেখা সাগ্রহে পড়ে আরো দশ জনের নজরে আনার উৎসাহে অনেক বেশি আগ্রহান্বিত হোতে দেখা যেত। সেখানে আজ সাহিত্যিক-মহল থেকে সাহিত্যরসিক-মহলেও কাগজ অথবা পত্রিকা দেখলেই প্রথমেই তার কপাতা বিজ্ঞাপন এবং কতো সারকুলেশন তাই নিয়েই চলে গবেষণা, সাহিত্যের দলাদলি ব্যতীত সাহিত্যের আলোচনা আজ নিতান্তই উহ্য। জনসাধারণের নিকট সাহিত্যিকদের সমাদর তাই আজ বিরলতর, সম্মান নেই বোললেই চলে। সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে যুগ-নির্দেশক হিসাবে আর সাধারণের মন মানে না—তারা সাহিত্যিক-গোষ্ঠীকে ক্ষুদে ব্যাপারী-সম্প্রদায় হিসাবেই দেখে থাকে।

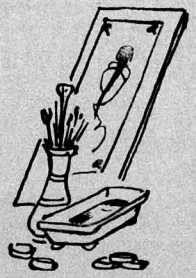

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বর্ণোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্র ও আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত। রাহুগ্রস্ত বাংলা ও বাঙালী, সমস্যাসঙ্কুল সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান। এই যুগোপযোগী প্রবন্ধে সমস্যা সমাধানেরও পর্যাপ্ত হদিশ পাবেন।

বাংলার সংস্কৃতি ও সমস্যা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি বৈজ্ঞানিক নই, আমি কল্পনাজীবী। তার অর্থ এ নয় যে বিজ্ঞান অর্থাৎ জগৎ এবং জীবন সম্পর্কিত আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অস্বীকার করি আমি। তাকে স্বীকার করেই কল্পনা করতে হয় কল্পনাজীবীকে। একটা বাড়ীর কথা বলি—বাড়ীখানাকে দেখতে ঠিক জাহাজের মত করে গড়ে তোলা হয়েছে। তাতেও বাড়ীখানা বাড়ীই; কিন্তু তার জাহাজী চেহারা তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। জাহাজী চেহারাটাই এখানে তার কল্পনাময় প্রকাশ। তাই যদি জীবজগতে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের পথে জন্তু জানোয়ারের পর মানুষের আবির্ভাব এবং সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসকে কল্পনার কাঠামোয় এবং চেহারায় গল্প গড়ে তুলে বলি—সকল সৃষ্টির আড়ালে যে অজ্ঞাত শক্তি বা রহস্য আছে—তিনি ঈশ্বর চেহারায় আবির্ভূত হয়ে মানুষকে গড়ে তার মাথায় একটা বোঝা তুলে দিচ্ছেন। এই বোঝাটির নাম—মানুষের দায়িত্ব। এটি ঘাড়ে করে তাকে তার শেষ দিন পর্যন্ত চলতে হবে। শেষ দিনে ওই বোঝা তার যাত্রাপথে খ'সে খ'সে হাল্কা হয়ে হয়ে বেরিয়ে পড়বে একটি ছোট্ট নুড়ি, যেটি হল পরশ পাথর। যা ক্ষয় হচ্ছে বা যাত্রাপথে ওই বোঝা থেকে খসে পড়ছে পথে—সে গুলি হল জন্তু জীবনের অমানুষোচিত অভ্যাস—, পাশব-সংস্কার, বাঁচার পথে জান্তব অভিজ্ঞতার প্রেরণা আর ওই শেষ নুড়িটি হল—মনুষ্যত্বের দ্যুতিময় কল্যাণময় রূপ বা সত্তা। যাত্রা পথে যত খসছে ওই গুলি খোসার মত বা জীর্ণকস্থার এক এক প্রস্ত আবরণের মত ততই সে মমতায়—সেগুলো তুলে ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছে। চলার পথে তার জান্তব অভ্যাস বিশ্রী কুটিল পন্থায় আত্মপ্রকাশ করছে। বড় বড় সভ্যতা এইভাবে তার খসে পড়া জীর্ণকস্থার আবরণ প্রস্তগুলিকে কুড়িয়ে নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে তার সন্ধান করতে গিয়ে সেইখানেই নিজেকে সমাহিত করছে।

চলার পথে খসে পড়ে জান্তব সংস্কার পাশবপ্রবৃত্তি। হিংসা-সন্দেহ-ক্রোধ-আত্মসাতের উদগ্র কামনা। খসে পড়ে একা চলতে চলতে দোসরের সঙ্গে মিলনে, তার সঙ্গে সহযোগিতায়—পরস্পরকে ভালবাসায়; দোসরের পর দোসর মিলেছে। মানুষ পরিবার গড়ার পর সমাজ গড়েছে—জাত গড়েছে। এরই মধ্যে তার পাশব সংস্কার এবং প্রবৃত্তি মিলন ও চলার গতিকে ব্যাহত করে আত্মপ্রকাশ করেছে, কলহ বাধিয়েছে, জীবনের জটিলতাকে জিইয়ে তুলে কুটিল বিষাক্ত নাগপাশে পরিণত করেছে। আবার এক একটা কালে—সে এই সমস্ত কিছুকে ছিঁড়ে ফেলে—বা টেনে শিথিল ক'রে নিয়ে উল্লাস কলরব করে এগিয়ে চলে।

ভূমিকাটি একটু গুরুগম্ভীর এবং ভারী হয়ে গেল। কিন্তু আজ বাঙালীর জীবন সম্পর্কে কথা বলতে গেলে একমুহূর্তে মনে পড়ে যায় বাঙালীর বিগত একশো বছরের কথা। একশো বছর কেন—বাঙালীর শেষ দুই আকাশ-ছোঁওয়া মাথা বিরাট পুরুষ—রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্রকে গণনা করলে দেড়শো বছর বলতে হবে। এই দেড়শো বছরে বাঙালীর ইতিহাস, বাঙালীর অভ্যুত্থান—আকাশলোকে—আলো বিকীর্ণ করে ওঠার ইতিহাস। সে যেন একটি পৃথিবীর মানব সভ্যতার জ্যোতিষ্কমণ্ডলে একটি নূতন জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয়। তার গৌরবময় ইতিহাস সুবিদিত, সে ইতিহাস সুদীর্ঘ—তার পুনরাবৃত্তি করলে—সে ফুরোতে চাইবে না; কিন্তু সেই অভ্যুদয় অকস্মাৎ যেন স্তব্ধ হয়েছে, সে যেন নিভে আসছে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এল—অন্য সকল প্রদেশের লোকের মধ্যে সাড়া পড়েছে—তারা দীপ্যমান হতে সুরু করেছে, তারা উঠছে আর বাঙালী নামছে, নিষ্প্রভ হচ্ছে। এ সত্য সম্পর্কে আমরা সচেতন—বুঝতে পারছি,—এবং চীৎকার করছি এই বলে যে, এটা একটা সর্বভারতীয় ষড়যন্ত্র; এবং কখনও চীৎকার করছি—নিজেদের বিরুদ্ধে।

কখনও চীৎকার করছি—শৃঙ্খলা গেল-গেল বলে, কখনও চীৎকার করছি—সব শৃঙ্খল ভাঙ্গো চুরমার করো বলে। আকাশে সাদা পায়রা উড়ছে—শান্তি-শান্তি চীৎকার আকাশ স্পর্শ করছে—আবার রক্তাক্ত বিপ্লবের জন্য গান রচনা করছি—কালো ওই রাতের আকাশ—রক্ত ঢেলে রাঙিয়ে দাও ব'লে। ছাত্রদের বিদ্যায়তনে যতদিন ছুটি ততদিন ধর্মঘট। খাদ্যের জন্য মিছিল আছে, মাঠে শস্যোৎপাদনের প্রচেষ্টা নেই। কি সরকার কি অন্য রাজনৈতিক দল—মাঠে কোনদিন মিছিল নিয়ে গিয়ে চাষের ক্ষেত্রে দুদিনের কাছে একদিনে করে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। সরকারের পরিকল্পনা আছে—সে পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে চেহারা নেয় ছিদ্র কুম্ভের। জল পড়ে যায়, তৃষ্ণা মেটে না। বাক্য আছে কর্ম নেই। মানুষ আছে বেকার। চাকরী যারা পেয়েছে তাদের দাবী আছে—কর্তব্যে নিষ্ঠা নেই। জীবিকার জন্য, চাকুরীর জন্য চীৎকার আছে—কিন্তু স্বাধীন কর্মে সাহস নাই—সন্ধানের দৃষ্টি নাই। আজ বাঙালীর শুধু দাবীই আছে কোন দায়িত্ব নাই। সমালোচকের দায়িত্ব শুধু সমালোচনার ছলে আঘাতের—শুধু সব কিছু অস্বীকারের। এই সব কিছু অস্বীকৃতির মধ্যে তাঁরা বাঙালীরও সব কিছু অস্বীকার করছেন।

এই অস্বীকৃতির একটি নমুনা দিলে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হবে। বোধ করি বহুজনেই একথা শুনেছেন—কিন্তু হয় গ্রাহ্য করেন নি অথবা অবহিত হন নি।

একজন বামপন্থী পণ্ডিত সমালোচক জমিদারী প্রথার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন এবং এটা বোধ করি একটি বামপন্থী থিয়োরী যে—রবীন্দ্রনাথ জমিদার বংশোদ্ভূত বলে তাঁরা মনে করেন—জমিদারি প্রথা না থাকলে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হতেন না বটে কিন্তু তাতে ক্ষতি হ'তনা কিছু। (রাশিয়ার টলস্টয় সম্পর্কে একথা বলেন কি না জানি না)। অবশ্য অতি-পণ্ডিতের মতে তাই-ই ঠিক।

রাশিয়ার জারদের এমন শাসন এবং ওই অনাচার না থাকলে রাশিয়ার ওই বিপ্লব এবং নায়ক লেনিন জন্মাতেন না এবং তাতে বিশ্বের ইতিহাসের ক্ষতি হ'ত না কিছু।

অর্থাৎ সমালোচক আজ দায়িত্বহীনভাবে কথা বলেন—তাতে তাঁর বাধে না। কোন সংকোচ নেই। আজ যেন দাঁতের একমাত্র কর্ম দংশন করার, কামড়াবার; হাস্যে বিকশিত হওয়ার জন্য নয়—অথবা দাঁতে দাঁত চিপে কঠিন গুরুভার বহনের জন্য নয়। প্রথমটা পশুর দাঁতের কর্ম দ্বিতীয়টা মানুষের। মানুষ জীব, কিন্তু পশু নয়। পশুও জীব বলে তার এবং মানুষের কর্ম ও ধর্ম এক নয়। পশুর কর্ম ও ধর্ম পাশবিক মানুষের ধর্ম কর্ম মানবিক। দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কারণ একটা ধর্ম কর্মের সৃষ্টি অন্ধকারে—অরণ্যে গুহায়—অপরটির সৃষ্টি ও প্রকাশ আলোকে—মুক্ত আকাশের তলে। একটির স্ফূর্তি এককে—ক্ষুদ্রে—অপরটির মহাপ্রকাশ বহুতে-বৃহতে। একটির উদ্ভব জৈবিক প্রবৃত্তিতে, অপরটির উদ্ভব মানবিক চরিত্রে। পশু অন্য পশুর মুখের আহার কেড়ে নেয়, মানুষ মৃত্যুকালের তৃষ্ণার মুখের জল অপর তৃষ্ণার্ত মৃত্যুপথযাত্রীকে তুলে দিয়ে বলে Thy need is greater than mine. এই চরিত্রবল আজ বাঙালীর ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই তার অধঃপতন।

সম্পদবানের ঘরে যেমন ঘটে তাই ঘটেছে। যিনি বংশকে প্রতিষ্ঠা করেন সম্পদেই হোক আর প্রতিষ্ঠাতেই হোক তিনি তা ভাগ্যবলে করেন না, করেন চরিত্রবলে। লটারীতে টাকা পেয়ে বড়লোক বংশ কেউ আছে বলে আমি জানি না। তিনি হয়তো নিজে ঘাড়ে ক'রে মোট বয়ে জীবন সুরু করেছেন—তারপর উঠেছেন ধাপে ধাপে, মর্যাদাকে তিনি অর্জন করেছেন। পরে পুরুষে পুরুষান্তরে যাঁরা জন্মান—তাঁরা মর্যাদা নিয়েই জন্মান। তিনি নিজের হ্যাণ্ডব্যাগও বইতে পারেন না, অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে মজুরী দেন। সম্পদ ও চরিত্রের ক্ষয় সুরু ওখান থেকেই। দেউলিয়া যখন হয় তখন ভিতরে বাহিরে দুই দিকেই হয়। ব্যবসাদারের ইংরেজী আইনের ইনসলভেন্সীর কথা বলছিনে। ওই আইনে যারা পাওনাদারকে ফাঁকি দিয়ে সম্পদ জমা করে তারা মানুষই নয়—ধূর্ত জানোয়ার।

অনেকদিন আগের কথা বলছি বোধ করি স্বাধীনতার অব্যবহিত কিছুকাল আগের কথা। একদিন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই—রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক—যে কোন কনফারেন্স হোক—তার সঙ্গে মূল পালার পর প্রহসনের মত শেষ আসরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রেওয়াজ হয়েছে। এখন খেলাধূলার ক্লাবেও কুস্তীর পর একটুখানি সাহিত্য সংস্কৃতির বক্তৃতা হয়। উদ্দেশ্য আর একদফা বক্তৃতার মধ্যে দুটো একটা গান কি যন্ত্র-সংগীতের প্রক্ষেপ। কনফারেন্সটি ছিল সিনেমা হাউসের কর্মীদের কনফারেন্স; যার মধ্যে তাদের অভাব অভিযোগের ফিরিস্তির সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনা জাগ্রত হচ্ছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম প্রধান অতিথি—ওঁদের ইউনিয়ন-প্রেসিডেন্ট সভাপতি। তার আগেই আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি যে এঁরা দর্শকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার দূরে থাক রীতিমতো অপমানজনক ব্যবহার করেন। আমার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম 'আপনাদের এই দাবী-দাওয়া নিশ্চয়ই সংগত। তবে সেই সঙ্গে এই কথা বলি যে আপনাদের দাবী-দাওয়া তখনই নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান হবে যখন আপনারা কর্তব্য করে যাবেন নিখুঁত ভাবে। এবং সেই সঙ্গে আমি যা দেখেছি তা উল্লেখ করে বলেছিলাম যাঁরা দেখতে আসেন—দর্শক—যাঁদের অর্থে মালিকের লাভ এবং আপনাদের বেতন—তাঁরা কি মালিক কি কর্মী উভয়ের কাছেই আদরণীয়—তাঁদের প্রাপ্যের মধ্যে কারুরই কোন অভাব অভিযোগ দাবী-দাওয়ার সংস্পর্শ নেই। এখানে যখন আপনারা অবজ্ঞা এবং অবহেলা করেন—তখনই আপনাদের সকল দাবীর ভিত্তিতেই শুধু নয়—আপনাদের মনুষ্যত্ব-সত্তায় ফাট ধরে। জীবনে সর্বনাশ ঢুকবে সেই ফাটল ধরে। উপমা দিয়েছিলাম—লখীন্দরের বাসর ঘরে ছিদ্র পথে কালনাগিনী প্রবেশের। সভাপতি বামপন্থী নেতা। তিনি হেসে বলেছিলেন—মাননীয় প্রধান অতিথি—সাহিত্যিক ভাবুক মানুষ। বাস্তবকে ঠিক চেনেন না বলব না, বলব বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু বাস্তব এইই বটে। সংগ্রাম যখন চলে—তখন সংগ্রামশীল মানুষের এমন মেজাজ স্বাভাবিক। সভাপতির বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলে না, হজম করে এসেছিলাম। নইলে প্রশ্ন করতাম আপনাদের যখন রাজত্ব হবে—তবে এই দেউলিয়া লোকেদের কাছ থেকে রাষ্ট্র কোন কর্মের কর আদায় পাবে? এই বাস্তবের সে কোন রূপ হবে?

এর আগের বড় ট্রাম ধর্মঘটের কথা অনেকের মনে আছে। বিজয়ী ট্রাম-কর্মীরা বিজয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই এক বিখ্যাত মনীষীর স্কুলযাত্রিনী মেয়েদের ট্রামে ওঠানামার ব্যাপার নিয়ে যে রূঢ় উদ্ধত ব্যবহার করেছিলেন তার কথা সকলের মনে নেই, আমার আছে। রাজার সৈন্য সাম্রাজ্যবাদীর সৈন্য—ভাড়াটে সৈন্য—তাদের পশু বানিয়েই সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করা হ'ত। তাদের কোন শহর দখলের পূর্বে মদ খাইয়ে ওই শহরের নারী ও সম্পদ তাদের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে আছে বলে তাদের উৎসাহিত ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু যারা নিজের, দেশ উদ্ধার করে যারা পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচন করে—তারা পশু নয় তারা মানুষ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য উত্তেজনা ও সাহস সংগ্রহে যারা মনুষ্যত্ব বা চরিত্র আগেই বিসর্জন দেয়—তাদের অবস্থা স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থা এমনই ঘটে। জীবনের মানুষের বল বলতে চরিত্র সম্পদ বলতে চরিত্র, সহ্য শক্তির মূল চরিত্র, মনুষ্যত্ব বলতে চরিত্র। আজ বাঙালী চরিত্র হারাতে বসেছে—তাই তার চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে।

আজ সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশও এক মহাক্রান্তি-রেখায় উপনীত। রাষ্ট্র বদলেছে, সমাজ বদলেছে—অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা সব ব্যবস্থাকে ভূমির গাছকে ধরে রাখার মত ধরে রাখে—তা ভেঙে চুরে যাচ্ছে। এতকালের বিশ্বাস আইন নীতি—সামাজিক আচারের মূল্যমানের নূতন নিরিখ ধার্য হবে। তার মধ্যে যা সত্য, যা ধ্রুব তাই থাকবে। অন্য সব কিছু যাবে। ধনী থাকবে না—নির্ধন থাকবে না—থাকবে জাতীয় ধন—আর মানুষ। ব্রাহ্মণ থাকবে না—চণ্ডাল থাকবে না—থাকবে মানুষ। মানুষ বলতে মানুষ নামক জীব নয়—মনুষ্যত্বের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ও বোধজাগ্রত মানুষ। সুস্থ সবল চরিত্রবান সত্যসন্ধানী মানুষ। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী আমরা এই মনুষ্যত্বের সাধনা করেছি। এই সাধনার মূল কথা সত্য। সৃষ্টির মূল কথাই যে তাই। সৃষ্টির কারণের কথা বৈজ্ঞানিক বলবেন। উদ্দেশ্য যে তার তমসা এবং শূন্যতাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপে নিজেকে প্রকাশিত করা তাতে তো বিতর্কের অবকাশ নেই। অকপট স্বরূপে ব্যক্ত হওয়াই তো সত্য। শক্তি সৃষ্টির মধ্যে সত্য অভিব্যক্ত। সত্যেই সে প্রতিষ্ঠিত। সত্যের সাধনাই চরিত্রের সাধনা। কারণ মনুষ্যত্বের স্বরূপে মানুষ তখনই অভিব্যক্ত হয়। আজ বাঙালীর জীবনে চরিত্র দুর্বল হয়েছে—তার কারণ সে সত্যকে বর্জন করতে উদ্যত হয়েছে। নূতন যুগের বাঙালী আজ কুটিল যুক্তিবাদী। সে তার্কিক—সত্য বলে কিছুকে স্বীকার করে না এ কথা বললে আমার অপরাধ হবে না। জীবনে বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করাই আজ শিক্ষার উদ্দেশ্য, কারণ ধ্বংসাত্মক সমালোচনাই বাঙালীর উদ্দেশ্য—

বোধির সাধনাকে সে উপহাসের সামগ্রী করে তুলেছে। কোন গঠনে বা নূতন সৃষ্টিতে তার যেন জাতক্রোধ। বাঙালীর কাছে আজ বাঙালীরই সব কিছু মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; অন্তত সে কোমর বেঁধে লেগেছে তাই প্রমাণ করতে। আজ বাঙালীর কাছে তার জাতীয় গঠন যা হয়েছে তা মিথ্যা, তার সাহিত্য মিথ্যা—শিল্প মিথ্যা—সব মিথ্যা। কিছু নাই, কোথাও কিছু নাই তার এই কোলাহল—মাঠে ঘাটে হাটে সংবাদপত্রে প্রচণ্ড চীৎকারে ধ্বনিত হচ্ছে। সৃষ্টির সংগীত লজ্জা পাচ্ছে। শুধু একজায়গায় বাঙালী বাঙালীত্বকে স্বীকার করে। যখন অন্য প্রদেশের লোক এই কথা বলে তখন সে খড়্গ হস্ত হয়ে প্রতিবাদ করে। এমন কি একথা না বলেও যদি বলে যে তারা আজ প্রগতিশীল—তারা আজ জাগ্রত—তখন বাঙালী তার চেয়েও উচ্চ কণ্ঠে বলে তোমার চেয়েও আমি প্রগতিশীল—তোমার থেকে অনেক আগে থেকে প্রবুদ্ধতর চেতনায় আমি জাগ্রত। আজকের বাঙালীর দাবী পৈত্রিক সম্পদে সম্পদশালী ঘরের সন্তানের মত। জন্ম থেকেই বাঙালী বলে সে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠার দাবী করে। পৃথিবীর সঙ্গে মিলবার আগ্রহ তার অপরিসীম—সে ব্যগ্রতা তার অসাধারণ। কিন্তু ভারতবর্ষে সকলের সঙ্গে মিলতে তার কুণ্ঠা আছে। তার উপর নিদারুণ অবিচার হয়েছে বলে পরের উপর মামলাই সে করলে—কিন্তু নিজের বিচার সে করলে না। ব্যক্তি হিসাবেও প্রতিটি ব্যক্তি আজ পরের বিচার করে সমালোচনাই করছে—তার আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সে বর্ণান্ধ। সকলকে সে কালো দেখে—দেখে না শুধু নিজেকে। পূর্ব-বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক যারা এল—তাদের দুঃখ দুর্দশা বড় করে তুলে ধরতে গিয়ে তাদের গ্লানি তাদের পতন—তাদের কলুষকেই বড় ক'রে তুলে ধরা হল, বলা হল: যুবতী ধর্ম বিক্রী করলে, যুবক চোর হল, শিক্ষক প্রবঞ্চক হল; এতে দুর্দশার কথাটা ফলাও হয়েছে নিশ্চয় কিন্তু এ সত্য অর্ধসত্যও নয় আংশিক সত্য মাত্র; তাতে বাঙালীর গৌরব বাড়ে নি, হয়েছে শুধু সরকারের সমালোচনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপানো। পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোকেরা যারা ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এদিকে চলে এল—অনিশ্চিতে ভাসল—যে ত্যাগের তুলনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল- তার কথা কেউ একবার বললে না। আশী লক্ষ লোকের মধ্যে অল্প কয়েক হাজার নারী হয়ত দেহ বিক্রয় করেছে, কয়েক হাজার যুবক বিপথগামী হয়েছে, কিন্তু বাকী কত নারী পুরুষ যারা জীবন দিয়েছে—জীবন-সত্যকে বিসর্জন দেয় নি, কত মানুষ প্রচণ্ড সংগ্রাম করে বেঁচেছে, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ উল্লেখ করলে না। যা নিয়ে নাটক হয়, কাব্য হয়, উপন্যাস হয়, রাজপুত জাতির মহিমার চারণ গাথার মত গাথা তৈরী হয়। যা বাঙালীকে প্রেরণা দিতে পারত। নূতন শক্তি দিত। গৌরব দিত। নব মহাভারতে এ এক উজ্জ্বল অধ্যায়! দু কোটি লোকের বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ—এই দু কোটি লোক আশী লক্ষ লোকের আগমনকে একবারের জন্যও অবাঞ্ছিত বলে মনে করে নি। দু কোটি লোকের আজ দু কোটি আশী লক্ষের মধ্যে বিভক্ত হচ্ছে। সে কথা কারও মনে উঁকিও মারলে না। জীবনের অন্যান্য বিভাগেও এমন দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু তার উল্লেখ করতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হবে। তবে জীবনে আস্তিক্যবুদ্ধি যখন মানুষ বিসর্জন দিয়ে নাস্তিক্যবুদ্ধিকে গ্রহণ করে তখনই এই পরিণতি ঘটে। নিজের মহিমাকেও সে তখন অস্বীকার করে।

এ হল কেন? শতাব্দীব্যাপী এত বড় সাধনা এ মান দুটি দশকের মধ্যে এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায় কেন? এই চরিত্র যায় কি করে? উনবিংশ শতাব্দীর তপস্যা অমৃতের তপস্যা। অমৃত আমাদের জীবনপাত্রে সঞ্চিত হয়েছিল—আমরা তার স্বাদ পেয়েছিলাম। এই একশো বছরে বাঙালীর জীবনের বিভাগে বিভাগে যাঁরা প্রতিভূ, ধর্মে-কর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে রাজনীতিতে সর্বযজ্ঞেই পুরোহিত যাঁরা—তাঁদের প্রতিজনেরই সেই এক বাণী—যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমু কুর্য্যাম? তবু এমন হল কেন? অমৃত ব্যর্থ হয়? উত্তরে বলব—না হয় না। কিন্তু নজীর আছে—অমৃতের অধিকারী যাঁরা অমর—তাঁরও মধ্যে মধ্যে সুরাপানে উন্মত্ত হন। আমাদের যিনি মহারুদ্র—যিনি মৃত্যুঞ্জয়—তিনিও বিষ পান ক'রে সাময়িকভাবে হতচেতন হন। বাঙালীর জীবনে সুরার প্রভাব এসেছে—সে বিষ পান ক'রে কণ্ঠদেশকে নীলাভ ক'রে হতচেতন হয়েছে।

এ সুরা—এ বিষ—পাশ্চাত্য দেশ থেকে এসেছে—এর তীব্রতা প্রচণ্ড। শুষ্কবুদ্ধিবাদের বিষ, সেই বুদ্ধিবাদ—যে বুদ্ধি বলে: লক্ষ্য স্থির রেখে চল, পথের বিচার করো না; যে বুদ্ধি নীতি, ন্যায়, সত্যের বস্তুমূল্য বিচার করতে বসে, যে বুদ্ধি নিজের দেয় না দিয়ে—কৌশলে নিজের পাওনা পাওয়ার কথাই ভাবে। প্রেম যে বুদ্ধির কাছে আবেগ মাত্র। যে বুদ্ধির অহংকার আছে নম্রতা নেই। এ বুদ্ধি সেই বুদ্ধি। এর উগ্রতা সেই সুরার মত, যে সুরার নেশায় উন্মত্ত হয়েছিলেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। নেশার পর তিনি সুরাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। সুরার নেশার একমাত্র ধর্ম যেমন সকল নীতিজ্ঞান ও বন্ধনকে লঙ্ঘন করানো—ছিন্ন করানো—নিছক শুষ্কবুদ্ধিবাদেরও ধর্ম তাই। তার প্রমাণ জাজ্বল্যমান পাশ্চাত্য রাজনীতিতে। সেখানে সত্য নাই, আছে বাগাড়ম্বরে নিজের অন্তরকে গোপনের প্রয়াস, মিত্রতার মধ্যে প্রেম নাই আছে সন্ধিপত্রের অন্তরালে আঘাতের জন্য অস্ত্র প্রস্তুতির উদ্যম, পৃথিবীর কারও জন্য কোন ত্যাগ নাই—আছে শুধু স্বার্থ—শুধু স্বার্থ! পাশ্চাত্য রাজনীতি—এই শুষ্কবুদ্ধিবাদের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয়। এরই উপর ভিত্তি করে যত রাজনৈতিক মতবাদ সেও তাই। আমরা বাঙালীরা একসময় অধীর হয়ে অমৃতের সাধনার আসনে বসেই পাশ্চাত্য অমৃত বলে এই সুরা আকণ্ঠ পান করেছি। এই অবস্থা সেই সাময়িক মত্ততা বলেই আমি বিশ্বাস করি।

জাপান একদা এই সুরা আকণ্ঠ পান করে প্রচণ্ড মাশুল দিয়েছে। ইউরোপে এই সুরার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মধ্যে দুবার। আবার তৃতীয় বারের আয়োজন সম্পূর্ণ করে লগ্ন ক্ষণ আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

হয়তো সেই ভীষণ লগ্নে বাঙালী এই সুরাকে অভিশাপ দিয়ে সেই অমৃতের তপস্যায় আবার রত হবে। যে তপস্যা নম্র অথচ অনমনীয়, যা সমুদ্রের মতই গভীর অথচ শান্তিগর্ভ; বিদ্বেষহীন—যে তপস্যা সত্যের, সকল মানুষকে ভালবাসার অমৃতময় আনন্দের। যে তপস্যা বঞ্চিত হবার জন্য নয়, কাউকে বঞ্চিত করবার জন্যও নয়; যে তপস্যা সকলকে পাবার তপস্যা এবং নিজেকে সকল জনের মধ্যে প্রেমে প্রীতি প্রসারিত করার তপস্যা। সেদিন সে নিশ্চয়ই বুদ্ধিবাদকে ত্যাগ করবে সে পুরানো কথা বলে—

"যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমু কুর্য্যাম।"

লণ্ডনে প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য 'চার্ম অফ কাশ্মীর' পুস্তকের একটি অপূর্ব চিত্রায়ন।

লণ্ডনে প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য 'চার্ম অফ কাশ্মীর' পুস্তকের একটি অপূর্ব চিত্রায়ন।

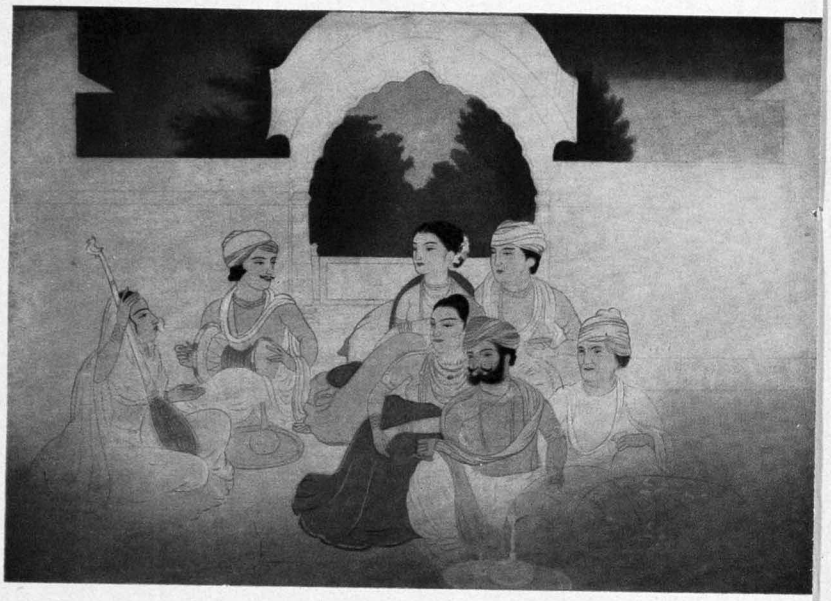

জাপানের 'কোকা' পত্রিকায় প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রায়ন।

মুদির ছোট ছেলে ক্ষুদিরাম। ব্র্যাডলী বার্ট রচিত দুষ্প্রাপ্য 'ফোক টেল্‌স্‌ অফ বেঙ্গল, পুস্তকের অপূর্ব চিত্রায়ন।

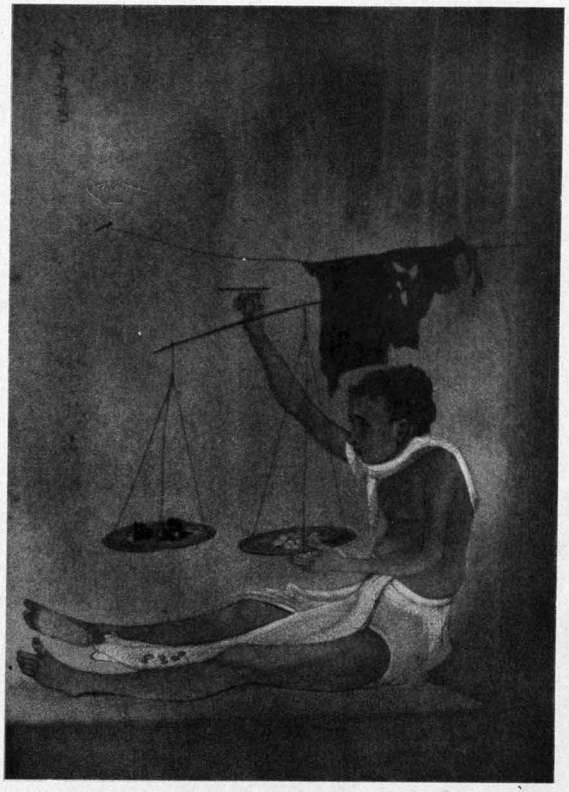

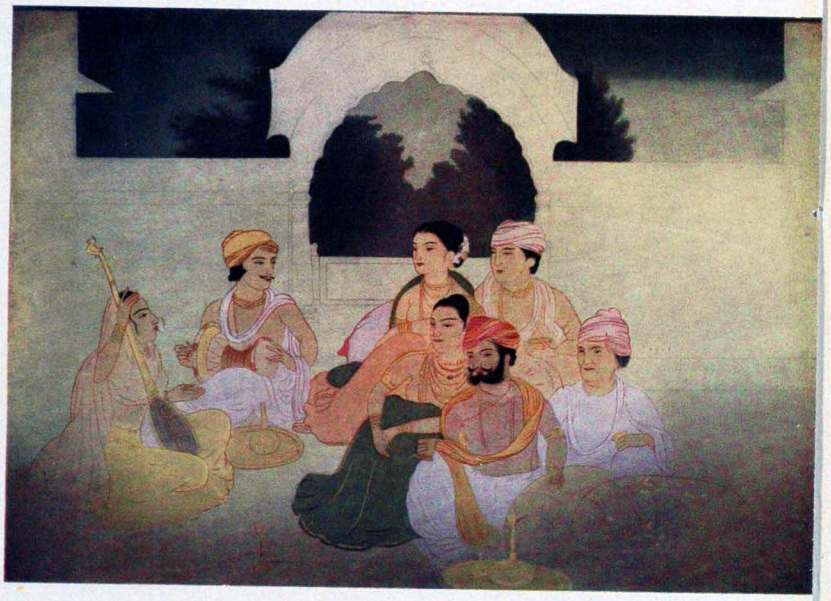

জাপানের 'কোকা' পত্রিকায় প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রায়ন।

মুদির ছোট ছেলে ক্ষুদিরাম। ব্র্যাডলী বার্ট রচিত দুষ্প্রাপ্য 'ফোক টেল্স্ অফ বেঙ্গল, পুস্তকের অপূর্ব' চিত্রায়ন।

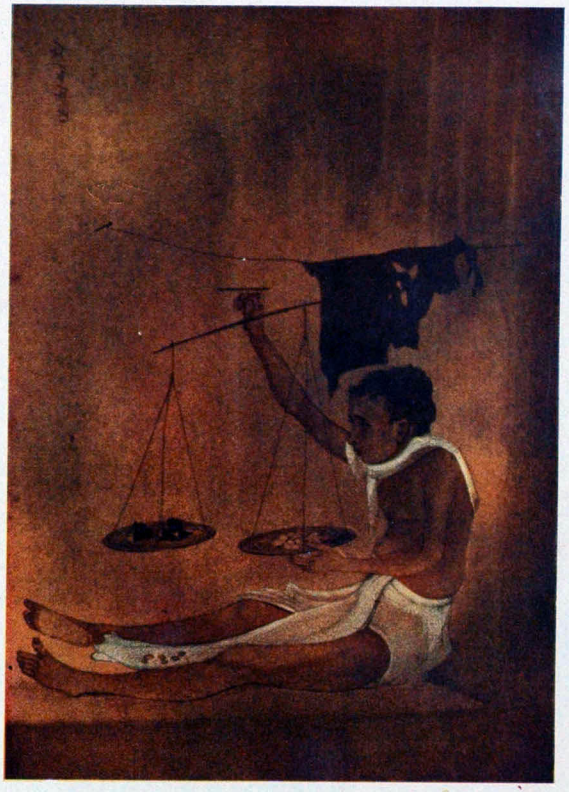

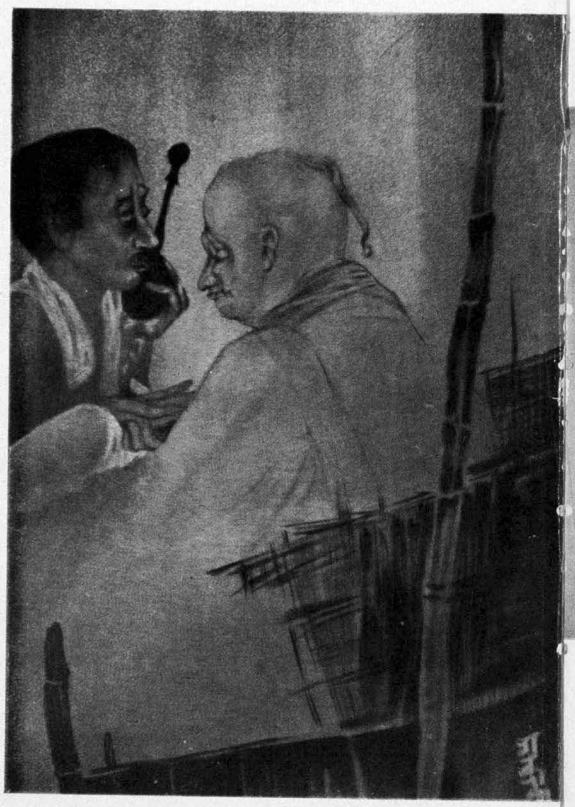

তাঁতী পদ্মলোচন। ব্র্যাডলী বার্ট রচিত দুষ্প্রাপ্য 'ফোক টেল্‌স্‌ অফ বেঙ্গল' পুস্তকের অন্যতম চিত্রায়ন।

'চার্ম অফ কাশ্মীর' পুস্তকের অন্যতম চিত্রায়ন।

তাঁতী পদ্মলোচন। ব্র্যাডলী বার্ট রচিত দুষ্প্রাপ্য 'ফোক টেল্‌স্‌ অফ বেঙ্গল' পুস্তকের অন্যতম চিত্রায়ন।

'চার্ম অফ কাশ্মীর' পুস্তকের অন্যতম চিত্রায়ন।

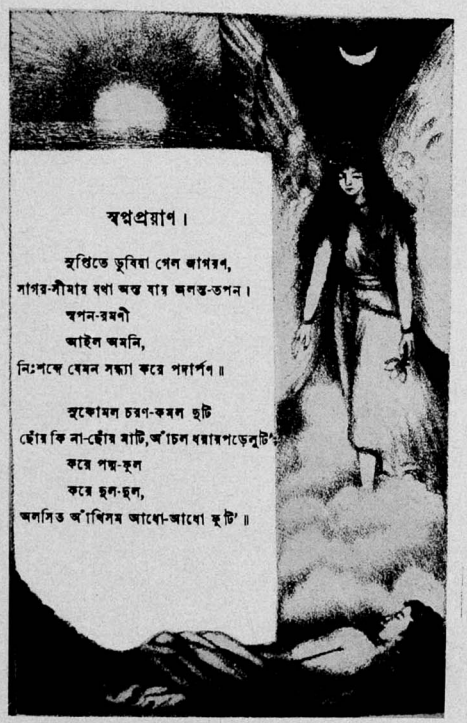

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর একটি চিত্রায়ন।

কালিদাসের 'ঋতুসংহার'-এর চিত্রাবলী অবনীন্দ্রনাথের চিত্রজীবনের প্রথম যুগের কল্পনা। রাজস্থানী ও মুঘলাই চিত্রের কিছু কিছু আভাস এই চিত্রশ্রেণীতে সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান। তথাপি তাঁহার এই অপরিণত রচনার মধ্যে নিজস্ব কল্পনার অনেক পরিচয় বর্তমান আছে। এই পংক্তির কয়েকখানি চিত্র কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় সংগৃহীত আছে। এগুলি একত্র করিয়া ৺রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটি সচিত্র এল্‌বাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহে 'ঋতুসংহার'-এর চিত্রাবলীর বিশদ বর্ণনা ও আলোচনা আছে। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে এই চিত্রাবলীর পুনরালোচনার অবকাশ নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র (১৯১৮) ও 'চন্দ্রকলা' (ক্রিসেন্ট মুন, ১৯১৩), এই দুই কাব্যগ্রন্থের জন্য অবনীন্দ্রনাথ কয়েকটি চিত্র রচনা করিয়াছিলেন। গীতাঞ্জলির সাতখানি চিত্রের মধ্যে দুইখানি ৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে আছে। বাকি পাঁচখানি বিদেশী সংগ্রাহকরা লইয়া গিয়াছেন।

তাহার পর ধরিতে হয় স্কট ও'কোনর সাহেবের 'চার্ম অফ কাশ্মীর' (লংম্যানস্ গ্রীন, ১৯২০) পুস্তকের জন্য ছয়খানি ক্ষুদ্র আকারের চিত্র। (ক) রাজা অশোক, (খ) নিশাত বাগে জাহাঙ্গীর ও তাঁহার বেগম, (গ) চশমচাহির জলের কিনারায় একটি বালিকার চিত্র, (ঘ) নশিম কাব্যগ্রন্থ হাতে এক কবি, (ঙ) শালিমারে রাত্রিকাল—সম্রাট সাহাজাহান, (চ) ভাগ্য এবং সুখের পিয়াসী।

অবনীন্দ্রনাথ কখনও কাশ্মীর যান নাই। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দক্ষিণ বারান্দায় বসিয়া, ধ্যানের মধ্য দিয়া, কাশ্মীরের পরিবেশ ও দৃশ্যাবলী চাক্ষুষ রূপে অদ্বিতীয় কল্পনাবলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই চিত্রাবলী সম্বন্ধে ও'কোনর সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার উদ্ধৃতি এইখানে প্রাসঙ্গিক হইবে। তিনি মন্তব্য করেন, 'রসিকের বিচারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী সম্মানের উচ্চ আসন নিশ্চয় লাভ করিবে। ভারতীয় শিল্পের নূতন প্রতিষ্ঠাতা ও নবজাগরণের পুরোহিত ও উদ্বোধক হিসাবে তাঁহার সৃষ্টি কেবল ভারতে নয়; পরন্তু প্যারিসে, লণ্ডনে এবং নিউইয়র্কে প্রচুর সম্মানিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার রেখা-সৃষ্টির কমনীয়তা, কোমলতা এবং মধুর সৌন্দর্য, তাঁহার চিত্ররচনায় স্বতঃপ্রস্ফুটিত হইয়া রইয়াছে। এবং আমাদের চোখের সম্মুখে এই নিদর্শনগুলির মধ্যে যে অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি এবং কাব্যময় অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে বলিতে হয় যে এই রচনাগুলি কেবলমাত্র ইলাস্ট্রেশান নহে (পরন্তু মৌলিক সৃষ্টি)। এই চিত্রমালা—কাশ্মীর প্রদেশের আত্মার—বর্ণের অক্ষরে লিখিত; অপূর্ব ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্ম নিগূঢ় পরিচয়, যাহার কিছু কিছু পরিচয় আমার লিখিত ছাপার পাতায় ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা আছে। এই স্বর্গীয় দেশে যে সব যাত্রীরা আসেন, তাঁহাদের সকলের চোখে ইহার বাহ্য সৌন্দর্য সহজে পড়ে। কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রাবলীতে কাশ্মীরের বাহ্য সৌন্দর্যের অতীত অনেক গুহ্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে।'

ইহার পরে ১৯২০ সালে ওমর খৈয়ামের 'রোবাইয়াৎ'-এর ইলাস্ট্রেশান করা হয়। মূল পঁচাত্তর সংখ্যক চতুষ্পদী কবিতার মধ্যে সাতখানি তিনি চিত্রিত করেন। সেই সাতখানি হইল দুই, তেরো, আঠারো, উনত্রিশ, আটচল্লিশ, পঞ্চাশ এবং তিয়াত্তর নম্বর কবিতা। ইতিপূর্বে অনেক ইউরোপীয় চিত্রকর এই রোবাইয়াৎ-এর চিত্রাঙ্কন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্র তাঁহাদের যশকে যে অতিক্রম করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার চিত্রযুক্ত সংস্করণটি একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং বিদেশে প্রভূত জনপ্রিয় হইয়াছিল। সাতখানি চিত্রের মধ্যে অন্তত পাঁচখানি তাঁহার রচিত শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে পড়ে। আমরা এখানে তাঁহার চিত্রিত তিনটি রোবাইয়াৎ-এর কান্তিচন্দ্র ঘোষ কৃত বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,

'স্বপ্নে যেন কণ্ঠ শুনি
রাত্রি যেন শেষ প্রহর
পানশালে মোর দৈববাণী
কর্ণেতে কার বাজ্‌ল স্বর!
চ'লছে হেঁকে—ওঠরে বাছা,
ভরিয়ে নে তোর পেয়ালটুক
জীবনসুরা শুকিয়ে না যায়,
আপশোষে ফের ফাট্‌বে বুক'!॥ ২॥

'সদ্য ফোটা এই যে গোলাপ, গন্ধ-প্রীতি-উজল মুখ,
চ'লছে নাকি—মিথ্যা এসব, এই ক্ষণিকের দুঃখ সুখ!
পৃথ্বী-বুকে উঠ্‌ছি ফুটে গর্বে পরি? রঙিন সাজ—
পাপড়ি টুটে ছড়িয়ে মোদের জীবনরেণু পথের মাঝ'!

॥ ১৩॥

ঘষিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব নাহি হল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল, তবুও ত গলিল না সোনা।
আছাড়ি' ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চলিতে পড়িল রাণী, টুটি' গেল প্রাণ;—

সর্ব্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে; ছুটে পড়ি' তারি পাশে
কনক দর্পণে ছুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার চিত্রায়ন। তখনকার দিনের টাইপোগ্রাফী ও লে আউট লক্ষণীয়।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার চিত্রায়ন।

বিম্ববতী

(রূপকথা।)

যতনে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী,
নব ঘন স্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

'কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া
এই যে বিপুল বিশ্বমাঝ,
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে—
হেথায় বা মোর কিসের কাজ?
কোথায় পুনঃ—কেই বা জানে—
ফিরতে হবে একটি দিন—
উধাও সে কোন মরুর 'পরে
হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন'! ॥ ২৯ ॥

তাঁহার রচিত চিত্রাবলীতে তিনি 'সাকী'র যে রূপ কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় নারীর বেশভূষা ও অলংকারের অনুসরণ করা হইয়াছে—পারস্য রীতির নহে—এইরূপ সমালোচনা কেহ কেহ করিয়াছেন। এই সমালোচনা মানিয়া লইলেও একথা অনস্বীকার্য যে তাঁহার রচিত চিত্রাবলী যে মৌলিকতা এবং কাব্যময় পরিকল্পনায় উজ্জ্বল হইয়া আছে তাহা বাস্তবিকই অনন্য।

আমাদের আলোচনার শেষ নিদর্শন হইল 'বাংলার রূপকথা'র ব্রাডলী বার্ডের ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের চিত্রাবলী। ১৯২০ সালে প্রকাশিত (জন লেন্) এই পুস্তকের জন্য অবনীন্দ্রনাথ ছয়খানি ছবি আঁকিয়া ছিলেন। তাহারা হইতেছে, (ক) যে মানুষ আকস্মিক ভাগ্যবলে ধনী হইয়াছিল, (খ) পদ্মলোচন তন্তুবায়, (গ) সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ক্ষুদে, (ঘ) কাল পরী ও নিদ্রা পরী, (ঙ) বড় রানী ও সন্ন্যাসী, (চ) দেড় আঙুল মাপের মানুষ।

এই চিত্রাবলীতে রেখারচনার রমণীয়তা অপেক্ষা বর্ণকল্পনার গুণই অধিক। তিনি যে একজন রঙের যাদুকর ছিলেন,—এই চিত্রাবলীর তিন চারখানি চিত্রে তাহার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বাংলার সামাজিক পরিবেশের এবং পরিচিত নর-নারীর এরূপ নিখুঁত বাস্তবধর্মী চিত্র খুব কমই দেখা যায়। ছয়খানি চিত্রই ছয়টি

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো জ্বলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর স্থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের বধূ কবিতার একটি চিত্রায়ন।

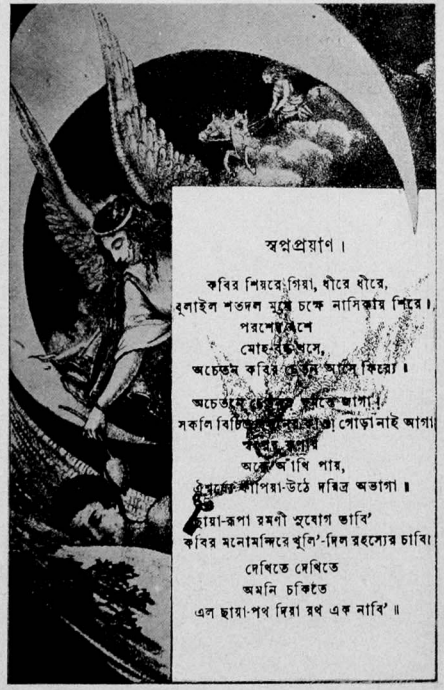

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর চিত্রায়ন।

বধূ।

"বেলা যে প'ড়ে এল, জল্‌কে চল্‌।"
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্‌।"

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,'
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী খোলো খোলো রয়েছে ফুটি'।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি'।

... ...

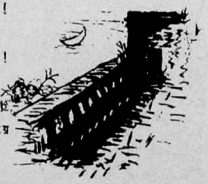

কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁগো!
উঠিলে নব শশি, ছাদের পরে বসি
আর কি উপকথা বলিবি না গো!
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

বিভিন্ন রসে ভরপুর হইয়াছে। একটির সঙ্গে আর একটির কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না; প্রত্যেকটিই মৌলিক ও নিজস্ব রসে উজ্জ্বল। এই চিত্রিত পুস্তকখানি নূতন সংস্করণ মুদ্রণ হওয়া উচিত।

ইহার পর উল্লেখ করিতে হয় তাঁহার চিত্রিত আরব্য উপন্যাসের সুবিখ্যাত চিত্রাবলী।

অবনীন্দ্রনাথের 'আরব্য উপন্যাসের' চিত্রাবলীতে তাঁহার অলৌকিক কল্পনা-শক্তি ও আঙ্গিকের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। এই কল্পনা-শক্তির বিশেষ পরিচয় আমরা পাই তাঁহার 'টাইপ' চিত্রে, তাহাদের যথাযোগ্য বেশভূষায় এবং পারস্য দেশের স্থাপত্য রূপের ও ব্যবহারিক আসবাবের নানা খুঁটিনাটিতে। এইসব স্থাপত্য রূপ, বেশভূষা, ও আসবাবের বাস্তবিকতার মধ্যে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী এমন সত্য রূপ নিয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাহার মধ্যে এইসব অলৌকিক কাহিনীর পরিবেশ ও ভাবমণ্ডল আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। য়ুরোপের একাধিক চিত্রকর (যথা, পোগোনি, এড্‌মান্‌ড্ ডুলাক্) আরব্য উপন্যাসের কাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন—তাঁহাদের চিত্রাবলীর সহিত অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী তুলনা করিলে বুঝিতে পারি তাঁহার কল্পনা-শক্তি ও উদ্ভাবনী প্রতিভা কত উচ্চ ধরনের। আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী ১৯৩০ সালের কিছু পরেই সমাপ্ত হয়। তাহার পর তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু লইয়া চিত্র রচনা করেন নাই। সুতরাং এই চিত্রাবলীকে তাঁহার চিত্র সৃষ্টির শেষ অধ্যায় বলা যাইতে পারে।

ইলাকা জয়শলমের

প্রবোধকুমার সান্যাল

বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যাল অন্যতম। হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দুর্লভ মণিকাঞ্চন যোগে অনন্য, প্রবোধকুমার গল্প, উপন্যাস এবং সর্বোপরি, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনায় বাংলা সাহিত্যে অভিনব স্বাদের এক নূতন অধ্যায় রচনা কোরেছেন।

পশ্চিম রাজস্থানের ধূসর আকাশে শরৎকাল সবেমাত্র শেষ হচ্ছিল। আশ্বিনের দিন আর নেই, কিন্তু ভিন্‌-দেশী পর্যটকদের আনাগোণা এখনও শুরু হয়নি। দূরের থেকে নতুন মানুষ দেখে রাজপুতানিরা এখনও বাঁ হাতে ওড়না টেনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরতে আরম্ভ করেনি। স্বর্মাটানা বাঁকা চোখে কৌতূহল এখনও দেখা যাচ্ছেনা।

দূর মরুভূমির উত্তর প্রান্তে হেমন্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

যোধপুর ফেলে এসেছি অনেক দূরে, কিন্তু ভারতের বৃহৎ মরুভূমি আরম্ভ হয়েছে তারও অনেক আগে। এই বিস্তীর্ণ মরুভূভাগের মধ্যে বোধকরি একমাত্র যোধ-পুরই যেন হরিৎবর্ণের সান্ত্বনা। এর পরে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ পথে সমাজ ও সভ্যতার চিহ্ন সামান্যই মেলে।

মধ্যরাত্রে পেরিয়েছিলুম 'ফালোদি' নামক ক্ষুদ্র জনপদ —যার চতুর্দিকে শত শত মাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ বালুসাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই জনপদটুকুর মধ্যেই সংসারযাত্রার সমস্ত বিধি-নিয়ম পালন করা চলছে। জন্ম-মৃত্যু-মিলনের বিচিত্র কৌতুক ওই অন্তহীন বালু-রাশির মধ্যেই আঘাতে-সংঘাতে সম্পন্ন হচ্ছে।

পোকারনে এসে পৌঁছলুম প্রত্যুষে। সমস্ত রাত্রি পুলিশ-প্রহরা ছিল গাড়ীতে, আগে জানা যায়নি। এ অঞ্চলে নাকি গাড়ী ও আরোহী নিয়মিত লুঠ হয়। সম্প্রতি নানা কারণে তাই আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে। আতঙ্কের সীমানা যোধপুর অবধি বিস্তৃত।

ডানদিক থেকে চতুর্থ উটের পিঠে লেখককে দেখা যাচ্ছে। উটের মিছিলের সংগে লেখকও চলেছেন।

পোকারনে কিছু কিছু সবুজের চিহ্ন মেলে। চাষ কোথাও নেই,—কয়েকটি গাছপালা দেখতে পাওয়া যায় মাত্র। জলের সন্ধান আছে অল্পস্বল্প,—গাড়ীতেও জল আসে। তিন চারটি দোকান রয়েছে এখানে ওখানে। কিন্তু খাবার না কিনে শুধু জল চাইলে ওরা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। সেই কারণে জলের ব্যাগ রয়েছে আমাদের প্রায় সকলেরই সঙ্গে। জলের অভাব সর্বাপেক্ষা ভীতিজনক। স্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা বালুপাথরে আকীর্ণ পথে নামলুম। লগেজ নিয়ে চলল রাজপুতানি কুলি-মেয়ে। জয়শলমের যাচ্ছিলুম।

প্রভাতকাল চোখ মেলছে ধীরে ধীরে। কিন্তু সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের শোভা নেই পশ্চিম রাজস্থানে। দুটোই যেন অগ্নিকুণ্ড, কেবল ধূলিধূসরতার একটা আবরণে ঢাকা। সূর্যোদয় আনে দুর্ভাবনা, সূর্যাস্ত হল সান্ত্বনা মাত্র। গ্রীষ্ম ও শীতের বাইরে আর কোনও ঋতুর ইশারা নেই। বর্ষাকাল নামক কোনও ঋতুর স্থায়িত্ব নেই, শুধু বালুর ঝাপটার সঙ্গে কখনও কখনও আসে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির চাবুক। সমস্ত বছর মিলিয়ে হয়ত বা তিন

বারোশো বারো শতকে রাজা জয়শাল কর্তৃক
জয়শলমেরের আগাগোড়া পাথরে নির্মিত দুর্গ।

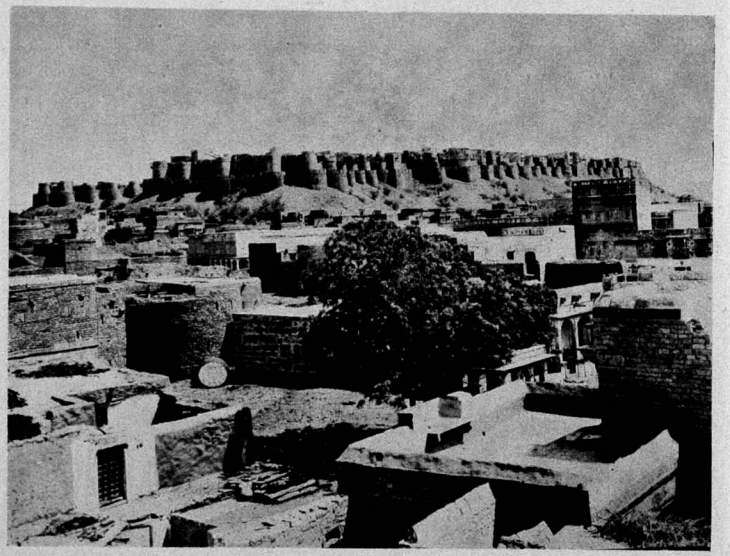

চার ইঞ্চি। শত শত বছরের মধ্যে নিয়মিত বৃষ্টি কেউ আশা করেনি; শস্যশ্যামল ফসলের মাঠ আছে কোথাও—কারও কল্পনা ততদূর এগোয় না। বৃষ্টির মেঘ যে পশ্চিম রাজস্থানের দিকে আসেনা তা নয়—আরব সাগর ছাড়িয়ে সৌরাষ্ট্র ও সিন্ধু পেরিয়ে, ওরা এসে মরুসমুদ্রের উপর দিয়ে উত্তাপে ছটফট করে চলে যায় উত্তর পাঞ্জাব আর কাশ্মীরের দিকে; কিন্তু পশ্চিম রাজস্থানের আকাশে ওরা দুদণ্ড দাঁড়াবার ঠাঁই পায় না। এখানকার মরু-লোকের বুক যখন চিতার আগুনে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, তখন আকাশ পথে বজ্রদণ্ডের অভিশাপ নেমে আসে বারম্বার, কিন্তু স্নিগ্ধ বারিবিন্দুর স্পর্শ তার মধ্যে থাকে বড়ই কম।

মোটর-বাস' জয়শলমেরের দিকে চলেছে। পিছন দিকে ফেলে এসেছি পোকারনের পুরনো দুর্গ। এগিয়ে চলেছি আমরা যেন এক মহৎ বিনষ্টির দিকে,—যেদিকের তরঙ্গায়িত মরুপ্রান্তরের ধূসর অস্পষ্টতা ছাড়া আর কিছু নেই। পথের আশেপাশে শুষ্ক তৃণগুল্ম আর পাথরের ডেলা, মাঝে মাঝে খোন্দল। বেলা ন'টা বেজে গেছে। বালু এখনও যথেষ্ট গরম হয়নি। আশ্রয় লাভের আশা কোথাও নেই, ছায়াপথের চিহ্ন দুরাশা মাত্র। বিস্ময়ের কথা এই, পথের প্রায়ই দুধারে দেখা যাচ্ছে বালুপাথরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে লতানে ডগা কুমড়ো শাকের মতো,—এবং তারই সঙ্গে ফল ধরেছে ছোট ছোট পীতহরিৎ বর্ণের বাতাবি লেবুর আকারে। মাইলের পর মাইল ধ'রে দেখছি, শেষ হচ্ছে না। কিন্তু সেই সুপক্ক সরস ফলের প্রতি যাত্রীদের কারও লোভ প্রকাশ পাচ্ছে না। বালুর গভীর তলে কোথাও আছে মাটি, আছে কোথাও অবরুদ্ধ প্রাণশক্তি,—সেখান থেকেই উঠে এসেছে জীবনের এই পরিচয়। অবশেষে পরম্পরায় জানা গেল, ফলটির নাম 'তুম্ব',—ওটা নাকি উট আর ভেড়ী-বকরির জরুরী অবস্থার খাদ্য। লবণাক্ত জলীয় বিস্বাদ একটা বস্তু,—ওটা নাকি মাঝে মাঝে ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর কোন কোন শ্রমিকেরও কাজে লাগে। মনুষ্য-জিহ্বার পক্ষে 'তুম্ব' সাধারণত অখাদ্য।

দশ মাইল পরে পথের পাশে একটি গ্রামের নাম পাওয়া গেল—'চাচা'। গ্রাম সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে, যেখানে জলের সন্ধান আছে। দুচারটি গাছপালা, বালুর নীচে জলের শীর্ণ ভাণ্ডার,—আর নয়ত উটওয়ালার কাছে জল কেনাবেচা। কোথাও কুয়া আছে বা। কতকাল আগে প্রাক্ পৌরাণিক যুগে, অথবা বৈদিক যুগেরও বহু কাল আগে—পশ্চিম রাজস্থানে ছিল নাকি সরস্বতী আর দৃষদ্বতী দুই নদী,—ওদের সেই অবলুপ্ত জলপ্রবাহের দাগ নাকি আজও বহু পর্যটক আবিষ্কার করতে থাকে, কিন্তু এখন দেখা যায় শুধু চিক্কণ পাথরের নুড়ি আর শামুকের কড়ি,—এবং এ দুটোই নদীপথের চিহ্ন। দূর থেকে 'চাচা' গ্রামের কয়েকটি বালু-পাথরের ঘর দোর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দুচারটি খেজুর গাছ, একটু আবটু ছায়া ঢাকা,—কিন্তু সূর্যের কর্কশ চক্ষু সেই ছায়ার মধ্যেও শান্ত হয়নি। তার দৃষ্টির আড়ালে মানুষ আত্মগোপন করার চেষ্টা পাচ্ছে মাত্র। ওদের সামাজিক আনন্দোৎ-সব সেই সময় সার্থক, যখন সূর্যকে এসে ঢাকা দেয় শাওনের কালো 'বাদল',—সেই বাদলের থেকে বৃষ্টি হোক আর নাই হোক'।

মাইল ছয়েক পরে আরেকটি গ্রামের সঙ্কেত পাওয়া গেল। এর নাম 'খেতোলাই'। গ্রাম অনেক দূরে, কিন্তু গাড়ী থামবে এখানে। কাঁটাগুল্মের ঝোপড়া দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে বিরস বিবর্ণ কয়েকটি নিষ্ফলা নিষ্পত্র ঝাউ, বালুডাঙ্গার আশেপাশে সেই অবশ্যম্ভাবী ফণীমনসা,—আর হয়ত মানুষের অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে একটি ইন্দারা, সেইখানে বসেছে গাঁও। পথিকের পক্ষে আতি-থেয়তা নেই, অভ্যর্থনা নেই—শুধু দেখে যাও সহনশীল মানুষের আশ্চর্য আত্মরক্ষণী শক্তি। অথচ ওই সর্ব-ব্যাপী অভাবের ভিতর থেকে যারা এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে, তাদের দিকে তাকিয়ে দুর্ভাবনার কারণ ঘটছে না। মারোয়াড়ী পুরুষের মাথায় লাল মখমলের মস্ত পাগড়ি, তাতে চুমকি জরির কাজ। পরনে বেলদার পাঞ্জাবী,—তা'তে রূপোর চেন-বাঁধা বোতাম; তা'র ওপর কারো বা বেগুনী মখমলের জ্যাকেট্। পা দুখানা ধুলোয় শাদা, কিন্তু সেই পায়ে জরিবাঁধানো নাগরা,—শিশোদিয়া এবং রাঠোর বংশের রাণারা চিরকাল ধরে যে ধরনের পাদুকা ব্যবহার ক'রে এসেছে। মেয়েদের পোশাক বর্ণবৈচিত্র্যে ভরা। মুখখানি প্রায়ই ফুরফুরে ওড়নায়

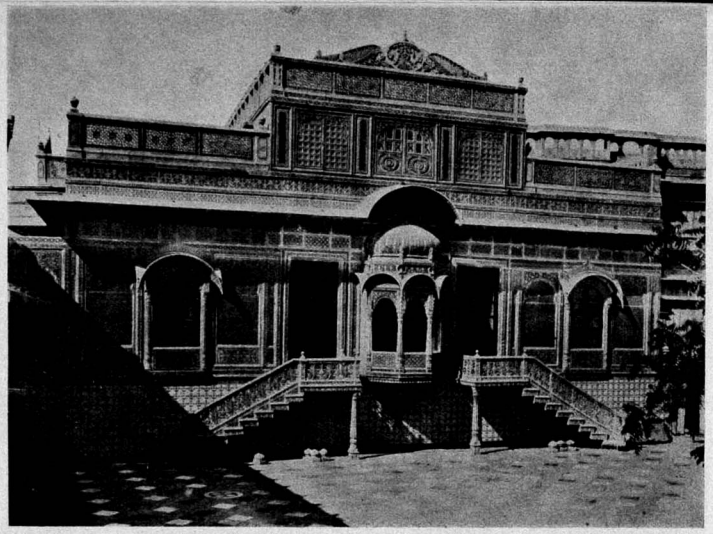

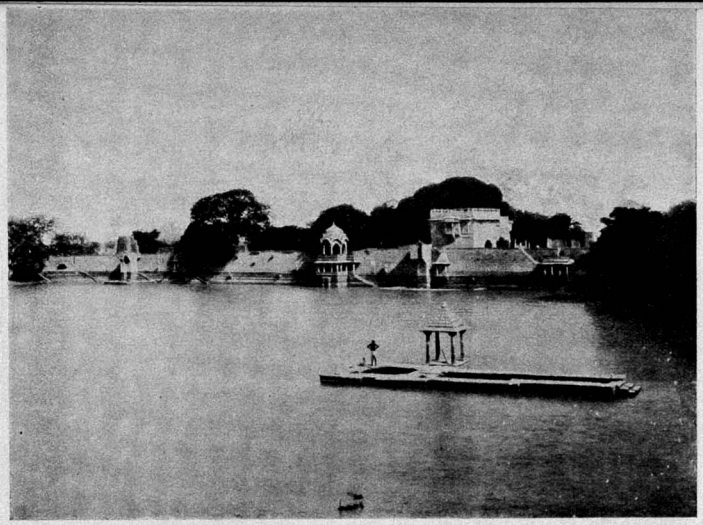

বাঁ দিকের পাতায় | জয়শলমেরের মহারাওল শ্রীরঘুনাথ সিং-এর প্রাসাদ।

ডানদিকের পাতায় | জয়শলমেরের তিন মাইল দূরে অবস্থিত অমরসাগর পুষ্করিণী।

ঢাকা। ওরই ভিতর থেকে হয়ত একটি বৃহৎ চক্ষু-তারকার বিদ্যুৎঝলক হঠাৎ কখনও বেরিয়ে আসে। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। কিন্তু স্বাস্থ্যের উপরিভাগ ঢাকা থাকে রেশমী কাঁচুলীতে, নিম্নভাগের প্রায় নাভিকুণ্ডলী অবধি অনাবৃত। কিন্তু ওরা জানে, সেই অনাবৃত অংশটায় মোহমদিরতা কম। সমগ্র দুই বাহুর সজীব স্বাস্থ্য দেখলে চমক লাগে। আঙুলের নখ কেবল নয়, আঙুলগুলিও প্রায় রং করা। চোখে কাজল, পায়ে রং। রং কোথাও নেই রাজস্থানে, কিন্তু রং নিয়ে মাতামাতি করেছে রাজস্থানীরা।

মোট আটাশ মাইল পেরিয়ে এসে পৌঁছলুম একটি দুর্গপ্রাকারের পাশে। এটি এককালে ছিল বৃহৎ জনপদ। এটির নাম 'লাঠি'। দুর্গের নামও এই। রক্তবর্ণ দুর্গ। সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে যত দুর্গ দেখেছি প্রত্যেকের বর্ণই লাল। যোধপুর, অম্বর, চিতোর, লাহেরা, খাইবার গিরিবর্ত্মের সেই শাগাই, গোয়ালীয়রের মানমন্দির, এলাহাবাদের দুর্গ, আগ্রা-দিল্লী,—এর ব্যতিক্রম নেই কোথাও। 'লাঠি' দুর্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে পথের ধারে। একদিন তার অহঙ্কার হয়ত ছিল, কিন্তু আজ কেবল 'অর্দ্ধলুপ্ত অবশেষ'। পারাবতের দল ঘোরাঘুরি করছে প্রাকারে ও চূড়ায়, জীর্ণ করে এনেছে মহাকাল, জৌলস চ'লে গেছে মরু হাওয়ার নিত্য ফুৎকারে—এখন শুধু পারাবতের কণ্ঠে চারিদিকের অন্তহীন শূন্যতাটা বালু-প্রান্তরের মাঝখানে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

শোনা গেল পোকারন ও জয়শলমেরের মধ্যপথে 'লাঠি' হল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জনপদ। এর অধীনেই রয়েছে নাকি প্রায় সবগুলি গাঁও, এবং এরই দুর্গের মধ্যে রয়েছে প্রহরীবেষ্টিত একটি অস্ত্রশালা। সম্প্রতি 'লাঠি' থেকে বুঝি দু'একজন মানুষ চুরি হয়ে গেছে, তাদের আজও তল্লাস মেলেনি। আমাদের মোটরবাস এসে থামবার আগেই টিলা-পাহাড়ের উপরে ও নীচে অনেকগুলি স্থানীয় নরনারী জড়ো হয়েছে। একদল মেয়ে তার-স্বরে একঘেয়ে গান ধরেছে। অন্যদল অধিকতরো উচ্চ কণ্ঠে কান্না জুড়েছে। মধ্যভারতে প্রথা আছে, কোথাও থেকে সুসংবাদ এলে ওরা দল বেঁধে মেঠো সুরে কাঁদতে বসে। চিঠি হাতে ক'রে খোলবার আগে কেঁদে নেয়। বিবাহের আমন্ত্রণপত্র হাতে পেলে পাড়ায় পাড়ায় কাঁদতে বেরোয়। বৃষ্টি নামলে গ্রাম-কে-গ্রাম কেঁদে আকুল।

আজকের গান ও বারোয়ারী কান্নার কারণটাও ওই কাছাকাছি। গ্রামের একটি মেয়ে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ী। বহু দূরদেশে তার শ্বশুরবাড়ী,—কম-সে-কম এখান থেকে মাইল পঁচিশেক। বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক আগে, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তার শ্বশুরালয়ে যাত্রা। প্রভাত-কাল থেকে তিনটি গ্রাম এসে জড়ো হয়েছে 'লাঠি'তে। কারো ঘরে আজ হাঁড়ি চড়েনি, বাসিমুখে কেউ জল দেয়নি। তরুণী বউটিকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে আগে গান ধরা হয়েছে, গানের সঙ্গে বুক-ফাটা কান্না। মেয়ের মাকে ধরে রয়েছে কয়েকটি স্ত্রীলোক,—পাগলিনী মা কাঁদতে কাঁদতে চারপাঁচজনের কোলে নেতিয়ে পড়েছে। বাপকে সেই রোদ্দুরে শুইয়ে কেউ পাগড়ি খুলে বাতাস করছে।

মোটর-বাস দাঁড়িয়ে রইল। ড্রাইভার এবং কন্‌ডাক্টর চোখ মুছছে। একটি যুবক একখানা হলুদ রংয়ের চাদর গায়ে চড়িয়ে আমার পিঠের দিকে বসে অনেকক্ষণ থেকে চোখের জল ফেলছিল। পাশ থেকে আমার পথের বন্ধু দেবীমল বললে, বেচারা ভি রোতেঁ হেঁ। প্রশ্ন করলুম, এ লোকটা কেন কাঁদছে?

দেবীমল জবাব দিল, কাঁদবে বৈ কি, ও যে মেয়েটার স্বামী! নিতে এসেছে।

কান্না না থামলে মোটর-বাস ছাড়ার বুঝি বিধি নেই। সুতরাং গাড়ী দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। রৌদ্র প্রবল হয়েছে। সকালের স্নিগ্ধতাটুকু সম্পূর্ণ লেহন করে নিয়েছে সূর্যরশ্মি। এখনও অনেক পথ বাকি, পঁয়ত্রিশ মাইলেরও বেশি। মরুপ্রান্তর থেকে এরই মধ্যে বাষ্প উঠছে কেঁপে-কেঁপে। যত দূর দৃষ্টি চলছে এদিক ওদিক, মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে বালুর উঁচু ডাঙ্গা, সেটার পিছনে ঝুঁকে পড়েছে দিগন্তের আকাশ। হঠাৎ সন্দেহ হয় সমুদ্র বুঝি নিকটবর্তী কিম্বা দূরবর্ত্তী কোন বৃহৎ জলাশয়,—কিন্তু মরুভূখণ্ডের প্রকৃতি এই। পিছনের অসমান ঢালু দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে।

অতঃপর চারিদিকের ক্রন্দন কলরোলের ভিতর থেকে পিতামাতার টানাটানি থেকে হিঁচড়ে ছাড়িয়ে অপর একটি যুবক অশ্রুসিক্ত চোখে সেই মেয়েটাকে কোনমতে গাড়ীতে তুলল। মেয়েটা ডুক্‌রে-ডুক্‌রে কী কান্নাটাই কাঁদছে। ওটি বড় ভাই—যেটি ওকে এখন ধ'রে রয়েছে। বড় ভাই রেখে আসতে যাচ্ছে বোনকে তার শ্বশুর-বাড়ীতে। স্বামীটি বসে রয়েছে একটি অমায়িক জন্তুর মতো। গাড়ীতে এবার স্টার্ট দেওয়া হল। বিস্ময়ের কথা এই, এতক্ষণ কেবল এই কারণে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য একজন ব্যক্তির মুখেও প্রতিবাদ ফুটলনা, বরং প্রত্যেক সহযাত্রীর সমবেদনাত্মক সম্মতি ছিল। ওদের মধ্যে বসে আমিও যদি রুমাল দিয়ে চোখ ঘষতুম,—বেমানান লাগত না কা'রো চক্ষে।

গাড়ীটি ছেড়ে যখন অনেকদূর চলল, তখন আমি সাহস ক'রে বড়ভাইটিকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, এত বেশি কান্না কেন, ভাই? নিতান্ত কনে-বৌ ত আর নয়!

বড় ভাইটি জবাব দিল, সে ঠিক কথা। তবে কান্নার কারণ আছে অনেক। একটি কারণ সকলের বড়।

লোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। দেবীমল হাসিমুখে বললে, হ্যাঁ, এবার বুঝেছি। অনেক বউ কাঁদে ওই একই কারণে!

বড় ভাইটি বললে, আপনি পরদেশী, এখানকার রেওয়াজ বুঝবেন না। আমার বোনটিকে তিন মাইল দূর থেকে জল এনে ঘরকন্না করতে হবে। বাড়ীর বৌ ছাড়া আর কেউ জল আনে না। দিনে ক'বার জল আনতে হবে, জানেন? 'জেঠ্‌-মাহিনেমে' আপনি এদিকে এসেছেন কখনও?

দেবীমল বললে, বৌদের জন্যে এদেশে সবাই কাঁদে, বাবুসাব।

দৃষ্টি ঝলসে যাচ্ছে বাইরের দিকে চেয়ে। বাতাসে বালু উড়ছে কোথাও কোথাও। দশ মিনিটে নিজের থেকেই বালুর ডিবি পাহাড়ে পরিণত হয়ে ওঠে। সেখানে মানুষ যদি দৈবাৎ পড়ে যায়,—নিশ্চিত সমাধি। উত্তপ্ত বালু তুষের আগুনের মতো দগ্ধ করবে শ্বাসরুদ্ধ জীবন্ত মানুষকে। কিন্তু এখন আশ্বিনের শেষ, বায়ু ও বালুর ঝাপটা কম।

'লাঠি'র পরে গ্রামের চিহ্ন বড় কম। মরুভূমির ভীতিজনক অভিজ্ঞতা যেন এখান থেকে বৃদ্ধি পায়। আকাশের বিবর্ণতা মনে যেন শঙ্কা আনে। মহাশূন্যে মেঘ ভাসে, একথা ভুলে যেতে হয়। পৃথিবীতে মাটি আছে মনে থাকেনা। সমগ্র বাতাবরণ ভরে থাকে কেমন একটা ধূম্রজালে, যার নীচে দিয়ে অন্তহীন মরুলোক দূর দিগন্তে গিয়ে হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে পথের পাশে এক একটি উট, এবং তার নাকের দড়িটি ধরে রয়েছে যে রক্ষীটি—সে-ব্যক্তির চেহারা আমার অচেনা। মাঝে মাঝে ভেড়া এবং বৃহদাকার ছাগলের পাল নিয়ে যারা চলেছে, তাদেরকেও আমি চিনিনে। এরা জৈন মারোয়াড়ী নয়, এরা মরুভূমির মানুষ। ভারত-বিভক্তির আগে এটি ছিল বাণিজ্য পথ। বেলুচিস্তান, সিন্ধু, খয়েরপুর, বাহ্বালপুর থেকে যারা পূর্ব রাজস্থান পর্যন্ত এসে আমদানি রপ্তানির ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত, তাদের সেই বাণিজ্য আজ বন্ধ। এরা তাদেরই গোষ্ঠিভুক্ত, তাদেরই সম্প্রদায়ের লোক। স্বাধীন হয়েছে দুই দেশ, কিন্তু এরা তার অভিশাপ বহন করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে বারমের পর্যন্ত বোধকরি আজও ট্রেন চলে, কিন্তু তারপরে সিন্ধু এবং রাজস্থানের মধ্যকার প্রাণসূত্র গেছে শুকিয়ে। আমাদের জানা এবং শোনার বাইরে রাজস্থান মরুভূমির যে বিশাল বাণিজ্যিক জীবনটা ছিল লোকলোচনের বাইরে সেটি আজ আকণ্ঠ দারিদ্র্যে ধুকধুক করছে। সেই পথ আছে, সেই মানুষ এবং সুযোগ সুবিধাও আছে, কিন্তু সেই অব্যাহত জীবনের আদান প্রদানের ব্যাপারটা রুদ্ধ হয়ে গেছে। বালুপাথরের পাহাড়ের জটলায়,

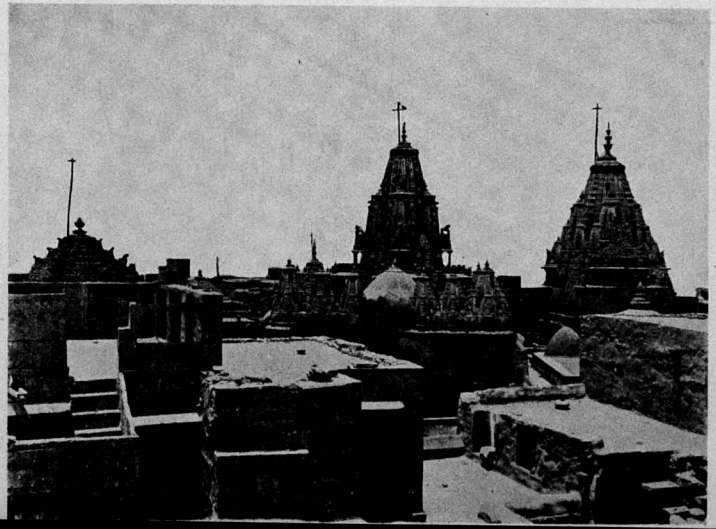

ডানদিকের প্যাতায় | জয়শলমের দুর্গস্থিত জৈন মন্দির।

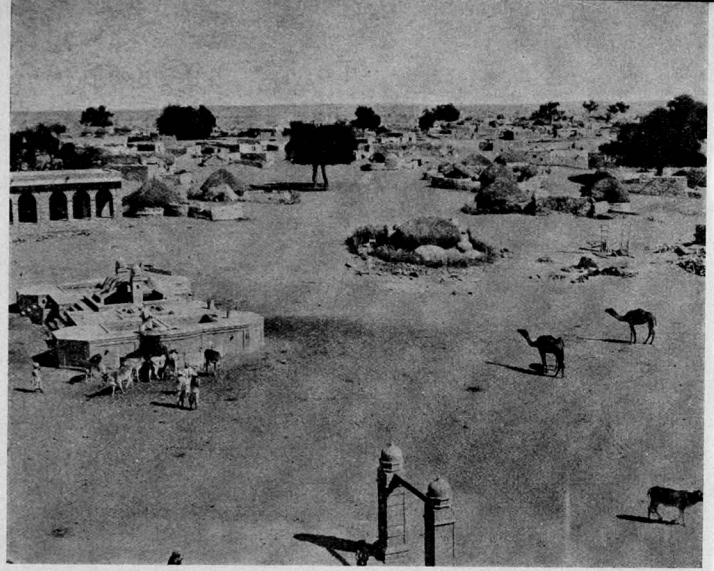

বাঁ পাতার উপরে | চল্লিশ মাইল দূরে, মোহনগড়ের পুলিশ ফাঁড়ি।

বাঁ পাতার নীচে | জয়শলমের, রাজস্থান।

রিক্ততায় এবং তৃষ্ণায়, চক্ষু বুজে প'ড়ে রয়েছে পশ্চিম রাজস্থান। ঐশ্বর্য সম্পদের সমস্ত পথ বালুর মধ্যে গেছে হারিয়ে।

সামনের দিকে দশ মাইল দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জয়শলমেরের বিশাল দুর্গ। দূর থেকে তার মহিমা অনেকটা যেন উদ্ধত শাসনের মতো। চারিদিকে তার দিগন্ত জোড়া সীমাহীন মরুভূমি, এরই মাঝখানে একা নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দুর্গ কালজয়ী স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। আশে পাশে বালুপাথরের পাহাড় চলে গেছে ডাইনে-বাঁয়ে দূর দূরান্তরে। মাঝে মাঝে সচেতন করে দিচ্ছে বালুপাথরের সঙ্গে চিক্কণ নুড়ির জটলা। হঠাৎ যদি কেউ এসে বলে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখান দিয়ে নদী বয়ে যেত সুশীতল জলপ্রবাহ নিয়ে, অবিশ্বাস করার কারণ ঘটবে না। কেননা নদীপ্রবাহের বহু লক্ষণ এখানে প্রত্যক্ষ। জল শুধু নেই, আর আছে সব। কোথাও মূল উৎস শুকিয়ে গেছে, অথবা গতিপথ অন্যত্র চলে গেছে,—সুতরাং এই মরুলোকে তার প্রাণ-ধারা গেছে হারিয়ে। যেমন পূর্ব-কলকাতায় হারাচ্ছে বিদ্যাধরী, যেমন দক্ষিণ-কলকাতায় হারাচ্ছে আদিগঙ্গা। ত্রিবেণীর একটি বেণী যেমন হারিয়ে গেছে হুগলীতে। প্রয়াগ-সঙ্গমে একটি ধারা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুকালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীকেও যেমন ভুলে যেতে হবে।

আশ্বিনের শেষ প্রান্ত, কিন্তু প্রায় মধ্যাহ্নকালে যখন এসে জয়শলমের পৌঁছলুম তখন মনে হল বৈশাখের খররৌদ্র। আমার অভিজ্ঞতার কিছু বাকি ছিল। আমার বিশ্বাস, সমগ্র রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেকটি শহর ও জনপদ আমার জানা। কিন্তু জয়শলমেরের সঙ্গে তাদের কোথাও মিল নেই। এ শহরের ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ত আজকে শেষ হয়েছে। বাণিজ্যের কেন্দ্র এখন আর নেই, সামন্ত রাজার দখল গিয়েছে চলে, রাজস্বের মোটা অঙ্কটা স্বভাবতই আর থাকার কথা নয়। সুতরাং শীঘ্র যদি জয়শলমেরের অবলুপ্তির সংবাদ শোনা যায়, বিস্মিত হবার কিছু নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে অমন শত সহস্র নগরের বিলুপ্তির কাহিনী জমা আছে। আমাদের দেশেও এমন কাহিনী অগণিত।

ভাঙ্গাচোরা অগোছালো ছোট শহরে পৌঁছে গাড়ী যেখানে থামল, তার আশেপাশে বালুপাথরের জটলার ফাঁকে ফাঁকে পাথরের ঘর। এটা হাটের কেন্দ্র। অল্পস্বল্প কাপড়-চোপড়ের দোকান পাট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সব মিলিয়ে এত সামান্য, যা দৃষ্টিকটু। অলিগলি দেখছি আশেপাশে, কিন্তু সেগুলি পথ নয়। কয়েকটি পাথরের ঘরের আশেপাশে হেঁটে যাবার অবকাশ মাত্র। সমস্ত শহরটি ধ্বংসস্তূপে আকীর্ণ এমন কথা বলব না, কিন্তু আগাগোড়া এলোমেলো এবং অগোছালো স্তূপাকার পাথরের জটলাকে শহর বলতে বাধে। যদি কেউ বলত, একটু আগে সমগ্র জয়শলমের আণবিক বোমা পতনের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তা হলে বিশ্বাস করা চলত। এমন দরিদ্র হতভাগ্য এবং সর্বহারা শহর রাজস্থানে একটিও নেই।

দিল্লীর সামরিক দপ্তরের চিঠি ছিল সঙ্গে, সুতরাং আমার পথ ছিল অবারিত। কিন্তু তবু আমাকে পুলিশ

লাইনে জায়গা নিতে হল,—যেটার নাম পুলিশ ক্লাব। এর কারণ, পর্যটকের পক্ষে তিনটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু এখানে নেই। আশ্রয়, আহার্য ও আরাম। হোটেল ধর্মশালা নেই। অতিথিশালা আছে কিনা খবর পাইনি। খাদ্য কোথাও নেই,—একটি দোকান পর্যন্ত নেই। যারা কিছু খায়, হাতে বানিয়ে খায়। শাকসব্জির চিহ্ন কোথাও চোখে পড়ছে না। গরু-মহিষের নাম গন্ধ কেউ জানে না। জল অথবা জলাশয় কোথাও দেখিনি, জল আনতে হয় দূরের থেকে। জলখাবার কিছু চেয়ো না, লজ্জা ছাড়া আর কিছু পাবে না। একথা যদি কেউ বলে, পুলিশ লাইনে সব মেলে, তাহলে বলব,—সেও ভুল। ভেজাল-মেশানো গমের রুটি আধ-পোড়া,—কারণ জ্বালানীর অভাব। নুন এখন পাওয়া যাচ্ছে না জয়শলমেরে, পেঁয়াজের রাঙ্গা-রাঙ্গা কুঁড়ি মিলছে, ডাল সিদ্ধ করবার মতো আগুন নেই। ছাগলের মাংস কেউ আনেনা। যদি বা জোটে তবে আধসিদ্ধ। পাওয়া যায় কেবল লাল লঙ্কার গুঁড়ো। অতএব কাঁচা পেঁয়াজের কুঁড়ি, লঙ্কার গুঁড়োগোলা অর্ধপক্ক 'রহর-দাল'—আগাগোড়া আলুনি,—তার সঙ্গে ঘাসের জঞ্জাল মেলানো আধপোড়া রুটি! এবম্প্রকার উপাদেয় খাদ্য যদি সেই প্রখর রৌদ্রে অস্নাত ঘর্মাক্ত কলেবরে ব'সে গলাধঃকরণ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, হায়রে অন্তত একটু নুন যদি পেতুম!

পুলিশ ক্লাবের ছাদে পাওয়া গিয়েছিল আশ্রয়। নীচের তলাটা পাথরের গুহাগহ্বর, সেটা বাসযোগ্য নয়। ছাদের একটি অংশ ঢাকা, বাকিটা খোলা। বৃদ্ধ এক খিৎমদগার এক বালতি জল এনে দিয়ে গেল আমার ব্যবহারের জন্য।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ লাইনের ভিতরে। সেটা এক বিশাল পাথরের ব্যারাক বাড়ী। ওটা সশস্ত্র কোতোয়ালী পুলিশের কেন্দ্র। ফৌজী পুলিশ বললে বোধ হয় ভুল হয়না। পোষাক টুপী একই রকম। সৈন্যদল বলো ক্ষতি নেই। আমার চিঠিখানা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পুলিশ সাহেব পাঠ ক'রে খুশী হলেন। কিন্তু পুলিশলাইনে সেদিন একটি বিশেষ ক্ষিপ্রগতি তোড়জোড় এবং নাটকীয় উৎকণ্ঠা দেখছিলুম। একটির পর একটি ট্রাক সশস্ত্র সেপাইদলকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী মরুপ্রান্তরে নেমে যাচ্ছিল, এবং বড়-সাহেবের সহকারী সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছিলেন।

আমাকে নিয়ে বড়-সাহেব ঘরে ঢুকলেন। পাথরের একটি নিরিবিলি ঠাণ্ডা ঘর। সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, আজকের ব্যাপারখানা কি?

তিনি বললেন, আজ আমাদের অপারেশন্ চলছে। গতকাল অপরাহ্নে তিনজন 'বাণিয়া' চুরি গেছে 'নাচ্‌না' গ্রাম থেকে। তাদের উদ্ধারের জন্যই এত তোড়জোড়।

কারা চুরি করেছে?

সাহেব বললেন, কুখ্যাত ডাকাত ভূপৎ সিংয়ের দল! মানুষকে ধ'রে নিয়ে যায় খয়েরপুর, কি বাহ্বালপুরের দিকে। এদিক থেকে 'মুক্তিমূল্য' পাঠালে তবে ছাড়া পায়। ওরা এখনও আমাদের সীমানার বাইরে যেতে পারেনি।

বললুম, কেমন করে বুঝলেন?

হাসলেন বড়-সাহেব। বললেন, আপনি যেতে চান অপারেশনের সঙ্গে?

আমিও হেসে বললুম, এই মুহূর্তে! পা বাড়িয়েই আছি।

কেন যেতে চাইছেন বলুন ত?

বললুম, নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ!

বড়-সাহেব কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, তাহলে দুটি জিনিসের প্রতিশ্রুতি আপনার কাছ থেকে পাওয়া দরকার। একটি এই, আপনার জীবনের জন্য দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না, কারণ এটা মরুভূমি। অন্যটি হল, আমাদের কোনও কর্ম-তৎপরতার সংবাদ আপনি কোথাও প্রকাশ করবেন না।

দুটি প্রতিশ্রুতি অকুণ্ঠভাবেই দিলুম।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ। অক্টোবরের মাঝামাঝি। 'নাচ্‌না' গ্রামে তিনজন ধনবান 'বাণিয়া' এসেছিলেন পারিবারিক প্রয়োজনে। বহুলোকের ধারণা জয়শলমেরে ভূপৎ সিংয়ের গুপ্তচরদলের একটি আড্ডা আছে, এবং সেই আড্ডা থেকেই সম্ভবত ভূপৎ সিংয়ের কাছে খবর পাঠানো হয় পূর্বোক্ত বাণিয়া তিনজনের আগমন সংবাদ। নানাবিধ ইশারা এবং সঙ্কেত আছে এই আড্ডায়, আছে যথাকালের নিশানা। মরুভূমির ভিতর দিয়ে বিশেষ পথের চিহ্ন ধরে অপহরণকারীরা যখন আসে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে,—তখন সহজে তাদেরকে দেখা যায় না। ওরা আসে বালুময় টিলা পাহাড় আর টিবির তলায় তলায়। বনে জঙ্গলে বাঘ যেমন নালীপথের ভিতর দিয়ে এসে হঠাৎ আক্রমণ করে, ঠিক তেমনি তিন চারটি উট নিয়ে জন আষ্টেক দশ ডাকাত লুকিয়ে-লুকিয়ে এসে অতর্কিতে হানা দেয়, এবং মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে দৌড় দেয়। সম্ভবত এই কারণেই জয়শল-মেরে বসবাসকালে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরত একজন সরকারি গোয়েন্দা এবং জনৈক সশস্ত্র পার্শ্বচর। পুলিশ সাহেব জানিয়েছিলেন, এখান থেকে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও সময়ে অপহৃত হতে পারে। বিশেষ করে যিনি অন্যমনস্ক নবাগত ব্যক্তি, তাঁর পক্ষে সমূহ বিপদের ভয়। তা ছাড়া, সবিশেষ লজ্জার কথা, আমার চেহারা-টাও নাকি বাণিয়াদের মত! পুলিশ সাহেব আমাকে একটু নেকনজরে দেখেছেন দিল্লীর চিঠিখানার জন্যই। সামরিক দপ্তরকে ধন্যবাদ।

যে-মরুভূমিকে স্পষ্টত আমরা দেখি সেটি তার আসল চেহারা নয়। ওর মধ্যে বালু পাহাড়ের খদ আছে, ঢালুপথের সুবৃহৎ নাবাল ভূমি অদৃশ্য হয়ে আছে, এবং যুদ্ধসজ্জাসহ যদি কোন সৈন্যদল একপাল উট নিয়ে ঠিক পথ ধরে দূর থেকে এগিয়ে আসে, তাহলে অনেক সময় উটের নাকের ডগাটিও দেখতে পাওয়া যায় না। জয়শলমের জেলায় যে অধিবাসীরা থাকে তারা রাজস্থানী বটে, কিন্তু সবাই মারোয়াড়ী নয়। ওখানে নানা যুগের নানা গোষ্ঠির বসবাস। এককালের শ্বেত হুনরা যেমন তাদের বংশ পরম্পরা রেখে গেছে আধুনিক শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে,—তেমনি আরব, হুন, এক-শ্রেণীর পাঠান, বালুচ, তাতার প্রভৃতির বংশধররা ছড়িয়ে রয়েছে রাজস্থানে এবং খয়েরপুর, সিন্ধু, বাহ্বালপুর ইত্যাদি অন্যান্য অঞ্চলে। এরা অনেকেই আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রে আজও এসে পৌঁছায়নি। ওদের নিজস্ব যে জীবনযাত্রাটা এতকাল ধ'রে অনাহতভাবে চলে আসছিল, আধুনিক রাজনীতির ধাক্কায় সেটা মার খেয়েছে। ফলে তাদের একটা অংশ আছে এপারে, অন্যটা ওপারে। ওদের প্রধান কারবার হল চামড়ার ব্যবসায় এবং ভেড়া ছাগল উট প্রভৃতি জন্তুপালনের কাজে ওরা লিপ্ত থাকে। এদেরই মধ্যে অনেক সন্দেহভাজন ব্যক্তি থেকে গিয়েছে জয়শলমেরে, যাদের গতিবিধি কিছু ছায়াচ্ছন্ন। অনেকের ধারণা, এদেরই সঙ্গে ভূপৎ সিংয়ের দলের যোগসাজস রয়েছে।

ঘটনাটা ঘটে অপরাহ্ণ কালে, এবং দিনমানের মধ্যে এই সময়টাই নাকি অপহরণের পক্ষে প্রশস্ত। তিন মাইল দূরে 'নাচ্‌না' গ্রাম, সেটি বালু প্রান্তরেরই কোলে। উটের দল এবং তাদের রক্ষীদের গতিবিধির মধ্যে সন্দেহের অবকাশ কিছু ছিল না। ভিন্‌দেশীরা এসে মিলে গিয়েছিল স্বজনদের মধ্যে। ওরা বাণিয়া তিন-জনকে ধরে একে একে উটের পিঠে চড়িয়ে চম্পট দেয়, বাধা পায়না কোথাও। অপরাহ্ণকালে উত্তীর্ণ হয়, মরুভূমির উপরে সন্ধ্যার ধূসরতা নামতে থাকে। ঢালুপথ দিয়ে ডাকাতের দল অদৃশ্য হয়ে যায়। এই নিয়ে আটটি ঘটনা ঘটল এক মাসের মধ্যে।

অতঃপর যে-বর্ণনাটি মনোযোগ সহকারে শোনা গেল, তার সত্য মিথ্যার দায়িত্ব আমার নয়। ডাকাতরা এক বিশেষ পদ্ধতিতে নাকি তাদের উটগুলিকে শিক্ষা দেয়। যে সকল অপহৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মুক্তিমূল্য পাওয়া

যায় না, তাদেরকে হত্যা ক'রে তৈলযোগে তাদের মাংস সিদ্ধ ক'রে উটগুলিকে বলপূর্বক খাওয়ান হয়। এতে নাকি উটের কায়িক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং একটি রাত্রির মধ্যে তারা পঞ্চাশ থেকে একশ' মাইল অবধি দৌড়ে মরুভূমি অতিক্রম করে। এইপ্রকার দৌড়বাজির শিক্ষাও তাদেরকে বলপূর্বক দেওয়া হয়ে থাকে।

সমস্ত বর্ণনাটার বাস্তব চিত্রটি এমন খুঁটিনাটি সহযোগে আমার চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল যে, আমার পক্ষে বিশ্বাস করতে বাধেনি।

খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দিতে রাওল জয়শল একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপরে এই প্রস্তর-শহরটি নির্মাণ করেন। রাজস্থানের রাজারা ছিলেন সূর্যবংশীয়, কিন্তু রাজা জয়শল ছিলেন চন্দ্রবংশী, এবং কথিত আছে তিনি নাকি যাদবরাজ শ্রীকৃষ্ণের মূল বংশোদ্ভূত সন্তান। এই শহরটিকে তিনি সুউচ্চ প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। শহর এবং দুর্গ অঙ্গাঙ্গীযুক্ত। দুর্গপ্রবেশের পথ এবং শহরের এলাকা এখনও অতি দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। কিন্তু অন্যত্র যেমন, এখানেও প্রায় তেমনি। ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র তথা কামান এসে পৌঁছবার আগে ওপরে দুই বিভিন্ন প্রকার দুর্গ নির্মিত হয়। এ দুর্গটি প্রাচীন ধরনের।

একদিন সকালের দিকে গিয়ে প্রবেশ করলুম দুর্গ-মধ্যে। এইটির আকর্ষণই ছিল আমার পক্ষে সর্বপ্রধান। সঙ্গে ছিল আমার নিত্য সঙ্গী সেই যুবকটি,—যার নাম বাবুলাল কেলা। দুর্গের বাহির অংশের যেমন মহিমা, ভিতরে তেমন নয়। অতি প্রাচীন অলিগলি, যার শ্রী নেই কোথাও। ভিতর অঞ্চলটি একটি গ্রাম এবং দুচারটি দোকানপাট সমেত স্থানীয় নরনারীর বসবাস। চেহারাটা আগাগোড়া ভগ্নাবশেষ,—চিতোরের দুর্গটিকে স্মরণ করায়। ওরই মধ্যে ধোপার বাড়ী আর ছাগলের খোঁয়াড়। যে কয়টি অট্টালিকা ছিল তার অনেকগুলি জরাজীর্ণ, এবং বাকিগুলো নোংরা ফেলার জায়গা। লর্ড কার্জনের আমলের সেই নীল রঙের অবশ্যম্ভাবী সাইনবোর্ড এখনও রয়েছে, কিন্তু সে-অনুশাসন কে কতটুকু মানছে? এটি অম্বর-উদয়পুর-যোধপুর বা আজমের নয়,—এখানে অনাদর আগাগোড়া। পাথরে পাথরে কারুকীর্তি কালক্রমে ক্ষয় হয়ে এসেছে, নক্সাটা এখন আর বিশেষ বোঝা যায় না। কিন্তু ওরই মধ্যে টুকরো ভাস্কর্যের অবশেষটুকু মনে-মনে রোমাঞ্চ আনে। খিলানগুলির জোড় আলগা হয়েছে, কিন্তু তাদের বিশালতার মহিমা সম্ভ্রমবোধের উদ্রেক করে। আটশ' বছরের মধ্যে এক একটি চল্‌তি কাল নিজের প্রয়োজনে অনেক চিহ্ন রেখে গেছে নানা ক্ষেত্রে, কিন্তু কোথাও সেই মহিমার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আধুনিক যুগে এসে দেখছি, এইসব পুরাকীর্তি এবং স্থাপত্যের প্রয়োজন ফুরিয়েছে মানুষের জীবনে। বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধিতে মানুষের মন এখন অণুপ্রাণিত।

মহাকালের আঘাতে দুর্গের অধিকাংশই বিধ্বস্ত হয়েছে, সুতরাং এই ভগ্নাবশেষের জটলার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে চারিদিকের মরুপৃথিবীর দিকেই দৃষ্টি ফিরে ফিরে যায়।

অবশেষে এক সময়ে এসে পৌঁছলুম পাশাপাশি দুটি জৈনমন্দিরের মাঝপথে। এ মন্দির দুটি সমগ্র জয়শলমেরের মধ্যে একমাত্র দ্রষ্টব্য শুধু নয়, বোধ হয় এ শহরের এই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ এসে যেন ঢুকলুম কোন একটা অমর্ত্যলোকে। মহাকবির ভাষায়, 'সাম্প্রতের আবরণ সরে গেল'। জৈন এবং বৌদ্ধ,—এ দুটি ধর্মসম্প্রদায় ভারতে পাশাপাশি এসে একদা হাজির হয়েছিল। স্বয়ং মহাবীর ছিলেন গৌতম অপেক্ষা ছাব্বিশ বছর বয়সে বড়। মহাবীরের দ্বারা গৌতম সেকালে এতটুকুও অনুপ্রেরণা লাভ করেননি,—এও নিশ্চিত বলা চলে না। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধ অভিমত মহামহীরুহে পরিণত হয় এবং জৈন অভিমত অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করে। সর্বত্র দেখেছি মহাবীরের প্রস্তর-মূর্তির সঙ্গে বুদ্ধের মিল আছে অনেক। শুধু মহাবীরের মুখ-চোখ একটু গোল ধরনের এবং কান দুটি একটু বড়। দুর্গের মন্দিরে ঢুকে এটা ভাবতে হল, এটি জৈন অথবা বৌদ্ধ। মন্দির অথবা দেবস্থান একটি নয়। ওরই মধ্যে রয়েছে শিব ও শক্তির উপাসনার ঠাঁই, ওরই মধ্যে বুদ্ধের স্থাপনা। কিন্তু মূলত এটি জৈনমন্দির, বাকিগুলি এসেছে কালক্রমে। যেমন সেদিন দেখে এলুম ভাগলপুর ছাড়িয়ে মন্দার পাহাড়ে। চূড়ায় একটি আদিনাথের মন্দির, কিন্তু নীচের দিকটায় শঙ্করনারায়ণ,—এবং গুহার পাশে রয়েছেন নরসিংহ।

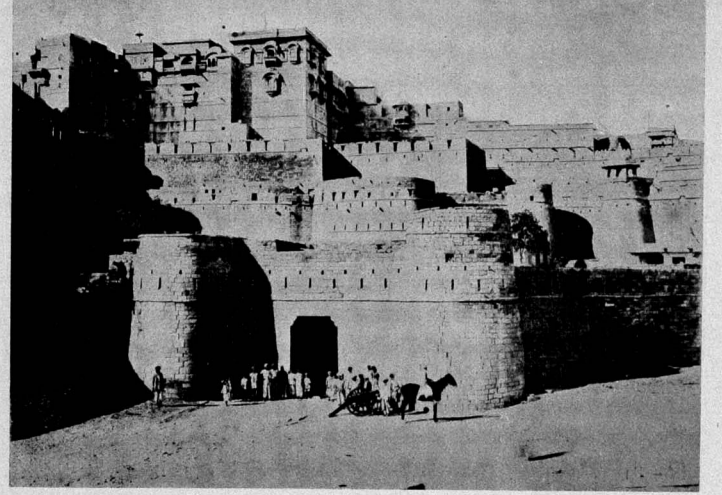

। জয়শলমের দুর্গের প্রধান তোরণ।

মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলুম। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে এ মন্দির দুটি, এই দুর্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। দুর্গের সঙ্গে এর কোনও আত্মিক যোগ নেই। কিন্তু জৈনরা এই মন্দির নির্মাণ কালে এই দুর্গটিকেই নিরাপদ ঠাঁই মনে করেছিল। তবু এর আয়ু অল্পদিনের নয়। এর ভিতরকার দুর্লভ সামগ্রীগুলি মিলিয়ে দেখলে অনুমান করা যায়, কোন কোন বস্তু হাজার বছরেরও আগেকার সময়ে সংগৃহিত। দুর্গ প্রাচীন, মন্দির প্রাচীন নয়। মন্দিরের সজীব ভাবটি এখনও বর্তমান। মন্দির গাত্রে খোদিত যে-ভাস্কর্য শিল্প এখনও সতেজ রয়েছে, বোধ হয় এ প্রকার সার্থক শিল্পকলা ভারতের যে কোন অংশেই বিরল। এক একটি পাথর খণ্ড বসিয়ে এক একটি সম্পূর্ণ পৌরাণিক গল্পের দৃশ্যকে খোদাই ক'রে চিত্রিত করা হয়েছে। বোধ হয় অন্য কোথাও স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য ঠিক এমনভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। আমার মুগ্ধচক্ষু চারিদিক থেকে যেন এই মন্দিরকে লেহন করে ফিরতে লাগল।

প্রথমে মনে করেছিলুম ভিতরে যে অগণিত মূর্তি রয়েছে সেগুলি বুদ্ধের, কিন্তু সেটি সত্য নয়। মোট এক সহস্র মহাবীরের মূর্তি এখানে স্থাপিত। এক সহস্র! অবাক লাগে বৈ কি! এই সহস্র মূর্তির দুই সহস্র স্ফটিক চক্ষু দপদপ করে জ্বলছে ছায়ান্ধকারে। ছোট, বড়, মাঝারি,—সব মিলিয়ে হাজার। লাল, কালো, শাদা, হরিৎ, রজনীল, পীত, পাটল,—বর্ণবৈচিত্রের বন্যা বয়ে চলেছে চারিদিকে। প্রত্যেকটি পাথরের রং মৌলিক এবং বহু দেশ-দেশান্তর থেকে এইসব বিশেষ বিশেষ বর্ণের পাথর সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। বিস্ময়ের কথা, কোনটি নিষ্প্রভ হয়নি, কোনটিতে ক্ষয় ধরেনি। মনের উপরে একটি মোহ বিস্তার করে, সেটি এখানে না এলে উপলব্ধি করা যায় না। হঠাৎ সন্দেহ হয়, দুই হাজার জীবন্ত চক্ষু সকল দিক থেকে তোমাকে অপলকভাবে লক্ষ্য করছে, এবং এই চেতনাটি সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। প্রাণ একটি আছে, একটি নিঃশব্দ ভাষা ঘুরছে ওই অন্ধকারে, চাপা কণ্ঠের কিছু যেন কানাকানি, তোমাকে দেখে সবাই যেন একটু সতর্ক,—এমনি একটি ভাব তোমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এই মন্দিরের সংলগ্ন আরেকটি দুর্লভ সামগ্রী হল, একটি অতি প্রাচীন জৈন গ্রন্থাগার। ভারতবর্ষের আর কোথায় হাজার বছর আগেকার একটি গ্রন্থাগার আছে, আমার জানা নেই। শুনলুম মাস ছয়েক আগে প্রধান-মন্ত্রী নেহরু এসেছিলেন এই গ্রন্থাগারটি দেখার জন্য। গ্রন্থাগারটির নাম 'জিনভদ্র জ্ঞান-ভাণ্ডার'। অনেকে বলে, ভারতের প্রাচীনতম পুঁথি তথা গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় তিব্বতের কোন কোন গুম্ফায়। কিন্তু একমাত্র এই জয়শলমেরের দুর্গ যেখানে আজও ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থের তথা পুঁথির সাক্ষাৎ মেলে। কোন কোন পুঁথির বয়স হাজার বছরেরও বেশী। চারশোর বেশি পুঁথি তালপত্রে লেখা। এক হাজারের বেশি পুঁথি কাগজে লেখা। সেই মধ্যযুগে এই তালপত্রগুলি বিশেষ চেষ্টায় আনা হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া থেকে, এবং প্রতি পত্রে চার থেকে আট ছত্র অবধি তৎকালের প্রচলিত নাগরী হরফে লেখা। সব পত্রগুলি দৈর্ঘ্যে সমান নয়, একটি প্রায় তিন ফুট লম্বা। প্রত্যেকটি অক্ষর কালিতে লেখা, কিন্তু সেই কালি অদ্যাবধি সতেজ। এমনভাবে সুচিত্রিত এবং সুরঞ্জিত কাঠের ঢাকায় এগুলি সুরক্ষিত যে, দেখলেই আনন্দ হয়। তৎকালীন ভাষা আমাদের পক্ষে বোধগম্য নয়, কিন্তু একথা জানতে পারলুম যে জৈন ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও এখানে দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, অলংকারশাস্ত্র—প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যাযুক্ত পাণ্ডুলিপি নাকি এই গ্রন্থাগারের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বৌদ্ধদর্শনের উপর লিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এইখানেই নাকি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়।

প্রাচীন ভারতের কোন এক জনপদে যেন এতক্ষণ হারিয়ে গিয়েছিলুম। ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম যেন এতক্ষণ সরস্বতী আর দৃষদ্বতীর তীরে তীরে। একটি সময়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলুম দুর্গ থেকে। আনন্দে ভারাক্রান্ত মন।

বাবুলাল যোগাযোগ করে দিল, এবং তারই সহায়তায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হল মহারাওল রঘুনাথ সিংয়ের প্রাসাদে। বেলা অপরাহ্ন। চারিদিকের ভগ্নপাথরের জটলা এবং পাথুরে গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে এমন যে একখানি প্রাসাদ খুঁজে পাব, এটা ভাবিনি। দুর্গশিখরে লাল আলো জ্বলছে। অর্থাৎ, প্রাসাদ অভ্যন্তরে মহারাওল স্বয়ং উপস্থিত আছেন! আমাকে নানাদিক ঘুরিয়ে নানাপথ ছাড়িয়ে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল। সামনেই একটি খোলা ছাদ। তার মেঝের উপর নানা বর্ণের মর্মর পাথরের টালি বসানো। মসৃণ ও চিক্কণ। এখানে রাজদরবার বসে। এই ছাদের বাঁ দিকে ছোট সিঁড়ি উঠে গেছে অন্দরের দিকে। এটি দোতলার বহির্বাটি। কিন্তু এখানে বহু বর্ণের পাথরের জাফরির কাজ দেখে তন্ময় হতে হয়। কাঠ ও লোহা সহসা চোখেই পড়ে না। জানলা, খিলান, গম্বুজ, বারান্দা, সিঁড়ি ও রেলিং—প্রতিটি বস্তু পাথর দিয়ে তৈরি, এবং প্রত্যেকটির শিল্পকলা মনোমুগ্ধকর। নীচের থেকে একটি বিশেষ নিমগাছের ডাল এসে ছাদের উপর ঝুঁকে পড়েছে। এবং সমগ্র শহরটির মধ্যে যে তিন চারটি গাছ দেখতে পাওয়া যায়, এটি তারই একটি।

ভিতরে গিয়ে একটি ঘরের মধ্যে আমাকে বসিয়ে বাবুলাল গিয়ে মহারাওলের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে খবর দিল। প্রকাণ্ড পাগড়িপরা এক প্রবীণ রাজপুত এসে আমাকে দেখলেন। চোখে তাঁর চশমা। লোকটিকে মনে হল বাণিয়া-শেঠ। আমার আসবার কথা তিনি আগেই জানতেন। আমাকে বাঙ্গালীর সাজে দেখে প্রথমে তিনি একটু কৌতূহলী হলেন, তারপর কি যেন বলতে বলতে বাবুলালের সঙ্গে আবার ভিতরে গেলেন।

ঘরটি একালের একটি সাধারণ ভদ্র ড্রইং-রুম। বাইরেটা প্রাচীন রাজস্থানী, ভিতরটা আধুনিক আসবাবে সজ্জিত। ইলেকট্রিক রয়েছে দেখছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটি ফিটফাট সুশ্রী আধুনিক যুবক এসে হাজির। পরনে প্যান্ট, গায়ে একটি ফিকে নীল কোট। হঠাৎ বুঝতে পারা যায় না, ইনিই বর্তমান মহারাওল। নমস্কার বিনিময় করে হাসিমুখে যুবকটি বসলেন। মরুভূমির রুক্ষতার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল নেই শুনে এবং রাজস্থানের মহারাজা-সুলভ বিশাল এক জোড়া গোঁফ ও ঢাল তরোয়াল ঝোলান চেহারা নয় জেনে খুব আমোদ পেলেন। যুবকটি আধুনিক কালের শিক্ষায় মানুষ। তিনি বললেন, বাঙ্গালী তিনি এই প্রথম দেখলেন। কিন্তু বাঙ্গলা-দেশের নাম শুনলেই তাঁর ভয় করে এইজন্য যে, শিশু-কাল থেকে সে-দেশের রক্তপাতের কাহিনীই তিনি শুনে এসেছেন। সে-দেশে নাকি কথায়-কথায় আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি শুনে একটু অবাক হলেন যে অকারণে কেউ আসে এই মরুভূমিতে! বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে তিনি যখন শুনলেন সে দেশে আছে সবুজ পাহাড়, গভীর অরণ্য, অগণিত নদী এবং হরিৎবর্ণ শ্যামল প্রান্তর,—তখন আমার দিকে চেয়ে রইলেন—যেন রূপকথা শুনছেন।

বহুবিধ খাদ্য আসে বাইরের থেকে, তিনি জানালেন। মহিলারা এদেশে খুব কষ্ট পান, তাঁদের গতিবিধি এ অঞ্চলে যথেষ্ট নিরাপদ নয়। বিলাসদ্রব্য কিছু পাওয়া যায় না। চাল ডাল নুন তরি-তরকারি—এসব দুষ্প্রাপ্য। এখানে উৎপাদন কিছুই নেই। এ দেশের আদি বাসিন্দা যারা তারা যোধপুর, বিকানের ও মারবাড় পর্যন্ত জানে, পূর্ব রাজস্থানের সঙ্গে তাদের পরিচয় কম।

ওইটুকুর মধ্যেই দেখে নেওয়া গেল মহারাওলের জীবন-যাত্রা। তাঁরই রাজ্যের সীমানা হল মোহনগড়, রামগড়, এবং কিষেণগড়। একটির থেকে আরেকটি চল্লিশ মাইল দূর। এগুলি মরুভূমির ভিতরকার জনপদ, যাকে মরুভূমি অঞ্চলে বলা হয়ে থাকে মরুদ্যান। অথবা ভিন্ন উপমায় বলা যায় মহাসমুদ্রের মাঝখানে এক একটি দ্বীপমাত্র। পশ্চিমে কিষেণগড়ই হল জয়শল-মেরের শেষ এলাকা,—তারপর মরুভূমির মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব সীমানা।

ঘন্টা দেড়েক পরে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু মহারাওলও বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। আগে বুঝতে পারিনি সামনের ছাদে প্রজাদের নিয়ে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় দরবার করেন। এখন সাতটা বাজে। সন্ধ্যা সমাগত। ছাদে এসে জড়ো হয়েছে জন পঞ্চাশেক লোক। মহারাওলকে দেখামাত্রই তারা প্রথামতো অভিবাদন জানাল। মহারাওল নেমে এসে বসলেন একটি সুন্দর শ্বেতমর্মরের আসনে। আমার দিকে তাকিয়ে এবং বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ সজ্জা দেখে অনেকে কৌতূহলী হয়ে উঠল। এতক্ষণ অবধি প্রজা-পতিকে বসিয়ে রাখা আমার পক্ষে হয়ত একটু অন্যায়ই হয়ে থাকবে। তাড়াতাড়ি নেমে এসে দোতলা থেকে নামবার আগে একবার পিছন ফিরে দরবারের দিকে তাকালুম। না, আমার চোখের ভ্রম! ওরা কেউ দাঁড়িয়ে নেই, সকলেই বসে রয়েছে! ওদের শরীরের উচ্চতা দেখে সেদিন বিস্ময়বোধ করেছিলুম।

একথাটা স্পষ্ট, দুই শ্রেণীর লোক বাস করে জয়শল-মেরে। কিন্তু একটি শ্রেণীকে আগে কখনও দেখিনি। এরা অতি বিশালকায়, এদের পাশে দাঁড়াতে ভয় করে। সাড়ে ছয় থেকে সাত ফুট উঁচু। এরা কবেকার কোথাকার—সঠিক আমি জানিনে। চেহারা ঠিক হিংস্র নয়, একটু যেন ভয়াল। সাধারণ ভারতীয়দের সঙ্গে এদের মিল নেই কোথাও। মরুভূমির কর্কশ কাঠিন্য এবং রুক্ষতা দিয়ে এরা তৈরি। একদিন পথে যখন এদেরই একটি দলের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলুম, তখন বাবুলাল আমার হাতের ওপর অলক্ষ্যে একটা টিপ দিল। কেন দিল প্রশ্ন করিনি। কথায় কথায় মহারাওয়াল আমাকে বলেছিলেন, জয়শলমের এখন আর সামন্ত-রাজ্য নয়, ভারতের সঙ্গে মিলে গেছে। আমাকে এখন প্রিভি পার্স দেওয়া হয়। জনসাধারণ এখন আর আমার প্রজা নয়। কিন্তু ওরা আমার খুবই প্রিয়। ওরাও আমাকে একদিন না দেখে থাকতে পারে না।

জয়শলমের থেকে তিন মাইল দূরে গেলে পাওয়া যায় 'অমরসায়র'। এটি প্রকৃতই মরুদ্যান। কেবল তাই নয়, কর্কশ ও নিষ্ঠুর বালুপ্রান্তরের মাঝখানে এই বিশাল জলাশয়টি যেন আশীর্বাদের মতো। আশেপাশে গাছপালা, ছায়াপথে বাগান-বাগিচা, গাছের ডালে ডালে টিয়া ও চন্দনা, বাগানে ফোটে গোলাপ, স্নানের সুন্দর ব্যবস্থা, তরণীবিহারের বন্দোবস্ত, সৌন্দর্যপিপাসুগণের মর্মরাসন, স্নিগ্ধ বায়ুসেবনের জন্য হ্রদের মধ্যে এক একটি পাথরছত্রী এবং বারান্দা। শাওনের দিনে এখানে ময়ূর-ময়ূরী ডেকে যায়। মাঝে মাঝে জল পান ক'রে যায় দুচারটি হরিণ। এটি হল মহারাওলের গ্রীষ্মা-বাস। এখান থেকে জল যায় জয়শলমেরে। শোনা গেল, এ অঞ্চলে বহু কায়ক্লেশে মাটি বার ক'রে দুচারটি শাকসব্জি মেয়েরা বানায়। মনে পড়ছে, শুক্লপক্ষের শেষ দিকের জ্যোৎস্নায় জয়শলমের এলাকায় ভ্রমণ করেছিলাম, এবং সেই ফিন্‌ফোটা চাঁদের আলোয় দেখে বেড়িয়েছিলুম, জয়শলমেরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীর যোদ্ধা ও মহাপুরুষগণের শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত অগণিত স্মৃতিস্তম্ভ।

অপরাহ্নের দিকে বিদায় নিচ্ছিলুম। মোটর-বাসে ওঠবার আগে কিন্তু একটি সুসংবাদে সেদিন সমগ্র জয়শল-মের স্বস্তিলাভ করেছিল। রাজস্থান সীমানার পাঁচ মাইলের মধ্যে অর্থাৎ কিষেণগড় থেকে কিছুদূর ভূপৎ সিংয়ের লোকরা ধরা পড়েছে এবং তিনজন বাণিয়াকে জীবন্ত অবস্থাতেই উদ্ধার করা হয়েছে। অপহরণ-কারীদের একটু ভুল হয়েছিল। মহাভারতের জয়-দ্রথের মতো ওরা নাকি মাথা তুলে দেখতে চেয়েছিল সন্ধ্যার আর কতখানি দেরি!

এর বেশি আর বলা চলে না।

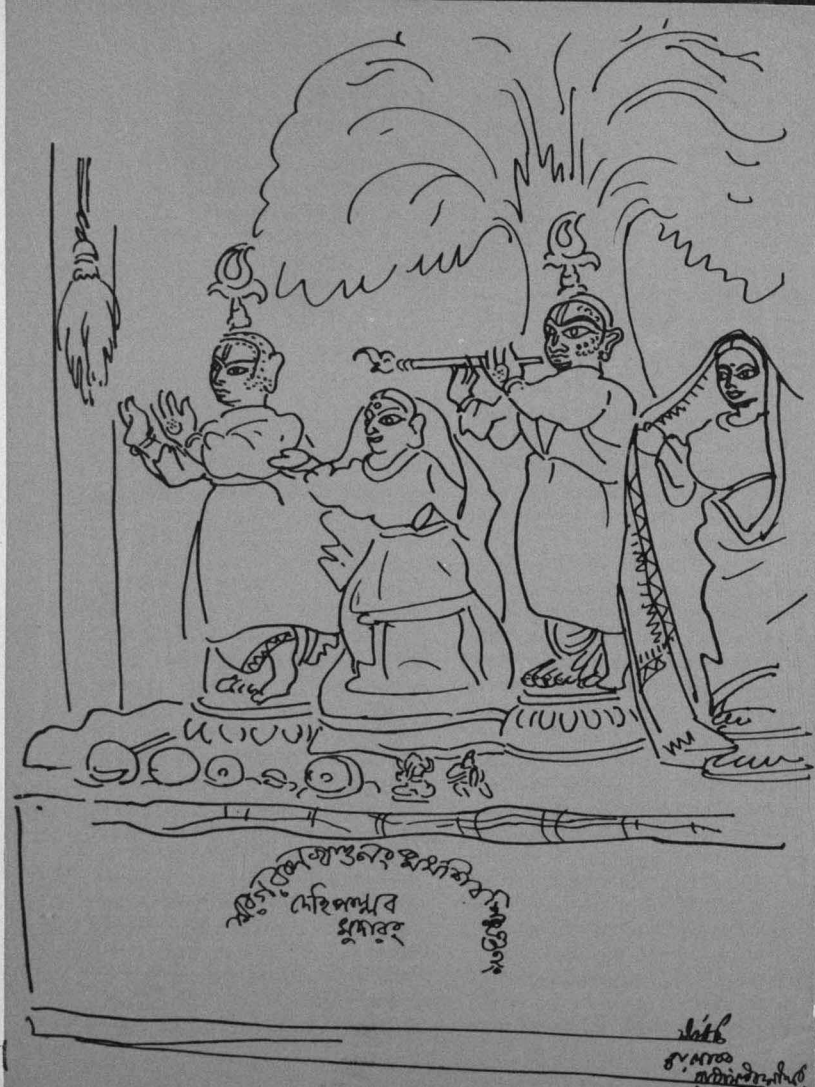

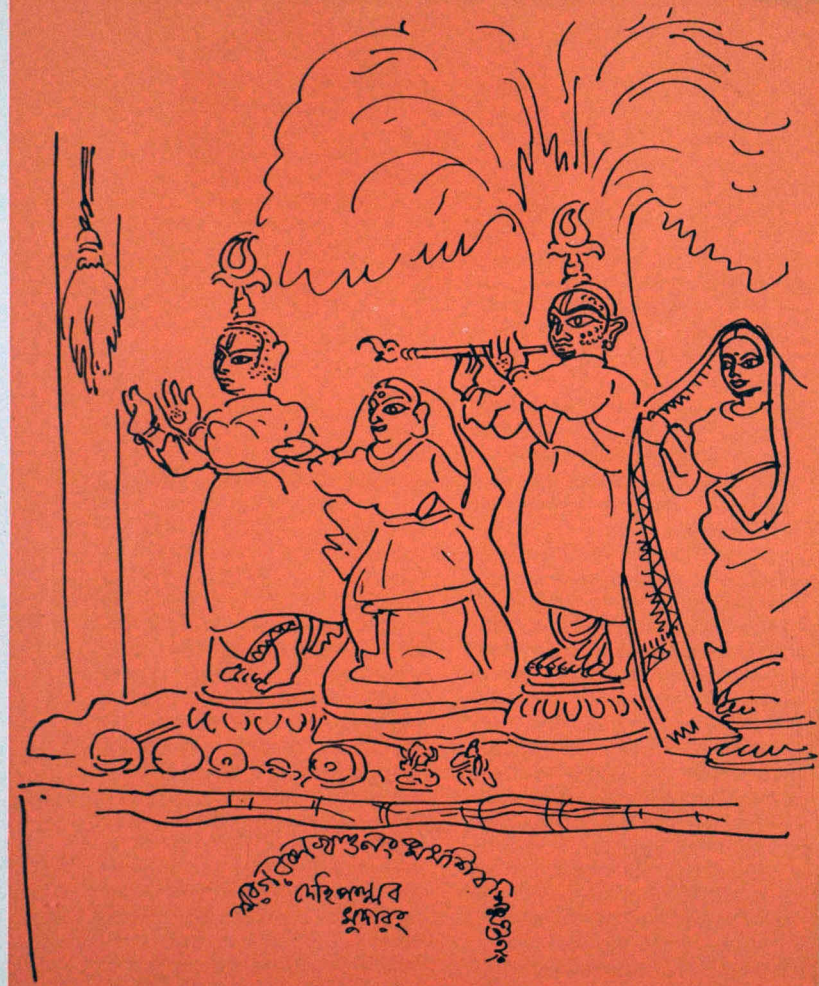

জয়দেবের আরাধ্য রাধামাধবের মন্দির। এখানে গীতগোবিন্দের পুঁথিটি সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

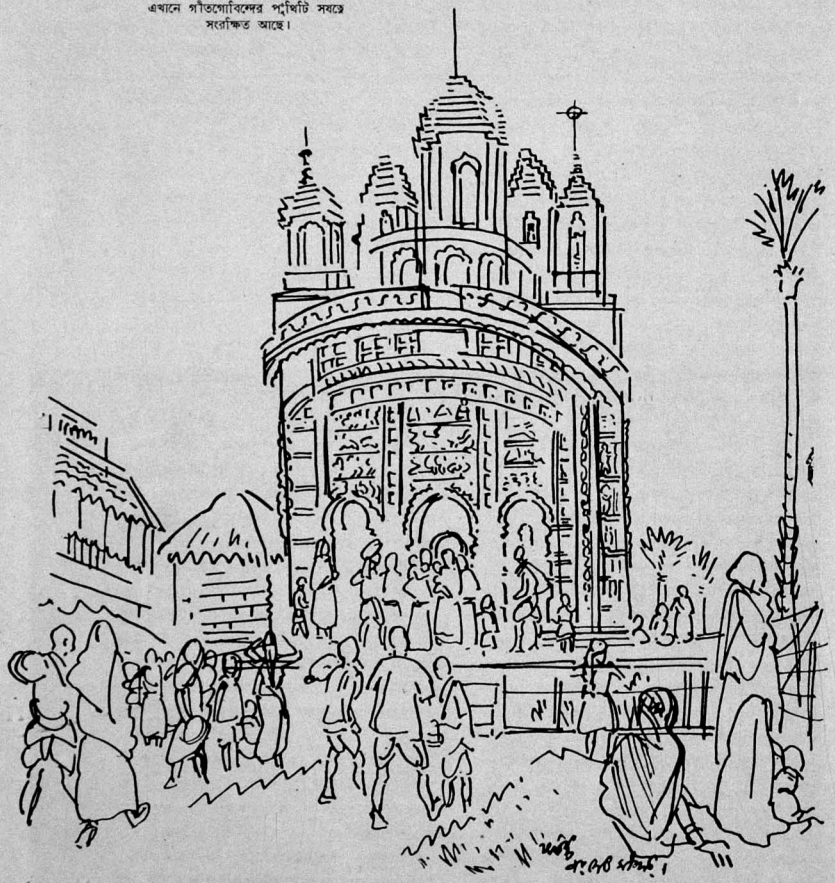

আবার একটি ছোট ঝোলা। ভেতরে যার গাঁজা আর কল্‌কে। রকমারী ছোটো ছোটো সব কল্‌কে। কোনোটি আকন্দ, কোনোটি ধুতুরা, কোনটি বা অন্য কোনো ফুলেরই মতো। আকারে কিন্তু সবগুলোই ছোটো। এদের সবাই-কেই সংক্রান্তির ভোরবেলায় যে পৌঁছতে হবে। এইদিন নাকি কদমখণ্ডীর ঘাটে উজানী বয়। গঙ্গার সঙ্গে অজয়ের যোগ আছে। অজয় পশ্চিম দিক থেকে এঁকে বেঁকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হোয়ে কাটোয়ায় গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে।

কিংবদন্তী থেকে জানা যায় জয়দেব নাকি রোজ কেন্দুলি থেকে আঠারো ক্রোশ দূরে কাটোয়ায় হেঁটে গিয়ে গঙ্গাস্নান সেরে আবার ঘরে ফিরে ৺রাধামাধবের পুজো কোরতেন। এমনিভাবে দিন কাটে। হঠাৎ একদিন দেবতা জয়দেবকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বোললেন —'তোকে আর আমার কাছে আসতে হবে না, আমিই তোর কাছে যাবো। কাটোয়ায় এসে গঙ্গাস্নান কোরতে হবে না—অজয়ে স্নান কোরলে তোর একই কাজ হবে। আর বৎসরান্তে আমিই একদিন ওখানে যাবো।' জয়দেব আবার জিজ্ঞেস কোরলেন—'কি কোরে জানবো?' উত্তরে দেবতা বোললেন—'পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন আমি উজানী বইবো; সে দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে একটি পদ্মফুল ভেসে যেতে দেখবি, এ ছাড়া অন্য সময় যে পরিমাণ জল থাকবে, সেদিন তার চেয়ে কিছু জলও বেড়ে যাবে।' সেই থেকে জয়দেব রোজ কদমখণ্ডীর ঘাটে স্নান কোরতেন, এবং সেই কারণে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তির দিন নানা দেশ থেকে বহু নরনারী, সাধু-সন্ত, বৈষ্ণব আর ফকিরের দল ভক্তিপ্লুত চিত্তে এই ঘাটে মকর স্নান কোরে মনের মালিন্য দূর করে। পবিত্র মনে ৺রাধামাধবের শ্রীচরণ দর্শন করে। আর সেই সঙ্গে স্মরণ করে জয়দেব ও পদ্মাবতীকে। তারপর মেলায় একটু আনন্দ উপভোগ কোরে পরমেশ্বরের নাম জপ্‌তে জপ্‌তে ঘরে ফিরে যায়।

জয়দেবের গীত গোবিন্দের সেই অসমাপ্ত পদটি যা তিনি বারবার চিন্তা কোরেও লিখতে পারলেন না—স্বয়ং ভগবান গোবিন্দজী অভিমানিনী শ্রীরাধার মান ঘুচোবার জন্যে তাঁর শ্রীপদযুগল মাথায় ধারণ কোরবেন—এ কেমন কোরে সম্ভব? সে কথা চিন্তা কোরতে কোরতে তিনি স্নানে গেলেন। আর ৺ভগবান স্বয়ং জয়দেবের রূপ ধারণ কোরে নিজ হাতে জয়দেবের কালি কলম দিয়ে তাঁর তালপাতার পুঁথিতে সেই শেষ লাইনটি লিখে দেন—

'দেহি পদ পল্লব মুদারম্‌।'

এই লেখা দেখতে আজও বহু দেশ বিদেশের ভাগবৎ প্রেমার্ত ধর্ম বিশ্বাসী নরনারীর দল এসে জমায়েত হয়। কিন্তু সে পুঁথি আজ আর সেখানে নেই। জয়দেব যখন বৃন্দাবনে চলে যান তখন তাঁর পরমারাধ্য রাধামাধব এবং পুঁথি সঙ্গে নিয়ে যান।

এই পৌষ সংক্রান্তিতে শুধু জয়দেবে নয়, বীরভূমের বহু জায়গায় মেলার আয়োজন হয়। রানীপাথরের কাছে 'মায়ের থানের মেলা,' বোলপুরের 'অজয়ের ঘাটের মেলা', রাইপুরের কাছে 'দেউলীর মেলা', 'কেন্দুলীর মেলা' ইত্যাদি আরও বহু মেলার আয়োজন হয়।

মকর সংক্রান্তিতে নদীস্নান করার কারণ অনেক। অনেকের ধারণা যে এই শুভদিনে নদীতে স্নান কোরে ঠাকুরকে দর্শন কোরলে দেহের সমস্ত গ্লানি দূর হয়, নষ্ট হয় মনের সমস্ত দুর্বলতা। আর ঠাকুরের কাছে অনেকে কামনা করে যে সংবৎসরটা যেন এই পৌষ মাসের মতো সম্পদে ও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে।

এই দিনটিতে মানুষ সমস্ত হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে সবাই সবাইকে আমন্ত্রণ জানায়—বন-ভোজনের জন্যে, চলে যায় ঘরের বাইরে—নিরালায়, নির্জনে—নদীতীরে।

প্রথমে এই মেলা দূর থেকে দেখলে মনে হবে—শুধু ধূলোয় ধূলো আর তারই রঙে যেন চারিদিক আচ্ছন্ন। আর তারই ভিতর থেকে ভেসে আসে নানা সুরের ঝিল্‌-মিলি—মিলে-মিশে সে এক অনন্য এবং স্বতন্ত্র সুর। নানা ধরনের লোকের সমাবেশ ঘটে কিনা মেলায়—যেন এক একটি সুর তারা! গৃহী, বৈষ্ণব, সাধু, ফকির, ছোট বড় সবাই যোগ দেয় এতে। তবে সাধু বৈষ্ণবদের সংখ্যাই বেশি। বীরভূমের জয়দেবের মেলা ও 'দধিয়াবর্গীতলার মেলা' প্রধানত সাধু, বৈষ্ণব ও বাউলদেরই মেলা।

জয়দেবের মেলা দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম হলো আমার। মেলায় গিয়ে দেখি নানা দেশের বৈষ্ণব-বাউলদের এক বিচিত্র সমাবেশ হোয়েছে। বহুদিনের পুরোনো বিরাট বটগাছ-তলায় তারা ভিড় কোরেছে। নিচে খড় বিছিয়ে তার উপর যে যার আসন কোরে বোসেছে। পিঁপড়ে সিধোবার জায়গা নেই; শুধু একটি আধ হাত সরু রাস্তা রাখা রয়েছে মেলার ভেতরে যাওয়ার জন্যে। এদিকে অজয়ের ঠিক উত্তর তীরে পূব-পশ্চিম লম্বা যে বিরাট শ্মশানটি রয়েছে তার উপর-পশ্চিম কোণ থেকে

বাউলের সমবেশ।

জয়দেবের মেলায় বাউলদের গানের আসর।

জয়দেবের মন্দিরে সংরক্ষিত রাধামাধবের মূর্তির একাংশ।

সুরু হোয়েছে মনোহর ক্ষেপার আসন, বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে আসনটি পাতা। তার সামনে বহু কৌতূহল-প্রিয় দর্শনার্থীর ভিড়। মনোহর-বাবা বিরাট একটি শার্দূল চর্মের উপর পশ্চিম দিকে মুখ কোরে বোসে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে নানা কথা আলোচনা কোরছেন। পাশে থেকে কোনো দর্শনার্থী মন্তব্য কোরছে 'বাঘটা বেশ বড় বাঘ ছিল হে।' পাশে একটি লম্বা লাল কাপড় বিছানো রয়েছে। সেটা স্তূপাকার রূপ ধারণ কোরেছে শুধু, পয়সা—আনি, দুআনি, টাকা, সিকি, আধুলি আর নোটে। দূর থেকে বাবাকে উদ্দেশ্য কোরে যারা পয়সা ছুঁড়ছে তার দু একটা যে বাবার গায়ে আঘাত কোরছে না যে এমন নয়। তবে সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। হয়তো, মনে এ সব জিনিস—'সব ঝুটা হ্যায়', বোলেই ধারণা—তাই একদম লক্ষ্য নেই। পেছনে তার খাড়া করা রয়েছে একটি বিরাট তৈলচিত্র আর উত্তর দিকের বাঁশের খুঁটিগুলোতে ঝুলছে কতকগুলো নানা ভাবের রং-বেরঙের ফটো। বেশ জমকালো আবহাওয়ার সৃষ্টি হোয়েছে। তারই পেছন দিকে কতকটা জায়গায় চড়েছে মচছবের হাঁড়ি। দাউ-দাউ কোরে উনোনগুলো জলছে। কেবল পাচকদের বড় বড় হাতা খুন্তি নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে। তার পরেই শুরু হোয়েছে কতকগুলো পানের দোকান, একেবারে সেই কোটরে বাবার আসন পর্যন্ত।

'কোটরে বাবা' নামটির তাৎপর্য আছে। প্রথমে উনি জয়দেবে এসে কদমখণ্ডীর বটগাছের কোঠরে থাকতেন। বছরের পরে বছর কত গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ কেটেছে ওরই ভেতর দিয়ে। তাঁর উপর দিয়ে

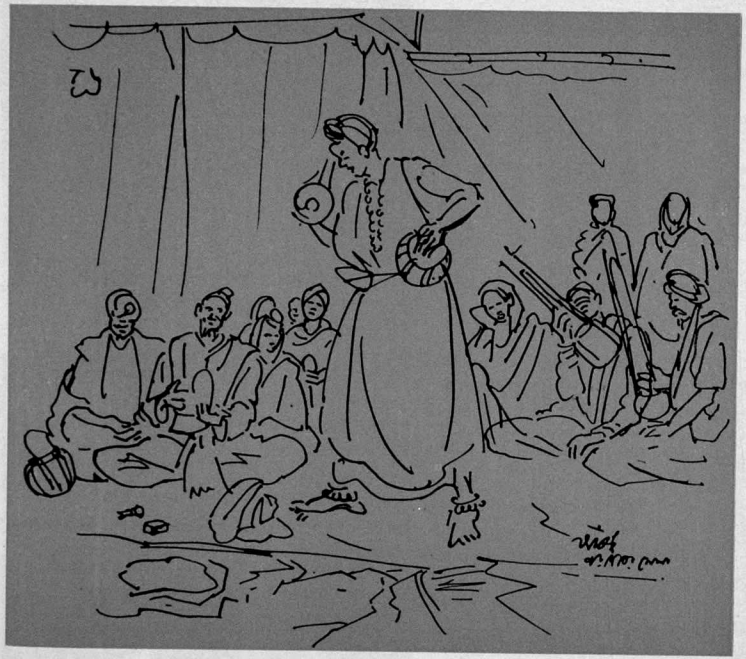

জয়দেবের মেলায় নৃত্যরত বাউল।

বর্ষার প্রবল বর্ষনের আঘাত, ঝড়, ঝঞ্ঝা সবই পার হোয়েছে এই একই ভাবে। প্রচণ্ড শীতেও নদীর কত যে ঠাণ্ডা হাওয়া আর হিম ঝরে পড়েছে তাঁর গায়ে তার কি ঠিকানা আছে? বহুদিন পর এক ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় সেই ভক্তই বট গাছটির তলায় একটি ছোট ঘর বানিয়ে দেন। সেই অবধি উনি এই ঘরটিতেই থাকেন।

কদমখণ্ডীর ঘাটে বহুদিন ধরে একটি বড় কদম গাছ ছিল। তার নামানুসারে এই ঘাটটির নাম হোয়েছে কদমখণ্ডী। কদমখণ্ডীর শ্মশানটি সব সময় কেবল হাড়ের কুচি, পোড়া অঙ্গার পরিপূর্ণ থাকে। মড়ার মাথার খুলিগুলি এখানে সেখানে ছড়ানো থাকে। মেলার সময় সেগুলি নিশ্চহ্ন হোয়ে যায়। তবে ক্বচিৎ কোথাও থেকে টেনে বের করা এক আধটা পচা শব নিয়ে কাক, কুকুর আর শেয়ালদের মহোৎসব যে একদম চলে না—এমন নয়। তবে মেলায় মহোৎসবের ঠিক আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির চিহ্ন প্রায় মুছে যায় বোললেই চলে। সেই শ্মশানের উপরই তো বহু আগন্তুক, অতিথি আনন্দময়কে স্মরণ কোরে মচ্ছবের প্রসাদ খাচ্ছে পরমানন্দে। মৃতের কবরের উপরে বহু যাত্রী নিজেদের জিনিসপত্র বিছিয়ে আনন্দে ক্লান্তি ঘুচিয়ে পরম শান্তির আস্বাদ উপভোগ কোরছে। বাউলরা নানা জায়গায় আড্ডা বোসিয়েছে। তবে অধিকাংশ বাউল সেই বুড়ো বটগাছ তলাটায় আসর কোরেছে। কেউ বা 'কাঙালি ক্ষেপার' সমাধি মন্দিরের আশপাশটায়, কেউ বা পঞ্চদশ মুণ্ডীর সিদ্ধাসনটির একধারে। যে যেখানে পেয়েছে একটু জায়গা কোরে বোসে পড়েছে। 'কাঙালি ক্ষেপা' ছিলেন একজন সাধু মহাপুরুষ; তিনি কিছুদিন আগেও বেঁচে ছিলেন এখানে। তাঁরই সিদ্ধাসনটি হলো বুড়ো বটগাছটার পূর্বে আর সমাধি মন্দিরটি হলো পশ্চিমে।

জয়দেবের রাধামাধবের মন্দির থেকে সুরু কোরে যে রাস্তাটি বরাবর অজয়ের সমান্তরাল কোরে মেলার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে, তারই দুপাশে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে জয়দেব ও পদ্মার দোহাই দিয়ে এবার কানা খোঁড়া ভিখিরীর দলও সারি দিয়ে বোসে পড়েছে। সামনে পেতে রেখেছে কেউ একটা ছেঁড়া কাপড়, কেউ বা ছেঁড়া চট, কেউবা এক টুকরো কাগজ। একগাছি সরু নারকেলের দড়ি ও বাঁশের পাতা দিয়ে তারা যে যার সীমারেখা টেনে দিয়েছে। তাদের দেখে সমবেত

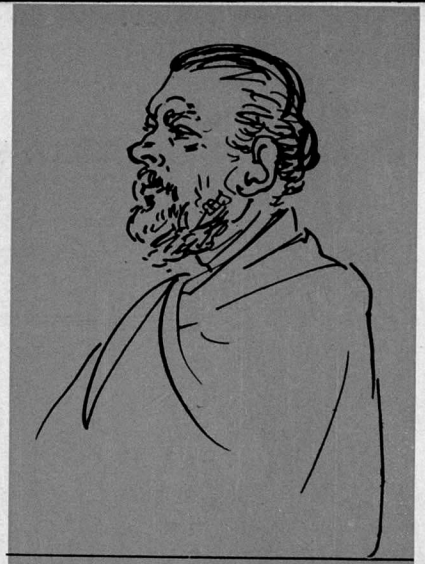

'কোটরে বাবা' নামে প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ নরোত্তম ঠাকুর।

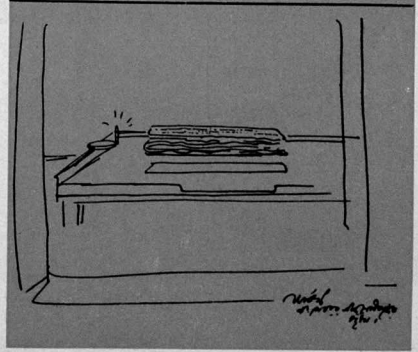

কেন্দুলির মন্দিরেতে সংরক্ষিত জয়দেবের পুঁথি।

কেন্দুলির মেলায় মকর স্নানের পরে।

নারীর দল কোমল হৃদয়ে ব্যাথা পেয়ে কেউ একমুঠো চাল কেউ-বা একটা পয়সা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

যে কোটরে বাবা তাঁর ভক্ত ও দর্শনার্থীদের দর্শন দেওয়ার জন্যে বিশ্বস্তরের মতো নির্বিকার চিত্তে বোসে আছেন, তাঁকে দেখে যাত্রী ও ভক্তরা কেউ কেউ আলোচনায় মেতেছে। কেউ বা দূর থেকে প্রণাম কোরে তাঁর দিকে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে। টাকা পয়সায় তাঁর চারিদিক স্তূপীকৃত হোয়ে গেছে। চারিদিকে এক হাত অন্তর জায়গায় জায়গায় মহোৎসবের খিচুড়ি রান্নার গন্ধে মেলার আকাশ বাতাস ভরপুর। ওদিকে, অজয়ের তীরের উপরে জয়দেবের সিদ্ধাসন মন্দিরটির পাশে কাশ ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে। যেন তারা প্রতিটি দর্শনার্থীকে নমস্কার জানিয়ে অভ্যর্থনা কোরছে। বট তলার বাউলদের আড্ডায় কেউ তা-না-না-না কোরে তান ধরেছে। কেউ বা নাচে গানে তুফান বইয়েছে। আবার কোনো আসনে বুড়ো বাউল নির্বিকার চিত্তে একটি কৌপিন পরে দিগম্বরের মতো বোসে আছে, আর বৈষ্ণবী তার অঙ্গরাগ কোরছে। কোথাও স্নানের পূর্বাভাসে বাউল তার বৈষ্ণবীকে দিয়ে অষ্টাঙ্গে তেল মালিশ করাচ্ছে। দোকানদাররা তাদের দোকানের নানাবিধ পসরা সাজিয়ে বোসে আছে। একের পর এক সারি দিয়ে তারা বোসেছে। মিষ্টি, সন্দেশের দোকান থেকে সুরু কোরে কাপড়, জামা, খেলনা, বাসন, কুমারের হাঁড়ি-কুঁড়ি ও আরও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিস পত্রের কেনা বেচা চলেছে মহোৎসাহে। ক্রেতার অভাব নেই। তাদের এই হলো পুন্য সঞ্চয়। দোকানদারদের দেখে মনে হয় যে দোকান সাজানোর তাগিদে কতদিন যে তারা স্নান করে নি তার ঠিক নেই। মকর সংক্রান্তির দিনে স্নানের কথা তো বাদই দিলাম। নদীর

জয়দেবের মেলায় বাউলদের গান।

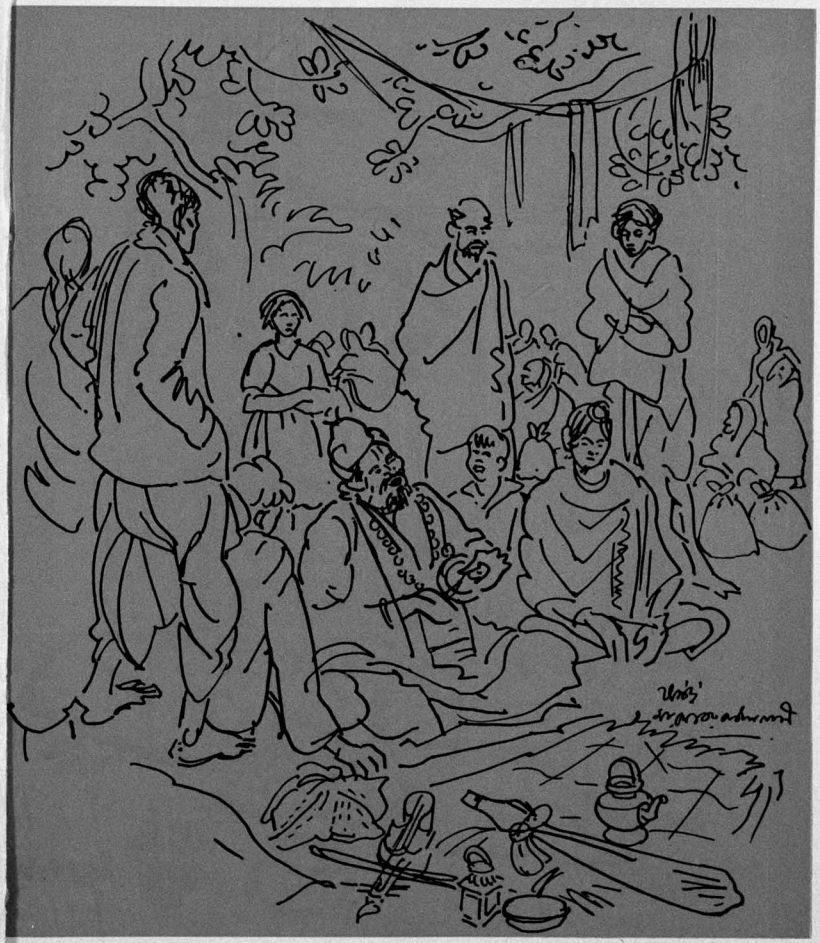

কেন্দুলির মকর-স্নানের মেলায় বাউলদের নামকীর্তন।

ধারে মাটির তৈরি শিব, কালী, মনসা, জয়দেব, পদ্মার মূর্তি সাজিয়ে রাখা হোয়েছে। তারই সামনে একজন বেদে রকমারী পদকের মালাটি জামায় ঝুলিয়ে, ছোট, বড়, মাঝারী, নানা আকারের ঝাঁপিগুলো থেকে ময়াল থেকে সুরু কোরে কেউটে, চন্দ্রবোড়া, ঢোঁড়া, ঢেমনা, নানা জাত-বেজাতের সাপ খেলানোর কসরৎ শুরু কোরেছে। কিছু রাধামাধব দর্শনাকাঙ্খীর দল সেখানে বেশ ভিড় জমিয়েছে। বেদে কখনও সাপগুলোকে চুমু খাচ্ছে কখনও বা নাচতে নাচতে গাইছে—

'ও বারণ করগা গো
তোদের কালাকে বাঁশী বাজাইতে।'

আবার কখনও বা সাপগুলিকে পকেটগুলোর ভেতর পুরছে। দর্শকরা স্তম্ভিত চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিশ্চল হোয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। আবার কেউবা মন্তব্য কোরছে—'ওর মুখের ভেতর জড়ি ভরা আছে।' কেউ বোলছে—'ও বিষঝাড়া মন্তর পড়ে বিষ ঝেড়ে ফেলছে।' যার যা খুশি নির্বিবাদে বোলে চলেছে। কোনো কথাই কিন্তু বেদের কর্ণগত হোচ্ছে না।

যে কোঠরে বাবার আসন, মন্দিরের উত্তর দিকে সোজা পূর্ব পশ্চিম লম্বা যে রাস্তাটি চলে গেছে তারই পাশে কিছুটা জায়গা জুড়ে বোসেছে সাধুর দল ধুনি জ্বালিয়ে। কোনো কোনো সাধুর দল ধুনির পোড়া কাঠ টুকরোর পর টুকরো গাঁজার কল্‌কের উপর চাপিয়ে পরম তৃপ্তিতে দম দিচ্ছে। কেউ বা আবার অজয়ের স্বচ্ছ পুন্য সলিলে স্নান সমাপন কোরে ললাটে আলকা তিলক এঁকে বাঁ হাতে গীতা ধারণ কোরে তার উপর চিত্ত নিবেদনের চেষ্টা কোরছে। আবার কোনো সাধু কৌপীন পরে বাঁ হাতে

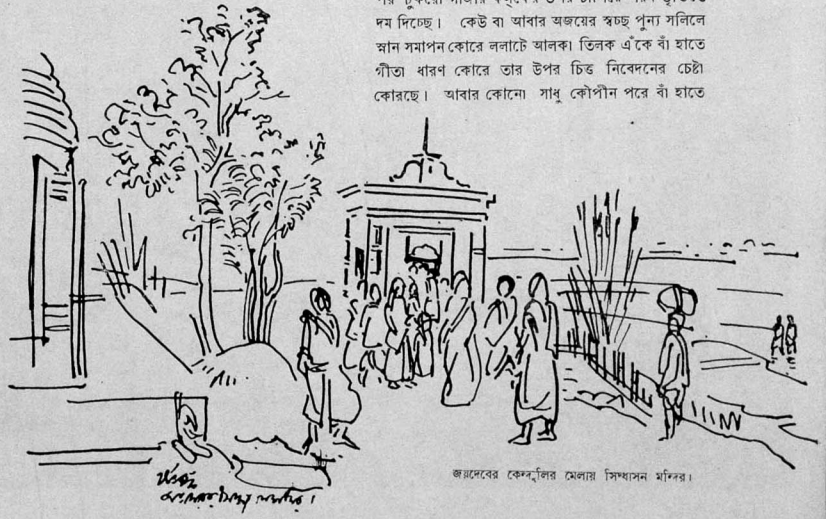

জয়দেবের কেন্দুলির মেলায় সিংহাসন মন্দির।

একটি মড়া পোড়ার বাঁশ কাঁধে নিয়ে ডান হাতে কতকগুলো মড়ার হাত পায়ের হাড়ের লম্বা লম্বা টুকরো বেঁধে, বুক ফুলিয়ে রক্তজবার মতো রক্ত চোখ দুটি বিস্ফারিত কোরে পানওয়ালার দিকে বজ্রবান নিক্ষেপ কোরছে। বোলছে 'আচ্ছাওয়ালা পান দো'। দুচার জন যাত্রী 'কাঙাল ক্ষেপার' পঞ্চদশ মুণ্ডীর সিদ্ধাসনের কাছে দাঁড়িয়ে আসনটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করারচেষ্টা কোরছে। তাঁর আসনের পাশে একটি মড়ার খুলিতে কপালে লেখা রয়েছে 'পরিণাম'। তা দেখে প্রত্যেক দর্শনার্থী যেন একটি হতাশার নিশ্বাস ফেলছে। কোন মেয়ে আবার চোখের জল সম্বরণ কোরতে না পেরে কাপড়ের খোঁট দিয়ে চোখের দুপাশ মুছতে মুছতে চলে যাচ্ছে। ভাবছে 'সত্যি, এই তো পরিণাম?' তবুও মানুষ বোঝে কি? এই রকম বিচিত্র মন নিয়ে দর্শনার্থীর দল রাধামাধবের মন্দিরে যাচ্ছে। সেখানেও তারা শুনছে এই একই উক্তি—

'আত্মতত্ত্ব জেনে আয় রে আমার মন'।

বহুরূপী মানুষের বহু রূপ ও ভাবের প্রকাশ হোয়েছে। কেউবা এই মেলায় এসেছে রাধামাধবের দোহাই দিয়ে দুটো পয়সা রোজগার কোরতে আর কেউবা বিলিয়ে দিতে তা শ্রীমায়ের চরণে। শুধু পয়সা নয়; হয়তো নিজের সর্বস্ব, নিজেকেও বিলিয়ে যাবে। কেউ এসেছে দুটো পয়সার বিনিময়ে পাঁচরকম খাদ্যদ্রব্য দিয়ে উদর পরিতৃপ্ত কোরতে। আবার কেউবা রাধামাধবের মন্দির প্রাঙ্গন থেকে ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক বা ভাবেই হোক, অতি সযত্নে রাধামাধবের শ্রীচরণধূলি কাপড়ের খুঁটে বাঁধছে। কিন্তু আজও রাধামাধবকে শেষ পর্যন্ত বাঁধতে পারছে ক-জন?

জয়দেবের সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যেমন শোনা যায় যে রাধামাধবের মন্দির, প্রাঙ্গণে মাঘ মেলার সময় মচ্ছবের খিচুড়ি পুঁতে রাখা হোতো। আবার পর বৎসর সেটি মাটি খুঁড়ে বার করা হোতো। খিচুড়ি ঠিক সেই একই রকম রয়েছে দেখা যেতো। জয়দেব চলে গেছেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁর সেই সিদ্ধাসনটি আজও যেন মৃত্যু-হীন অম্লান। সেই কুশেশ্বরের মন্দির এখনও কবিপ্রবরের কথা স্মরণ কোরিয়ে দেয়। ধূপ কখন পুড়ে ছাই হোয়ে গেছে কিন্তু গন্ধটুকু এখনও যেন সর্বত্র হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

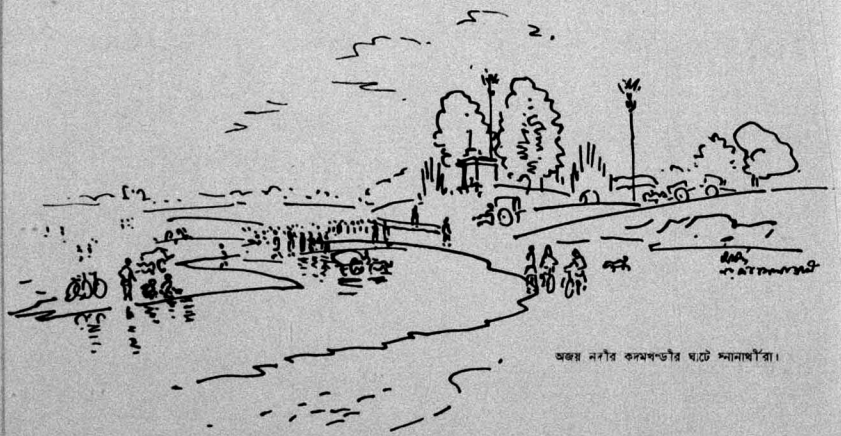

অজয় নদীর কদমখণ্ডীর ঘাটে স্নানার্থীরা।

দেবতা তোমার শিল্প জগৎ-ময়
আমি যজমান যজ্ঞ করছি তার
যেন সংস্কৃত হয়
শিল্প, শিল্পী তাই-ই করে অনিবার॥

*

রূপ ধ্যানে আমি রূপায়িত হই,
আয়তন বেড়ে যায়।
মনে হয় পৃথিবীতে আমা বই
কেউ নেই আর, হায়!

*

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
কার রূপ লাগি?
একটি ফুলের সুরে
গাছ হয়ে জাগি।

*

তোমার প্রতিমা আমি গড়ব কী দিয়ে
যেখানে দাঁড়াও সব প্রিয় হয়, প্রিয়ে॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

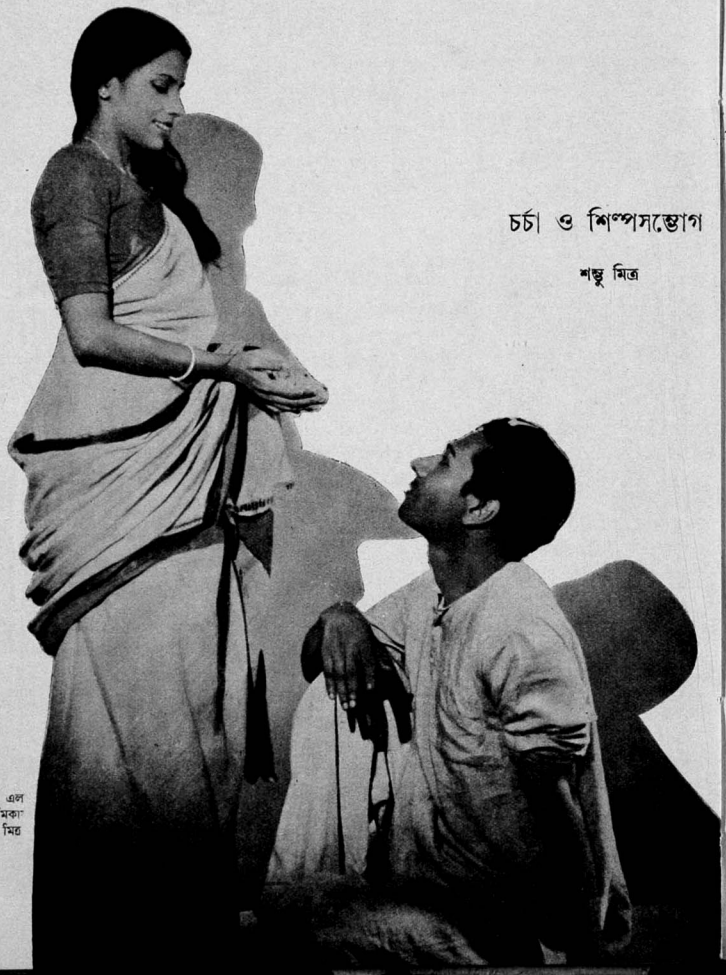

'চার অধ্যায়'-এ এল
ও অতীনের ভূমিকায়
কৃষ্ণা ও শম্ভু মিত্র

চর্চা ও শিল্পসম্ভোগ

শম্ভু মিত্র

নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শম্ভু মিত্রের মধ্যে প্রযোজক, পরিচালক এবং অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত বিরল এই তিনটি গুণের অত্যাশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। কয়েকজন শিল্পী-বন্ধুর সহায়তায় গঠিত 'বহুরূপী'র মাধ্যমে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দর্শক-সাধারণকে আশান্বিত কোরে তুলেছে।

মঞ্চাভিনয়ে নাটকের সংলাপ ও তার বাচনভঙ্গী নিশ্চয়ই খুব একটি বিশিষ্ট অংশ, কিন্তু সেটাই সব নয়। বেতার অভিনয় কেবলমাত্র শ্রোতব্য, কিন্তু মঞ্চাভিনয় অনেকটাই দর্শনীয়। সেই দর্শনের ক্ষমতা কিন্তু সহজাত নয়, আয়াসসাধ্য, ও সর্বাঙ্গীন সংস্কৃতিসাপেক্ষ। কেবল নাট্যোপলব্ধির ক্ষেত্রেই যে এই দর্শনক্ষমতা প্রয়োজনীয় তা নয়, সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই এটা আবশ্যিক। চর্চা ছাড়া শিল্পসম্ভোগ সম্ভব নয়।

কথাটা হঠাৎ শুনলে, আমরা দেখেছি, অনেক লোকের সন্দেহ জাগে। তাঁদের মনে হয় যে, তাহলে কি আমাদের সকলকে সবরকম শিল্পসম্বন্ধে চর্চা কোরে তবে সাহিত্য পড়তে হবে, বা ছবি দেখতে হবে, বা গান শুনতে হবে, বা নাটক দেখতে হবে? সে সব কেবল যাঁদের 'হবি' আছে তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ পাঁচটা লোকের অতো সময় কোথায়? আর তাছাড়া সত্যিই যদি সাধারণ দর্শক ও পাঠককুল মনে মনে ঠিক করেন যে আগে সমস্ত শিল্পের ইতিহাস ও আঙ্গিক বুঝে নিই তারপরে শিল্প উপভোগের চেষ্টা কোরবো, তাহলে ভেবে দেখুন হঠাৎ একেবারে আপনাদের সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের বিক্রী বন্ধ হোয়ে যাবে, ছবির প্রদর্শনীতে লোক যাবে না, থিয়েটার বায়স্কোপের বাড়ীগুলো খাঁ খাঁ কোরবে। ফলটা কি শিল্পীদের পক্ষেই ভালো হবে?, অতএব শিল্পীদের বোঝা উচিত যে তাঁদের আঙ্গিকের কৌশল সম্পর্কে সাধারণ দর্শকের কাছে বোধ আশা করা বৃথা। তাঁরা কোন রাগে দুটো মধ্যম পাশাপাশি ব্যবহার কোরেছেন, বা কোন ছবিতে রেখা বা রঙের কি বিন্যাস ঘটিয়েছেন, বা বিরাট লং শটের পরেই হঠাৎ কেমন একটি বিরাট ক্লোজ-আপ দিয়েছেন বা মঞ্চের ওপর অভিনেতৃ বিন্যাসে কি সুছন্দ 'ফ্লুইডিটি' এনেছেন, এ সমস্তর আবেদন হোচ্ছে মুখ্যত বুদ্ধিমার্গে, যাকে বলি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। কিন্তু সাধারণ মানুষ শিল্পের কাছে চায় হৃদয়াবেগ, ইমোশন। অতএব অসাধারণ বুদ্ধির প্রত্যাশা না রেখে হৃদয়াবেগ দিয়ে মুগ্ধ কোরবার চেষ্টা কোরবেন; লোক মুগ্ধ হবে।

এর উত্তরে বলা যায় যে, চর্চার পরিমাপ কিছু হয়তো বাঁধা যায় না কিন্তু ন্যূনতম চর্চার প্রয়োজন একটা আছেই। বর্তমান লেখক কিশোর বয়সে বাড়ীর একটি গেঁয়ো চাকরকে একটি ফটো দেখিয়েছিল। ফটোটি ছিল মুখের একটি পোর্ট্রেট। অন্ধকারের মধ্যে একটু হেলানো কেবল একটি মুখ তাকিয়ে আছে। চাকরটি অনেকক্ষণ ধরে ছবিটি বোঝবার চেষ্টা কোরে শেষে অপ্রতিভ হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরলে, 'এ কীসের ছবি?' বোল্লাম, 'একটা মুখের।' তাতেও ফল হলো না দেখে নাক, চোখ, কপাল সব আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখাতে লাগলাম। বেশ কয়েকবার বলবার পর মনে হলো সে আবছায়া দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বোলে উঠলো, 'তাহলে হাত কই? পা কই?'

ঠিক এইরকম কথাই আবার শুনেছি বছর আষ্টেক আগে এক বৃদ্ধার কাছে। তিনি বোলেছিলেন, 'তোমাদের বায়স্কোপ টায়স্কোপ দেখে আমি কিছু বুঝতে পারি না। হঠাৎ দেখায় যে একটা মানুষের আধখানা ধড় ঘরের মধ্যে ঘুরছে। আরে মর্, তার পা কই? ঠ্যাং নেই, মেঝে

'ছেড়া তার'-এ রহিমুদ্দিন ও ফুলজান-এর ভূমিকায় শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্র।

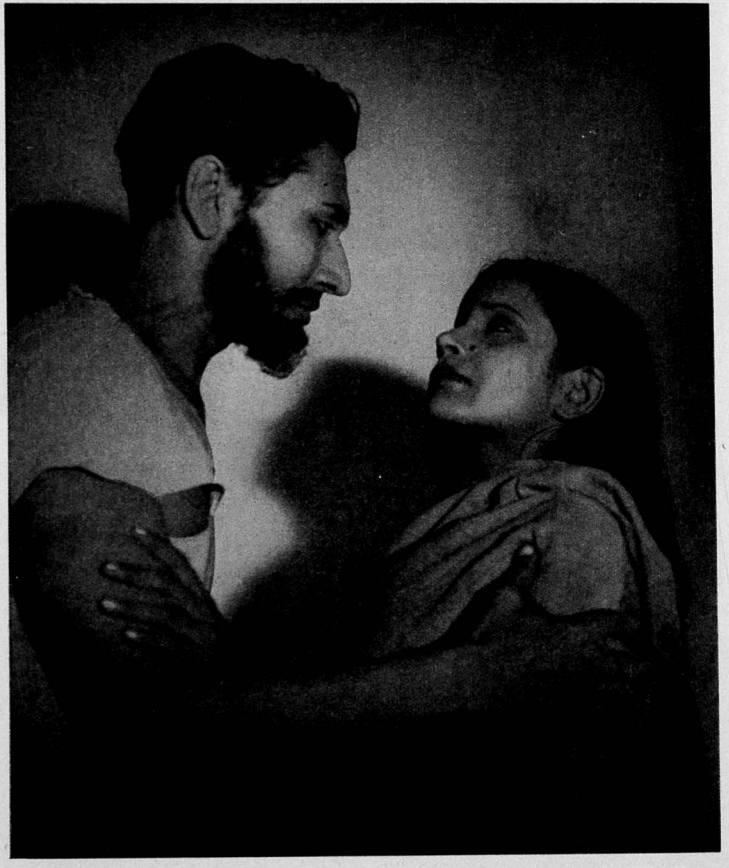

'রক্ত করবী'-তে নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র।

নেই, খালি আধখানা ধড় ঘরের এপাশ যাচ্ছে আর ওপাশ যাচ্ছে। আমার তো বাপু দেখলে ভুতুড়ে কাণ্ড মনে হয়। দূর, দূর।'

অথচ রোজ যাঁরা টিকেট কিনে বায়স্কোপের এইসব রীতিগত কৌশল অবলীলাক্রমে মেনে নিয়ে ছবি উপভোগ কোরছেন তাঁদের খুব কম লোকই সাধারণ বুদ্ধিতে এই বৃদ্ধার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, অর্থাৎ এই চাকর আর বৃদ্ধার ছবি দেখা সম্পর্কে কোনও রকম চর্চা না থাকাতেই রসোপভোগে ব্যাঘাত ঘটেছিল।

এবং খালি ফ্রেম মিলিয়ে ছবিটি দেখতে পাওয়াই নয়, আরও একটু বেশী চর্চার প্রয়োজন। বালক বয়সে নিজের কানে শুনেছি কোনও এক বাড়ির রোজগেরে রাশভারি কর্তা বোলেছিলেন, 'ওসব অবন ঠাকুরদের ইণ্ডিয়ান আর্ট-মার্ট আমি বুঝি না, যতো ম্যালেরিয়া রুগীর মতো কাঠি-কাঠি হাত পা। তার চেয়ে রবি বর্মার ছবি দেখে বুঝতে পারি, মানুষগুলো মানুষের মতো।'

এই যে অজ্ঞানতা ও আত্মম্ভরিতা, এতে কার লোকসান হয়? যে-লোকেরা ভালো জিনিসের ভালোটা দেখতে পেল না তাদের লোকসান তো হলোই কিন্তু শিল্পী যদি দেখেন যে তাঁর চারপাশের মন এমনি আড়ষ্ট, এমনি সংবেদনহীন, তাহলে তাঁর পক্ষেই কি নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস পাওয়া সম্ভব? কাকে বলবার জন্যে তিনি কথা বোলবেন, গান গাইবেন, বা ছবি আঁকবেন? এবং সে ক্ষতি কি দেশের সংস্কৃতিরই নয়?

তাছাড়া ইমোশন তো বটেই। শিল্পীমাত্রেই আবেগ প্রকাশ কোরতে চান, কিন্তু সেটা না বুঝে 'আবেগ চাই, আবেগ চাই' বোলে উচ্চ কণ্ঠে নারা দিলে ব্যাপারটা পেড়ে ধরার প্রয়োজন ঘটে। কারণ হৃদয়াবেগ জিনিস-টাই আসলে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। কেঁচোর ছেলে মরলে সে কষ্ট পায় না, গরুতে খানিকটা পায়, মানুষে তার চেয়ে ঢের বেশী পায়। এই তফাৎ ঘটেছে কিন্তু ঘিলুর তারতম্যের জন্যে। এই ঘিলুর তারতম্যেই মানুষ অনেক সূক্ষ্ম আবেগ অনুভব কোরতে পারছে। যেমন, পাওয়ার মধ্যে না পাওয়া, অনধিকৃত ভালোর জন্যে উন্মনা হওয়া, জীবনের অর্থ খুঁজে খুঁজে ঘোরা।

এই অনুভূতিগুলো যে মানুষ জন্মের মুহূর্ত থেকেই বোধ কোরছে তা তো নয়, এগুলো সংস্কৃতিলব্ধ। এবং এই যে সত্যকার মানবিক অনুভবের সংস্কৃতি এটি কোনও শ্রেণী বিশেষের সম্পত্তিও নয়। অনেক চাষাভূষো, গরীব গেঁয়ো, বা ফকীর জাতীয় লোকের মধ্যে এই অনুভবের এমন প্রখরতা দেখা যায় যা তথাকথিত ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল

উপরে | 'পুতুল খেলা'-র শেষ দৃশ্য।

তলায় | 'পুতুল খেলা'-র প্রথম দৃশ্য।

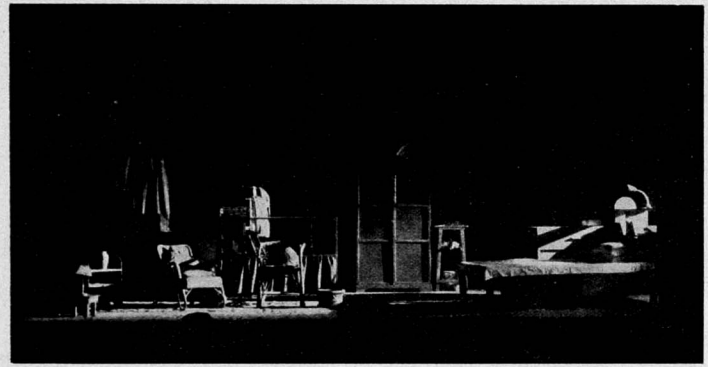

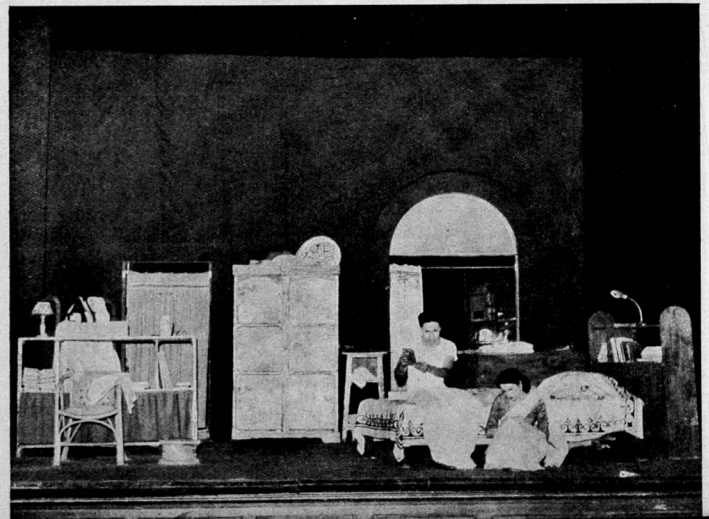

মহলে অনুপস্থিত। সমাজে সেই মানবিক সংস্কৃতির আশা করবার অধিকার নিশ্চয়ই শিল্পীর আছে। এবং তাঁকে বাধ্য হোয়ে সস্থা হোতে হলে অভিমান করবারও অধিকার আছে। কারণ, সমাজ হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির মার্জনার পথ দেখাবে না, বিশ্ববিদ্যালয় দেখাবে না, জাতীয় নেতারা দেখাবেন না, আর যতো দায়িত্ব পড়েছে কেবল হতভাগ্য শিল্পীদের ওপর! তাঁদের ওপর দেখি কেবলই নেমে আসার আদেশ! কোনও রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা, বা শিক্ষানেতা তো উন্মুক্ত গলায় বোলতে পারেন না যে, এগিয়ে যান আপনারা জীবন-বোধের দিকে যতোদূর পারেন, আমরাও উন্নততর জীবন-পরিকল্পনা কোরে আপনাদের বোধকে চ্যালেঞ্জ কোরতে কোরতে যাবো।

এই কথাগুলো আমি কিছু নতুন বোলছি না, এবং সকল সংস্কৃতিমনা লোকই মোটামুটিভাবে এসব কথা মানেন। কিন্তু যেমনি এই কথাগুলো থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় অমনি তাঁদের মধ্যে গণ্ডগোল লাগে। কারণ তাঁরা সত্যিই থিয়েটার দেখতে জানেন না; অনেকেই। এবং যাঁর যতো ইংরেজি বই পড়া আছে তাঁর পক্ষে একথা স্বীকার করা ততোই শক্ত হোয়ে পড়ে। এর উদাহরণস্বরূপ অনেক লোকের অনেক কথা উধৃত কোরে দেওয়া যেতো, কিন্তু তাতে কেবল তাঁদের রাগ কুড়ানোই হবে, এবং আমার অপরাধে 'বহুরূপী' কিছু অন্যায় প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবে, তাই সে কাজটা সমীচীন নয়।

কিন্তু দর্শকসাধারণের এই যে সঠিক দৃষ্টির অভাব এর কারণটাও স্পষ্ট। এমন লোককে হয়তো শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়ার চরিত্রে নামানো হলো যাঁর হাবে-ভাবে মুখে দেহে কোথাও অরক্ষণীয়ার লেশমাত্র নেই বরঞ্চ মনে হবে যে শতকরা পঁচাত্তরটা লোক এঁর রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ পেলে সৌভাগ্য মেনে তিন লাফে সামনে এসে দাঁত বের কোরে হাসবে। এমন লোককে শ্রীকান্ত সাজানো হলো যাঁকে দেখে একটি পরিচ্ছন্ন মনের

'পুতুল খেলা'-র বুলুর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র।

ডানদিকের পাতায় | 'রক্ত করবী'-তে গঞ্জু ও অধ্যাপকের ভূমিকায় নির্মল চ্যাটার্জী আর গঙ্গাপদ বসু।

'ছেড়া-তার'-এর শেষ দৃশ্য।

তলায় | 'স্বর্গীয় প্রহসন'-এর দেবদেবীরা।

নিরাসক্তি ও সংবেদনশীলতা অনুভবই হয় না। বা রাজলক্ষ্মীকে দেখে কেবল একটি বাইজীই মনে হয়, সেই তপশ্চারিণীর চেহারা দেখতেই পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই দর্শকের একাংশ কিছুই ভাবে না। যা বোলে দেওয়া হয় তাইই বিশ্বাস করে, নিতান্ত অসহ্য না হওয়া পর্যন্ত। এবং অপরাংশ, এটি খুবই ছোট অংশ, নিজের মনগড়া চেহারাটি দেখতে না পেলেই বেজার হোয়ে ওঠে। কিন্তু এর কোনোটাই শিল্পীকে সাহায্য করে না। শিল্পী তাঁর নিজের উপলব্ধি দিয়ে একটি চরিত্রের তলদেশ পর্যন্ত বিশ্লেষণ কোরে নিজের সেই বোধটা দর্শকদের বোঝাতে চান যাতে দর্শকরা তাঁর যুক্তি জীবনের টীকা হিসাবে বোঝে। ঠিক যেমন কোরে উপন্যাসকার গল্প লেখেন, ভালো অভিনেতাও ঠিক তেমনি কোরেই চরিত্র ফোটান। আত্মপ্রদর্শন নয়, উপলব্ধি দিয়ে জীবনবোধ প্রকাশ।

এইখানে বর্ণার্ড শ দুজে সম্বন্ধে যেসব নানা কথা বোলেছেন তার কিছুটা উধৃত কোরলে হয়তো আমার পঙ্গু ভাষার বাধা অতিক্রম কোরে ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

"... Duse has been helped to her supremacy by the fortunate sternness of Nature in giving her nothing but her genius. ... The extraordinary richness of her art can only be understood by those who have studied the process by which an actress is built up. You offer a part to a young lady who is an enthusiastic beginner. She reads it devoutly, and forms, say, half a dozen great ideas as to points which she will make. ... The great actress has a harder struggle. She goes on inventing her points and her business determinedly, constantly increasing the original half-dozen, and constantly executing them with greater force and smoothness. A time comes when she is always making points, and making them well, and this is the finishing point with some actresses. But with the greatest artists there soon commences an integration of the points into a continuous whole, at which stage the actress appears to make no points at all, and to proceed in the most unstudied and "natural" way. This rare consummation Duse has reached. An attentive study of her Marguerite Gauthier, for instance, by a highly trained observer of such things, will bring to light how its apparently simple strokes are combinations of a whole series of strokes, separately conceived originally, and added one by one to the part, until finally, after many years of evolution, they have integrated into one single highly complex stroke. Take, as a very simple illustration, the business of Camille's tying up the flowers in the third act. It seems the most natural thing in the world; but it is really the final development of a highly evolved dance with the arms—even, when you watch it consciously, a rather prolonged and elaborate one. The strokes of character have grown up in just the same way. And this is the secret of the extraordinary interest of such acting. ... It is the rarity of the gigantic energy needed to sustain this work which makes Duse so exceptional; for

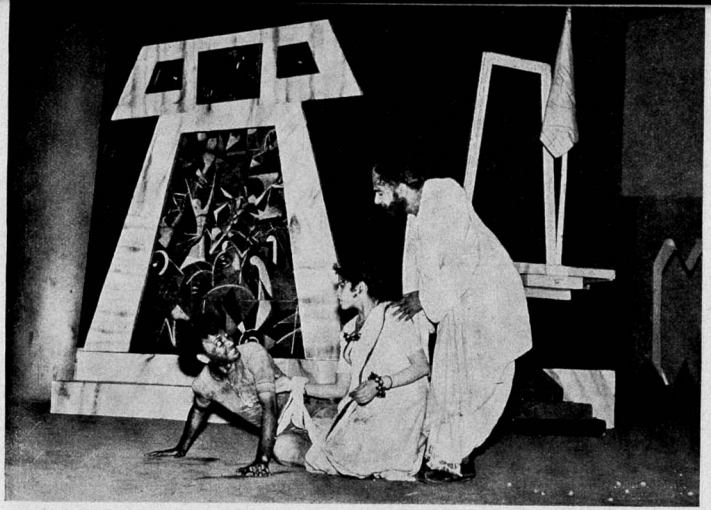

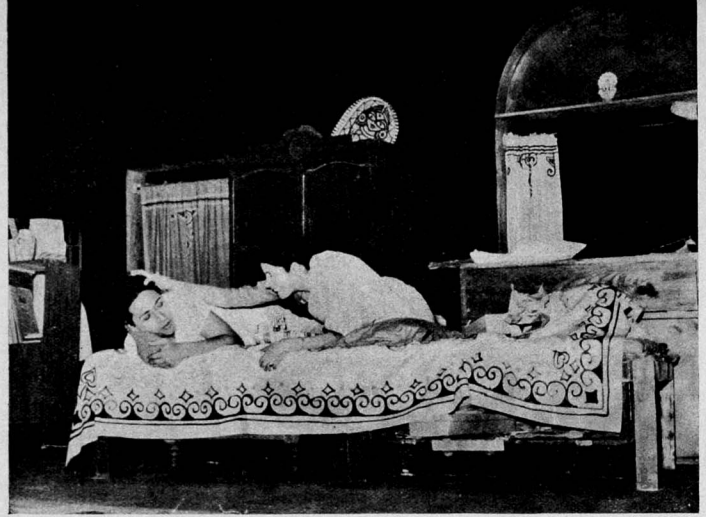

'পুতুল খেলা'-র প্রথম দৃশ্য।

the work is in her case highly intellectual work."

এখন, এই যে স্ট্রোক দেওয়া, এই ইঙ্গিত, বোঝবার জন্যে দর্শকদেরও কিঞ্চিৎ হৃদয়বান ও দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া দরকার। উপন্যাসে বা গল্পে চরিত্রের সম্বন্ধে লেখক তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কোরে দেন, যা পড়ে পাঠকরা আন্দাজ করবার একটা সুবিধে পান। কিন্তু অভিনয়ে যখন কোনও চরিত্র আসে তখন তার কোনও বর্ণনা বোলে দেওয়া হয় না, সেটাকে দর্শকদের নিজের বোধ দিয়ে অনুভব কোরতে হয়। এমন কি অন্যান্য চরিত্র যদি ঐ উপরোক্ত চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলেও তাহলেও দর্শককে বুঝে নিতে হবে যে এটি সেই অন্যান্য চরিত্রদের চরিত্রের মেজাজ অনুযায়ী কথা, নাট্যকারের কথা নাও হোতে পারে। সময়ে সময়ে ওসব কিছুই বলা থাকে না, চরিত্রটি সোজা উপস্থাপিত করা হয়। তখন অভিনেতারা দর্শকদের বোধকে সাহায্য করবার জন্যে কিছু ইঙ্গিত দেন। কিন্তু অনেক সময়েই এমন হয় যে দর্শক সেটা লক্ষ্যই করেন না। তাঁদের লক্ষ্য থাকে গল্পর ওপর, নাটকীয় ঘটনার ওপর, এবং বড়ো আবেগ প্রকাশের সময়টির ওপর। কিন্তু সেই যে বড়ো আবেগ যেটি একটি নাটকীয় মুহূর্তে নাটকে আসবেই সেটি যে কেমন কোরে একটি চরিত্রে অনিবার্য হোয়ে উঠছে সেই লজিকটাই তো লক্ষণীয়। নইলে কেবল গল্প তো মহিলাদের অপর বাড়ী সম্পর্কে পরচর্চার মতো। অভিনয়ে পাঁচটি চরিত্র একই সঙ্গে নিজের নিজের অন্তর্নিহিত মানসিক গঠনের বেগে বিভিন্নভাবে একই ক্রাইসিসে এসে পৌঁছয়, অনিবার্যভাবে। তাই প্রত্যেক চরিত্রের জীবন সম্পর্কে যে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা সেটা যদি দর্শক অনুভব না কোরতে পারেন তাহলে সংকটমুহূর্তের অনিবার্যতাও তিনি দেখতে পাবেন না। তাতে লোকসান উভয়ত। যেমন ধরা যাক, 'পুতুল খেলা' নাটক সুরু হওয়ার পাঁচসাত মিনিটের মধ্যেই বুলু তার ডালমুট খাওয়াটা স্বামীর কাছে গোপন রেখে মিথ্যে কোরে বলে, 'তোমার যা খারাপ লাগে তা আমি কখনো করি?' এবং স্বামী আত্মতৃপ্তভাবে স্ত্রীর পিঠে আদর কোরে হাত রেখে বলে, 'না। তা আমি জানি।'

ব্যস। যে কোনও দৃষ্টিশক্তিমান লোকের তো নাট্যকারের এই এক ইঙ্গিতেই চমকে উঠে ভাবা উচিত যে এদের এই সুখী-দম্পতিভাব কতোটুকু ভর সইবে? এতো সহজ মিথ্যের ওপর যার বনেদ?

এইরকম ইঙ্গিত নাট্যকার দেন গল্পের উপপাদ্য বিষয় সম্পর্কে, নির্দেশক ইঙ্গিত দেন মুড আর পরিবেশ সম্পর্কে, যা এই উপপাদ্যকে অনিবার্য কোরে তুলবে, আর অভিনেতা ইঙ্গিত দেন চরিত্রের রূপের, যা আবার এই পরিবেশের মধ্যে ঐ উপপাদ্যের অনিবার্যতা প্রমাণ কোরবে। কিন্তু এইসব শিল্পীরা যদি দেখেন যে তাঁদের এই 'স্ট্রোক'গুলো কেউ নজর করে না তখন হাজার প্রশংসা পেলেও তাঁদের মন ভেঙে যায় এবং ক্রমশঃ তাঁরাও সূক্ষ্ম কারুকার্য করা ছেড়ে দেন। যেমন হোয়েছে আমার বিশ্বাস, শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ক্ষেত্রে।

মনে করা যাক 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে তাঁর প্রথম প্রবেশের কথা। চলনভঙ্গী তিনি এমন কোরেছিলেন যেন দিনের বেশীর ভাগ সময় তিনি ঘোড়ার ওপরেই থাকতে অভ্যস্ত।

জীবনে আমরা দেখি যে 'জকি'র হাঁটা এবং—ধরুন—একজন বিচক্ষণ ডিপ্লোম্যাটের হাঁটা এক নয়। কিন্তু নাদির শাহ্ অভিজাত-বংশীয় অমায়িক ডিপ্লোম্যাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন মেষপালক, যোদ্ধা ও সহজাত বুদ্ধির

'ছেড়া তার'-এ তৃপ্তি মিত্র আর আরতি মৈত্র।

অধিকারী। তাই তাঁর চলাফেরায় ও ভাবভঙ্গীতে শার্দুলের মতো বন্যতা ও ক্ষিপ্রতা এনেছিলেন শিশির-কুমার। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই চরিত্রের ট্র্যাজেডি ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দর্শকসাধারণ তা বোঝেন-নি এবং কেউ তাঁদের বুঝিয়েও দেননি। ফলে কেউ যদি কোনও ভালো অভিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, কেন সেটা ভালো, তাহলে শতকরা নব্বইজন লোকই ঠিক জবাব খুঁজে পান না। বলেন, 'খুব natural লাগলো। ওঁকেই সেই চরিত্র বলে মনে হলো। নিজের সত্তাকে লুকিয়ে একেবারে চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়ার নামই তো ভালো অভিনয়। না কী?'

অর্থাৎ শিল্পের আসল দিকটির প্রতি—যেখানে অভি-নেতার বুদ্ধি ও আবেগ সংযত ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে জীবনের জটিল গভীরতা উন্মোচন কোরতে চেষ্টা করেন—সেই দিকটা স্পষ্ট উপলব্ধি না কোরে দর্শক একটি ভুল দিকে ঝোঁক দেন। ন্যাচারল্ কি? আজকের দিনে একটি গাছের ছবি দেখে কেউ যদি বলে, 'খুব ন্যাচারল্, ঠিক গাছ বোলেই মনে হলো।' তাহলে লোকে তাকে কি বোলবে? তবে অভিনয় দেখতে এসে ঐ কথাটিই ওঠে কেন?

আসলে, অভিনেতা চরিত্রটির প্রকাশে কতকগুলো পয়েন্ট আনতে চান যা সর্বাঙ্গীণ নাটকের সঙ্গে যুক্ত।

এইখানে সাল্‌ভিনি নামক বিখ্যাত অভিনেতার ওথেলো সম্পর্কে স্ট্যানিস্‌ল্যাভ্‌স্কি কি লিখেছেন তার কিছুটা উদ্ধৃত কোরলে প্রাসঙ্গিক হবে।

তিনি লিখেছেন, "There were his large, pointed moustaches, his wig too much like a wig, his figure too large, too heavy, almost fat, great eastern daggers that dangled at his waist and made him look stouter than he was, especially when he donned a Moorish cloak and hood. All of this was not much typical of the soldier Othello." তারপর যখন ক্রমশঃ ইয়াগোর মন্ত্রণায় স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে, যখন একবার তার প্রতি রূঢ় হোচ্ছে এবং পরক্ষণেই অনুতপ্ত হোয়ে বেশী ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা কোরছে, কিন্তু আবার সন্দেহের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হোয়ে পড়ছে, সেই তৃতীয় অঙ্কে যখন ওথেলো ইয়াগোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই দৃশ্য সম্পর্কে স্ট্যানিস্‌ল্যাভ্‌স্কি লিখছেন,

ডান পাতায় | 'পুতুল খেলায়' আরতি মৈত্র, কুমার রায়, তৃপ্তি মিত্র।

"He throws Iago to the floor and is on him in one leap, pressing him to the ground, leaps up, lifts his foot above Iago's head to crush it like a snake's, remains in that pause, becomes confused, turns away and without looking at Iago offers him a hand, lifts him, and falls himself on a couch, crying like a tiger in the desert when he has lost his mate.

At that moment the likeness of Salvini's Othello to a tiger was self-evident. I understood now that even before, in the embraces of Desdemona and in the subtle, feline manners of the speech in the Senate, even in his very method of walking, I had guessed in him the presence of a beast of prey."

'দিগ্বিজয়ী'-র অভিনয় যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই মনে কোরতে পারবেন যে এরকম কলা-কৌশল সে নাটকেও বড়ো কম ছিল না। শিশিরকুমারের আর একটি অভি-নয়ের একটি দৃশ্য প্রচণ্ডতায় ও গভীরতায় অতুলনীয়। সে হলো রঘুবীর নাটকে যখন রঘুবীর রঘুয়াতে পরিণত হয়। অনেকে হয়তো আজকাল সে নাটক সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাই গল্পটা একটু বলা দরকার। এক রাজ্যের ব্রাহ্মণ দেওয়ান একটি ভীলশিশুকে পুত্রের মতো স্নেহে পালন করেন। এবং তাকে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে, ব্রাহ্মণের ক্ষমা ধর্মে দীক্ষিত কোরে তোলেন। তারপর দেশের নবাবকে হত্যা কোরে একজন বদ লোক সিংহাসন অধিকার করে। এবং এই দেওয়ান মৃত নবাবের মেয়ে ও নিজের সন্তানাদি নিয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে যান। সেইখানে নতুন নবাবের অত্যাচারের কাহিনী যতো পৌঁছুতে থাকে ততোই দেওয়ানের আপন সন্তান রাগে ও প্রতিহিংসায় উত্তপ্ত হোয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু পালিত পুত্র রঘুবীর এদের সংযত হবার উপদেশ দেয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শে। এমন কি তার নিষ্ক্রিয়তায় সবাই যখন তার উপর রেগে উঠতে থাকে তখনও সে পালক পিতার শিক্ষা মনে রেখে নিজেকে ব্রাহ্মণ্যে অটল রাখে। কিন্তু ক্রমশঃ তার মনে সন্দেহ ঢোকে, এবং নবাবের এক চরম অত্যাচারে একদিন তার এতোদিনের ক্ষমা ও অহিংসার ভিত্তি ভেঙে পড়ে। অন্ধকারে এক প্রান্তরের মধ্যে রঘুবীরের নিজের পালকপিতার সঙ্গে দেখা হয়। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে যে ব্রাহ্মণের আদর্শ

আমার জন্যে নয়, আমি জাতিতে ভীল, আমার শিরায় ভীলের রক্ত, যে ভীল সিংহের সঙ্গে হাতীর সঙ্গে লড়াই কোরে বাঁচে। আমার রক্ত ক্ষমার কথা কয় না, হিংসার কথা কয়। আমার মন্ত্র সংহার, সংহার। আর আমি রঘুবীর নই, আমি রঘুয়া, আমি ভীল।

এই দৃশ্যের অভিনয়ে অনেক অতুলনীয় গুণের সঙ্গে একটি জিনিস শিশিরকুমার অসামান্য ক্ষমতায় প্রকাশ কোরেছেন। সে হলো, প্রায় হাস্যকর ভঙ্গী দিয়ে একটি প্রচণ্ড কবিতা রচনা করার পদ্ধতি। একজন পঞ্চাশ বৎসরের লোককে পায়ে মল পরে কথার তালে তালে মঞ্চের ওপর প্রায় নাচতে দেখলাম, 'সংহার, সংহার' বোলে দুই পা তুলে লাফাতে দেখলাম। এসব স্বাভাবিক নয়, শহুরে নয়, sophisticated নয়। কিন্তু এর প্রবল ভীষণতায় আমার মনে হোয়েছিল যে আমি ম'রে গেছি। আমার জীবনে বিরাট শিল্প আমাকে যে ক'বার মুহ্যমান কোরে দিয়েছে এটি তার মধ্যে একবার।

কিন্তু এই দৃশ্য অকস্মাৎ একটি রগ্‌রগে বাটি-চচ্চড়ির মতো পরিবেশন করা হয়নি। এই সংকটকে শিশির-কুমার নাটকের প্রথম থেকে গড়ে তোলেন রঘুবীরের শান্তি দিয়ে, কষ্ট মেনে নেওয়া শান্তি দিয়ে, বিচলিত সহজ শান্তি দিয়ে, বিক্ষুব্ধ অশান্ত মনকে চেপে জোর কোরে শান্তির কথা বোলবার চেষ্টা দিয়ে, নিজের কথায় নিজের সন্দেহ দিয়ে। তবেই হঠাৎ ঝোড়ো সমুদ্রের মতো যখন রঘুবীর উত্তাল এবং উদ্দাম হোয়ে ওঠে আমরা আতঙ্কে স্তব্ধ হোয়ে যাই, আমার নিজের কথা ভেবে, মানবনীতি কি—সেই প্রশ্নের কথা ভেবে।

এইরকম দুর্দ্ধর্ষ প্রতিভাধর ছিল এই বাংলা দেশে। দেশ তাঁকে পয়সাও দিয়েছিল প্রচুর। সুখ্যাতিও দিয়ে-ছিল অপরিমেয়। তিনি তার মর্যাদা রেখেছেন কিনা সে তর্ক এখানে অবান্তর। কিন্তু বর্তমান লেখকের স্পষ্ট মনে হোয়েছে যে তাঁর ভিতরকার শিল্পী-আত্মা সুবিবেচিত গুণবিচারের অভাবে কষ্ট পেয়েছে, মরেছে।

এই দৃষ্টির অভাব ছিল বোলেই তাঁর 'সীতা' লোকে যেমন দেখেছে, 'কর্ণার্জুন'ও তেমনি ভীড় কোরে দেখেছে। আর তাই শেষ পর্যন্ত টিকে গেল সস্তা থিয়েটারি থিয়েটার, আজ যা বাজার ছেয়ে আছে।

সুতরাং একবার বোধহয় আমাদের ভাবা উচিত যে হবুচন্দ্রের প্রজাদের মতো মুড়িমিছরির একদর কোরলে এই ক্ষতি স্বীকার কোরতেই হবে, তখন কেবল ব্যক্তি-বিশেষকে গালি পেড়ে ইতিহাসের এজলাসে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

আজ তাই পেশাদারী থিয়েটারের বাইরে যে 'জাতীয় নাট্যশিল্প' রূপ পরিগ্রহ কোরছে, নবনাট্যান্দোলনের বহু দলের বিভিন্ন চেষ্টায়, তার গুণাগুণও যদি দেশ সু-বিবেচনার সঙ্গে না দেখে তাহলে আবার এর দাম দিতে হবে। পিঠ চাপড়ানো নয়, স্বরারি নয়, খালি সত্যকার গুণটাকে গুণ বোলে বোঝা।

যাইহোক, এতো গেল কেবল অভিনেতাদের অংশের কথা। এছাড়া আরও জিনিষ দেখবার আছে। যেমন মঞ্চসজ্জা, আলো।

মঞ্চসজ্জা বা আলো সম্পর্কে এখানে বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ, এই দিকগুলোয় দর্শকের চোখ এখন গেছে। তবু সেই দেখা যে কতোটা তীক্ষ্ণ হওয়ার দরকার তা আর একজনের দেখার বিবৃতি দিলে হয়তো সাহায্য কোরবে। সে লোক হচ্ছেন Eric Bentley। তিনি Tennessee Williams-এর Cat on a hot tin roof-এর অভিনয় সম্পর্কে একটি সমালোচনা লিখেছেন।

লিখেছেন, "Jo Mielziner's setting for cat on a hot tin roof consists of a square and sloping platform with one of its corners, not one of its sides, jutting out towards the audience. . . . The whole stage is swathed in ever-changing light and shade. . . . Such is the world of Elia Kazan (নাট্যনির্দেশক), as we know it from his work on plays by more authors than one. The general scheme is that not only of *A Street car Named Desire* but also of *Death of a Salesman*: an exterior that is also an interior—but, more important, a view of *man's* exterior that is also a view of his interior, the habitat of his body and the country of his memories and dreams. A theatre historian would probably call this world a combination of naturalism and expressionism, yet one has no impression that it was arrived at by mixture, or even by choice, of styles : it is a by-product, or perhaps end product, of a certain sort of work which has its own history and identity. It is one of the distinctive creation of American theatre."

অর্থাৎ এখানেও সামগ্রিক সংস্কৃতিবোধের সংবেদনশীলতা, ও নাট্যশিল্পের বিবর্তনের পারম্পর্যজ্ঞান না থাকলে এ বিভাগের strokes-ও নজর এড়িয়ে যায়। ফলে, প্রত্যেক নতুন শিল্পকৌশল যে সংস্কৃতির অঙ্গ পুষ্ট কোরে দেশেরই উত্তরাধিকার ঐশ্বর্যমণ্ডিত কোরছে, সেই উত্তরাধিকার সম্পর্কে দেশের লোকই অজ্ঞান থেকে যায়।

কিন্তু এছাড়া আরো একটি দিক আছে নির্দেশকের কাজের। সেটি হলো মঞ্চের ওপর অভিনেতৃ সংস্থা-পনের কৌশল। নাটকে যে কথাগুলো বলবার সেগুলো ডাইনে দাঁড়িয়ে বলা যায়, বাঁয়ে দাঁড়িয়ে বলা যায়, মাঝখানে দাঁড়িয়েও বলা যায়। নির্দেশক যে কোন সময়ে কাকে কোথায় দাঁড় করাচ্ছেন বা বসাচ্ছেন তার ওপরে নাটকের ঘটনার গুণগত পার্থক্য ঘটে। এবং এই যে সমস্ত টুকরো টুকরো ছবি, এইগুলো গেঁথে গেঁথেই ক্লাইম্যাক্স-এর ক্ষণটা রচিত হয়। আইসেন্-স্টাইন তাঁর বইয়ে বর্ণনা কোরেছেন যে কেবলমাত্র কম্পোজিশনের ছন্দে মানুষের মনে আবেগ জাগানো যায়। মঞ্চেও সেই কাজ। অতি দ্রুত অভিনেতাদের স্থান পরিবর্তন কোরিয়ে মুহুর্মুহু মঞ্চের ওপর তাঁদের বিন্যাসে বৈচিত্র্য ঘটিয়ে হঠাৎ একটি নাটকীয় কথায় যদি তাঁদের স্থানু কোরে দেওয়া যায়, এবং একটু পরে একজন সামনে আস্তে আস্তে হেঁটে একদিকে সরে যায়, ও পিছনে একজন দুমদুম্ কোরে রাগ কোরে মঞ্চের একদিক থেকে অন্যদিকে বেরিয়ে যায়, তাহলে এই বিন্যাসের ও ছন্দের বৈচিত্র্যে নাটকীয় মুহূর্তের যে গভীরতা প্রকাশ পায় সেটাও নাট্যশিল্পের একটি বড়ো অঙ্গ।

বিলিতি সিম্ফনিতে যেমন নানান্ যন্ত্রের বিভিন্ন ব্যবহার একটি জটিল নাটকীয়তা সৃষ্টি করে, মঞ্চের অভিনয়েও সেইরকম। এখানে, যেমন একটি মাথার বা একটি হাতের ক্লোজ-আপ নেই, তেমনি এর বিস্তৃত ভূমিকায় একই সঙ্গে কয়েকটি চরিত্রের বিভিন্ন সুরের সংঘাতে জটিল বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার সুযোগ অপার। সে বৈচিত্র্য আসে অভিনেতাদের স্বর বৈপরীত্যে, যা আনন্দ দেয় কানে। আবার সে বৈচিত্র্য আসে প্রতি-মুহূর্তে কম্পোজিশনের পরিবর্তনে, যা আনন্দ দেয় চোখে। এবং সর্বোপরি বৈচিত্র্য আসে একই ঘটনায় বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায়, যা আনন্দ দেয় মনকে। যাইহোক, Eric Bentleyর উপরোক্ত লেখা থেকে আরও কিছুটা উধৃত কোরলে হয়তো আমার সাহায্য হবে।

". . . He has departed further from naturalism : just as there is less furniture and less scenery, so there is a less natural handling of actors, a more conscious concern with stagecraft, with pattern, with form. Attention is constantly called to the tableau, to what, in movies, is called the individual "frame." You feel that Burl Ives has been placed center stage, not merely that *he* is there ; in the absence of most of the furniture, a man's body is furnishing the room. . . . All the groupings are formalized. My review should probably be accompanied by diagrams showing where Mr. Kazan put everybody, by twos, by threes, this one over here moon-gazing through the imaginary window, this one over there ego-gazing at the imaginary mirror. . . . The lights are handled with equal formality." ইত্যাদি।

এইবারে আমাদের দেশের একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটি শেষ করা যায়। কর্ণার্জুন বইখানায় কিছু ছবি আছে। সে ছবিগুলো দেখলেই মনে হয় যে সেগুলো সচেতনভাবে পোজ দেওয়া, এবং পোজগুলোও পুরোনো। কিন্তু 'সীতা' অভিনয়ের সুরু যাঁর মনে আছে তিনিই বুঝবেন যে ভঙ্গীর স্টাইল কাকে বলে। কতো সহজভাবে formalized.

গোরেলিক নামক এক বিখ্যাত মঞ্চসজ্জাকর তাঁর বইয়ে বোলেছেন যে আদিকাল থেকে থিয়েটার খানিকটা illusion এবং খানিকটা convention. অর্থাৎ খানিকটা সে বিভ্রম ঘটাতে চায়, এবং খানিকটা সে রীতি অনুযায়ী মেনে নিতে বলে।

যেমন, আমাদের যাত্রায় প্রাসাদ বা অরণ্য কল্পনা কোরে নিতে বলে, সংস্কৃত মঞ্চে মুদ্রা কোরে বোলে দেওয়া হোতো,—এইগুলো হলো convention. কিন্তু রাজাকে রাজার পোষাকই দিয়ে আসা হয়, সেখানে কল্পনার ওপর নির্ভর করা চলে না। সে যাত্রাই হোক, বা সংস্কৃত নাটকই হোক। কিন্তু এই যে মিশ্রণ, এর মাপটা দেশ ও কাল অনুযায়ী পৃথক। তাই আমার দেশের ও আমার কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই মশলার মাপ বের করার দায় শিল্পীর, এবং তার সফল মিশ্রণে অচেতন আনন্দ নয়, সচেতন আনন্দ পেলে তবেই শিল্পের উন্নতি।

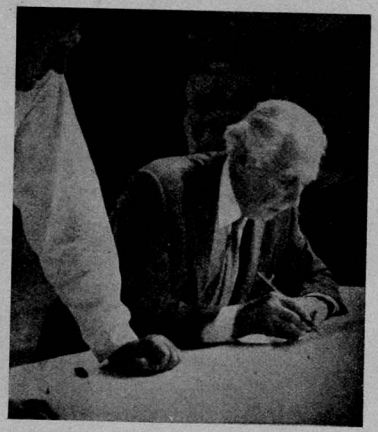

পরিকল্পনা-নক্শা অঙ্কনে রত লয়েড রাইট।

কবি-স্থপতি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

উপলব্ধির প্রগাঢ়তা এবং শিল্প-প্রমূর্তির স্নিগ্ধ মাধুর্যে বিশিষ্ট, কবিতা রচনায় কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত তরুণ কবিদের মধ্যে অগ্রণী। সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনাতেও চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ রিসার্চ ফেলো' রূপে মুদ্রাতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত।

সাম্প্রতিক স্থাপত্যকলার জগতে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট উজ্জ্বলতম নাম। যে দেশে তাঁর জন্ম ও যে-দেশে তাঁর শিল্প-প্রতিভা অনিন্দ্য কীর্তিসমূহে পরিস্ফূর্ত, সেই আমেরিকাতে তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকরা বিমুগ্ধ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে থাকেন। আলেকজাণ্ডার উলকট তো স্পষ্টই বলেছেন, তাঁকে যদি 'জিনিয়াস' বা প্রতিভা কথাটি কোন জীবিত আমেরিকানের জন্য সংরক্ষিত করতে বলা হয়, তবে তিনি তা ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের জন্য এবং একমাত্র তাঁরই জন্য সংরক্ষিত করে রাখবেন।

১৮৬৮ সালে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট জন্মগ্রহণ করেন। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে তিনি স্থাপত্যকলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এখানে অধ্যয়ন কালেই তিনি লুই সালিভানের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান। লুই সালিভান—রাইট-পূর্ব মার্কিন স্থাপত্য-কলার জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিমান পুরুষ এবং আধুনিক 'স্কাইস্ক্রেপার'-এর জনকরূপে সম্মান-স্বীকৃত—এই সময় অ্যাডলারের সহযোগিতায় বিখ্যাত 'অডিটোরিয়াম বিল্ডিং' নির্মাণে রত ছিলেন এবং তাঁর আমন্ত্রণে রাইট তার সহায়ক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত রাইট অ্যাডলার ও সালিভানের অফিসে কাজ করেন। সুতরাং লুই সালিভানই ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের শিক্ষক ও গুরু; এবং রাইটও তাঁর উপযুক্ততম শিষ্য। অনেক সমালোচকের মতে, সালি-ভানের চিন্তা ও সেরা পরিকল্পনাগুলি তাঁর নিজের কাজের চাইতে রাইটের কাজেই বিশ্বস্ত, পূর্ণায়ত ও সার্থকতর রূপ লাভ করেছে।

রাইটের শিল্পকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করার আগে মার্কিন স্থাপত্যকলার একটি নির্ভুল রূপ-রেখা দেওয়া অসংগত হবে না; এবং এই রূপ-রেখার পশ্চাৎপটে রাইটকে বোঝাও বোধ হয় সহজতর হবে। স্থাপত্য-কলার ঐতিহাসিক ও সমালোচকরা প্রায় তিনশো বছরের মার্কিন স্থাপত্যকলাকে যে-তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন তা হল: ঔপনিবেশিক বা জর্জিয়ান যুগ (প্রাচীনতম উপনিবেশ স্থাপনের কাল থেকে স্বাধীনতা-যুদ্ধের কাল অর্থাৎ ১৭৭৫-৮৩ পর্যন্ত); রিপাবলিকান যুগ (উত্তর ঔপনিবেশিক বা জাতীয় বা আধুনিক যুগ নামেও যা অভিহিত—স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে চিকাগো প্রদর্শনী বা ১৮৯৩ পর্যন্ত); এবং সাম্প্রতিক যুগ (১৮৯৩ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)। ঔপনিবেশিক বা জর্জিয়ান যুগের স্থাপত্যকলা স্বতঃসিদ্ধভাবেই জর্জিয়ান যুগের ব্রিটিশ স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত; মার্কিন সভ্যতা ও স্বাক্ষর তাতে অনুপস্থিত। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী যুগ বা উপরি-উল্লিখিত রিপাবলিকান যুগকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের সূচনায় স্বভাবতঃই মার্কিন স্থাপত্য-কলায় স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতা প্রকাশের ঝোঁক দেখা গেল, কিন্তু ক্রমশ সেই স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতা যেন হারিয়ে যেতে লাগল। 'গ্রীক রিভাইভ্যাল' ও 'গথিক রিভাইভ্যাল'-এর ছায়ায় রচিত এ সময়কার স্থাপত্য-শিল্প ক্রমে একঘেঁয়েমি, বৈচিত্র্যহীনতা ও অবনতির সীমান্তবর্তী হয়ে পড়ল। ১৮৬১-র গৃহযুদ্ধে বৈচিত্র্যহীন এই মার্কিন স্থাপত্যকলা মুক্তি লাভ করল এবং নবজীবনের প্রাণবন্ত তারুণ্যে মুখর হয়ে উঠল। এই গৃহযুদ্ধে মার্কিন স্থাপত্যকলার রিপাবলিকান যুগের দ্বিতীয় পর্ব রচিত হল এবং পরবর্তী অর্থাৎ 'সাম্প্রতিক' যুগের বীজও এই পর্বেই নিহিত। এই পর্বের প্রথম ও প্রধান শিল্পপুরুষ হেনরি হবসন রিচার্ডসন (১৮৩৮-১৮৬১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম দিকের কাজগুলি 'রোমানেস্ক রিভাইভ্যাল'-এর ছায়ায় রচিত; পরে তিনি নিজের পথ খুঁজে পান, আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নতুনভাবে কাজ করেন এবং তাঁর এই পরবর্তীকালের কাজ-গুলিই তাঁর শিল্পধর্মিতা ও বৈশিষ্ট্যের যথার্থতর পরিসূচক। রিচার্ডসনের প্রতিভা শেষের দিকে ক্রমশ সমৃদ্ধ বিকাশের পথ ধরে এগিয়ে চলছিল এবং ১৮৮৬ সালে তাঁর অকালমৃত্যু না ঘটলে মার্কিন স্থাপত্যশিল্পে আরও অনেক বড় রকমের কিছু দান তিনি রেখে যেতে পারতেন। তবে পরবর্তীকালের মার্কিন স্থপতিদের রিচার্ডসন উল্লেখ্যভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং সুখের কথা, তিনি এমন দু-একজন ছাত্র ও শিষ্য পেয়েছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে তাঁর অসমাপ্ত কাজ ও অপূর্ণ শিল্প-পদ্ধতিকে পূর্ণতার সামীপ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন; পূর্বো-ল্লিখিত লুই সালিভান (১৮৫৬-১৯২৪) এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। জন ওয়েলবর্ণ রুট-এর (১৮৫০-১৮৯১) নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তবে রিচার্ডসনের মতো মৃত্যু তাঁরও জীবনে অকালে ছেদ টেনে দিয়েছিল।

যদিও তাঁর শিষ্য মার্কিন স্থাপত্যকলার 'সাম্প্রতিক'

লয়েডের স্থাপত্য সমুদ্র ও দিগন্তের সঙ্গে চির-মধুর মিতালীতে।

যুগের প্রবর্তক তবু ব্যাপক অর্থে লুই সালিভানকেই যুগের প্রবর্তকের সম্মান দেওয়া যায়। সাম্প্রতিক মার্কিন স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্য তা যুগধর্মের নির্ভরযোগ্য দর্পণ, তা অন্য কোন দেশের রীতিপদ্ধতি বা প্রাচীন বিশ্বের পুনর্জাগ্রত স্থাপত্যকলার ছায়ায় গঠিত নয়, একান্তভাবেই দেশের মাটির সঙ্গে যুক্ত। সালিভান এই দেশকালকে অর্থাৎ আমেরিকার মাটি জলবায়ু আবহাওয়ার স্বভাব, যুগের ধর্ম, আমেরিকার সভ্যতার মূল সুর আশ্চর্যভাবে ধরতে পেরেছিলেন। যে যুগে তাঁর আবির্ভাব, সে যুগের কাছ থেকে তিনি অনেক শিক্ষা স্বাঙ্গীকৃত করেছিলেন; এক কথায় তিনি ছিলেন যুগ-স্থপতি, যে কারণে মামফোর্ড তাঁকে 'মার্কিন স্থাপত্যশিল্পের ওয়াল্ট হুইটম্যান' আখ্যায় নন্দিত করতে চেয়েছেন। চিকাগোর 'অডিটরিয়ম বিল্ডিং' ছাড়াও সেন্ট লুইর 'ওয়েনরাইট বিল্ডিং' (১৮৯১), বাফালোর 'প্রুডেন্-সিয়াল বিল্ডিং' (১৮৯৫) এবং চিকাগোর 'শিলার বিল্ডিং' (১৮৯২), 'গেজ বিল্ডিং' (১৮৯৮) ও শেষ দিক্‌কার 'শ্লেসিঙ্গার অ্যাণ্ড মেয়ার বিল্ডিং' তাঁর প্রধান কীর্তি। এই সব স্থাপত্যকৃতিতে 'সাম্প্রতিক' যুগের লক্ষণ পরিস্ফুট; বোঝা যায় এদের নির্মাণশিল্পী সভ্যতার সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন ছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন স্থপতিকে নিছক একটা বাড়ি বানালেই চলবে না, বর্তমান যুগের গুণময় শক্তিমত্তা ও গতিবেগকে শৃঙ্খলা-সংহত করে মানুষের প্রয়োজনে লাগাতে হবে, কল্পনা-প্রসূত মৌলিকত্বকে কার্যকরী স্থাপত্যকৃতিতে রূপায়িত করে তুলতে হবে। এজন্যে হালের বাড়ি-ঘরে পুরানো যুগের 'ক্লাসিক' স্থাপত্যরীতি প্রয়োগ করা চলবে না। হালের বাড়ি ঘর তৈরি করার সমস্যা নূতন করে ভাবতে হবে, এমন সমাধান-সূত্র আবিষ্কার করতে হবে, যা বসতবাড়ি থেকে শুরু করে অফিসবাড়ি, কারখানা বাড়ি সর্বত্র প্রয়োগ করা যাবে। এদিক দিয়ে রিচার্ডসন থেকে সালিভান এগিয়ে এসেছিলেন। রিচার্ডসনের রোমান্টিক স্থাপত্য-রীতি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে সালিভান নতুন দিনের স্থাপত্য-রীতি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন; রিচার্ডসনের স্থাপত্যরীতির উপর সালিভান এই নতুন দিনের স্থাপত্য-রীতি বা 'সাম্প্রতিক' স্থাপত্যকলার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর যে-শিষ্যের কাজের মধ্যে এই নতুন ধরনের স্থাপত্য-রীতির বিকাশ সম্পূর্ণতা লাভ করে, তিনি হলেন ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট। বস্তুত, সালিভান হলেন রিচার্ডসন ও রাইটের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ-স্থপতি এবং মার্কিন স্থাপত্য-কলার ইতিহাসে এই স্থপতিত্রয়ের আবির্ভাব এক অবিচ্ছেদ্য পারম্পর্যে গ্রথিত।

'অ্যাডলার অ্যাণ্ড সালিভান'-এর অফিসে কিছুদিন কাজ করার পর ১৮৮৯-৯০ সালের দিকেই রাইট স্বাধীন-ও-ব্যাপকভাবে স্থাপত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। চিকাগো ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলকে তিনি তাঁর কর্ম-কেন্দ্র করলেন। রাইটের প্রথম বাড়ি তৈরি হয় ১৮৮৯ সালে; চিকাগোতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই প্রথম বাড়িটিতেই রাইটের নিজস্ব চিন্তাধারা ও অভি-নবত্ব মূর্ত হয়ে উঠল এবং সে-সময়কার অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে ঐ বাড়ির পার্থক্যও প্রকট হয়ে ধরা দিল। মার্কিন স্থপতি ও শিল্প-সমালোচকরা তাঁর মধ্যে নতুন কালের স্থপতির সম্ভাবনা দেখলেন। রাইট বিরূপতা ও প্রশংসা দুই-ই পেলেন।

শিল্পী সমাজবিচ্যুত কোন জীব নন, মানব-সমাজ ও সমসাময়িক কালের সঙ্গে তাঁর যোগ প্রত্যক্ষ-নিবিড়। স্থাপত্যকলার ভাষায়-ভঙ্গীতে সাম্প্রতিকতার যে সুর সালিভানের কাজে নিম্নকণ্ঠ ছিল, রাইটের কাজে তা সোচ্চার হয়ে উঠল। এই যে সাম্প্রতিকতার সুর, যা রাইটের স্থাপত্যকৃতির মর্মবাণী, তাকে শুধু রাইটের স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা বা একটি ঋদ্ধিশালী প্রতিভার ফল বলে বর্ণনা করলে অযথেষ্ট হবে। যে সময় রাইট কাজে নেমেছিলেন, সে সময়টার কথাও ভাবা প্রয়োজন। আমেরিকার সামাজিক ইতিহাসের নজিরে জানা যায়, মার্কিন জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে এই সময় একটা গভীর

'ফলিং ওয়াটার' নামক নিসর্গ-আশ্রিত একটি বাড়ি।

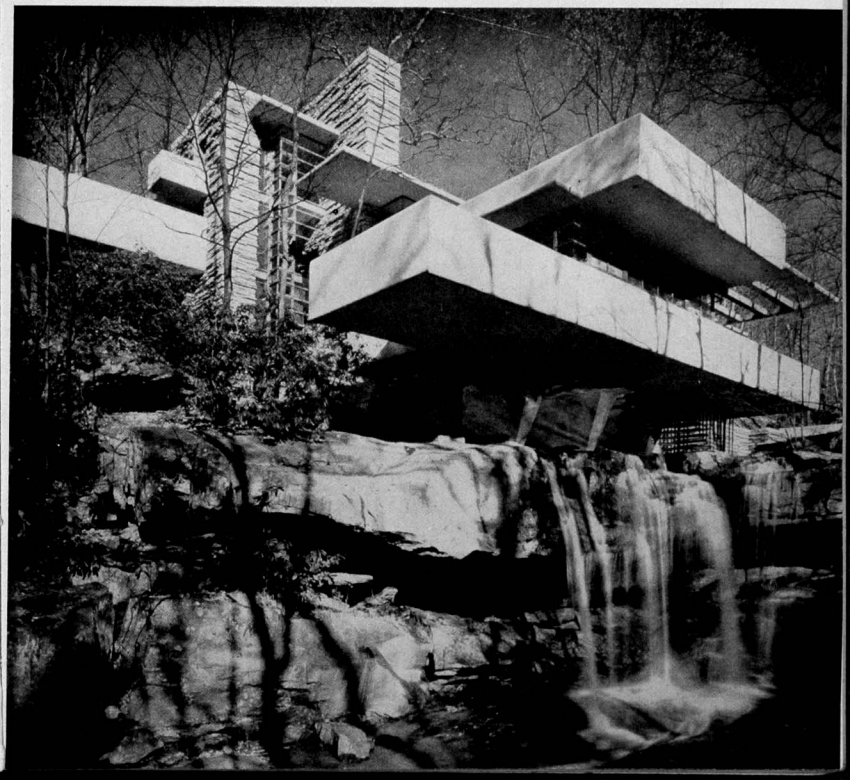

পরিবর্তন এসেছিল; অতঃপর মার্কিন পরিবারগুলি আগেকার মতো স্বনির্ভর রইল না; আগে যেমন এই স্বনির্ভর পরিবারগুলি নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য নিজেরাই উৎপাদন করত, নিজেদের বস্ত্র আসবাবপত্র তৈরি করত নিজেরাই, এমন কি থাকার বাড়িটাও নিজেরা তৈরি করত, এই সময়ে এবং এই সময় থেকে তারা অন্যোন্য-নির্ভর হয়ে উঠল। মার্কিন জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি ও পরিবার-প্রথার এই মৌলিক পরিবর্তন বা তার অন্যোন্য-নির্ভরতা, আমার মনে হয়, ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের স্থাপত্যরীতি—'অর্গানিক আর্কিটেকচার'[১] নামে যা অভিহিত—তার অন্যতম কারণ। যুগের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে শিল্প, বিশেষত স্থাপত্যশিল্পের মতো ব্যবহারিক শিল্প, জন্ম নেয়; ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের শিল্পীজীবনের প্রাথমিক পর্বে নতুন মার্কিন সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব তাই ক্রিয়াশীল না হয়ে পারে নি। রাইটের 'অর্গানিক আর্কিটেকচার' অভিহিত স্থাপত্য-কর্মের প্রত্যেকটি অংশের পারস্পরিক অন্যোন্য-নির্ভরতা, স্থান-কাল প্রতিবেশের সঙ্গে স্থাপত্য-কর্মের সুনিবিড় যোগ-সম্বন্ধ এউ প্রভাব-ফল হিসাবে পরিগণ্য।

রাইটের প্রথম দিককার কাজগুলির মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য 'কুন্‌লি হাউস', এটি ১৯০৭ সালে পরিকল্পিত ও ১৯০৮ সালে ইলিয়নসে রিভারসাইডে নির্মিত হয়। অনেক স্থাপত্য-সমালোচকের মতে, এটি বাস্তু-স্থাপত্যের একটি আশ্চর্য নিদর্শনরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। অক্ষিসুভগ, মনোজ্ঞ, তৃপ্তিদায়ক এই চমৎকার স্থাপত্যকর্মে শিল্প ও জীবন, শিল্পাঙ্গিক ও ব্যবহার্যতা এক অচ্ছেদ্যতায় সমন্বিত। ইতিমধ্যে পঞ্চাশটি শীত পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বাড়িটি এখনও নতুন ধরনের, নতুন জাতের বলে মনে হয়, বাড়িটির কোন অংশেই অপ্রচলিতত্বের ছাপ পড়েনি। ভালো সুন্দর ও দৃঢ়-

প্রকৃতির অঙ্কশায়ী রাইটের আর একটি বাড়ি। মেঘ-রৌদ্রের সমারোহ ও স্নিগ্ধ মধুর কুজছায়া বাড়িটিকে একটি শ্যামল লাবণ্যে মণ্ডিত করে রেখেছে। বাড়ির জমি ও প্রতিবেশের সঙ্গে বাড়ির সম্বন্ধ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এটি তার প্রমাণ।

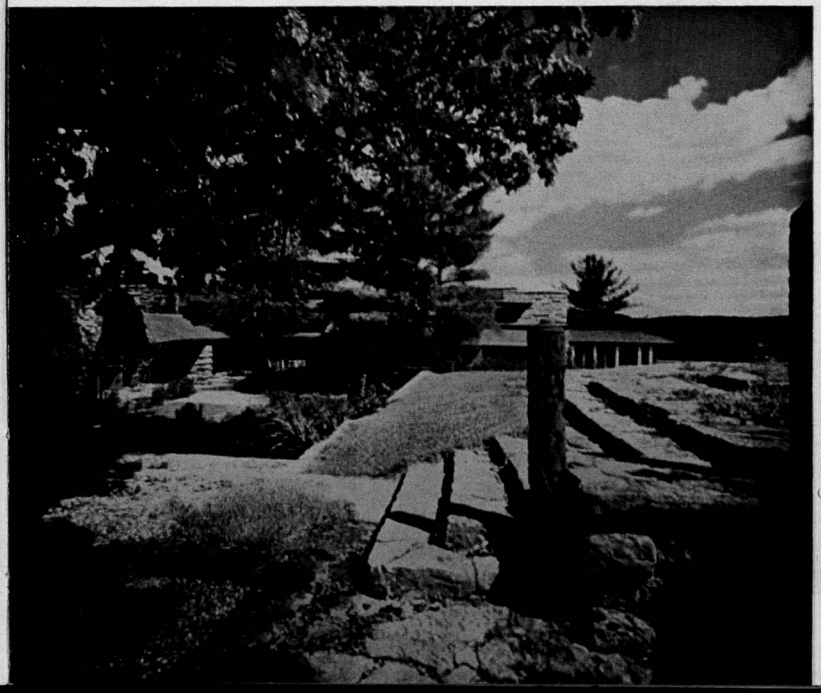

১ জীবজগতের চরিত্রধর্মে রাইটের স্থাপত্যকৃতির অধিষ্ঠান। তাই এই স্থাপত্যকলা 'অর্গানিক আর্কিটেকচার' নামে অভিহিত। বলা বাহুল্য, 'অর্গানিক আর্কিটেকচার' এই কথাটি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের নিজস্ব আবিষ্কার, বা বলা যেতে পারে, স্ব-নির্মিত। এর বাংলা প্রতিশব্দ প্রায় একরূপ অসম্ভব, হলেও রাইটের বক্তব্য বোধহয় তাতে অস্ফুট থাকবে। 'অর্গানিক আর্কিটেকচার'-এর সংজ্ঞাও সুকঠিন। এ সম্পর্কে জনৈক বিদেশী লেখকের মন্তব্য উদ্ধারণযোগ্য। তিনি বলেছেন:

If there is one phrase, one thing, which Mr. Wright would wish to burn forever into our minds, it would be *organic architecture*. To understand this phrase is to appreciate his work; to understand his work is to appreciate this phrase. He has tried to define it, and we fear, has failed, because defining it would be roughly equivalent to defining life, which, at the most, we can only describe.

অন্য একজন লেখক অর্গানিক আর্কিটেকচার এইভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন:

'In defining Wright's architecture as organic we mean especially two things: First, that his buildings are entities like living organisms and second, that they are functional in relation to mankind.'

The reality of architecture is not in its exterior forms, in its walls and rooms, but in the space enclosed, within which man walks and lives.

'অর্গানিক আর্কিটেকচার'-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অপর একজনের মন্তব্য:

'The organic movement is conscious of the inherent differences between robots and human beings. It recognizes that its man has a soul and a free will, the problem of architecture will be one of quality, not only of quantity, that people are not file cards to be housed in boxes and to define habitations as 'machines for living' is ridiculous, if not criminal.'

ভিত্তির বাড়ি বলতে মার্কিনীরা এখন যা বুঝে থাকেন, 'কুনলি হাউস'-এ ঠিক তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকের ভালো বাড়ির যা গুণ ও বৈশিষ্ট্য, উক্ত বাড়ির তা তো আছেই, বরং তা আরও বেশিরকমই আছে, যে কারণে মনে হয় আরও কয়েকটি দশক হয়তো 'কুনলি হাউস' দৃঢ়ভিত্তির ভালো সুন্দর বাড়ির নিদর্শন-রূপে পরিগণিত হতে পারবে। সাম্প্রতিক বাস্তু-স্থাপত্যের কাঙ্খনীয় গাঠনিক সৌন্দর্যের বৈভবে সমৃদ্ধ 'কুনলি হাউস' রাইটের স্থাপত্য-কুশলতার নিদর্শন স্বরূপ আজো বিশ্ববাসীর বিস্মিত প্রশংসা অর্জন করে।

এই রমণীয় বাড়িটি ছাড়া, বলা বাহুল্য রাইট অনেক বাড়ি তৈরি করেছেন, এবং এদের মধ্যে একাধিক বাড়িই রাইটের নব নব উন্মেষশালিনী ক্ষমতা ও কল্পনা-শক্তির অভিনবত্বের পরিচয় বহন করে। এই ধরনের একাধিক প্রশংসার্হ স্থাপত্যকর্মের মধ্যে 'গুগেনহাইম মিউজিয়াম,' উইসকনসিন ও আরিজোনার মরু-অঞ্চলে যথাক্রমে তাঁর গ্রীষ্ম ও শীতাবাস (যথাক্রমে ট্যালিজান ও ট্যালিজান ওয়েস্ট নামে পরিচিত) এডগার কাউফ-ম্যানের বসতবাড়ি, প্রেইরী অঞ্চলের একাধিক বাড়ি, ওক পার্কের 'ইউনিটি টেম্পল', লস এঞ্জেলসে অবস্থিত 'হলিহক হাউস', বেসিনের জনসন কোম্পানীর বাড়ি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সেদিন ৮৪ বছর বয়সে ছেলে ডেভিড রাইটের জন্য আরিজোনার মরু-অঞ্চলে মৃত্তিকা-বিশ্লিষ্ট এক আশ্চর্য নতুন ধরনের যে বসতবাড়ি নির্মাণ করেছেন, তা তাঁর স্থাপত্য-প্রতিভার অনিঃশেষ সজীবতার মুগ্ধকর প্রমাণ।

উপরি-উল্লিখিত বাড়িগুলির সবই আমেরিকায়। আমেরিকার বাইরেও তিনি কিছু বাড়ি তৈরি করেছেন। এর মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত টোকিয়োর ইম্পিরিয়াল হোটেল; ১৯২২ সালে এটির নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়। আরো যে একটি কারণে এই বাড়ি বিখ্যাত তা হল ১৯২৩ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে অবিধ্বস্ত অঙ্গুলিগণ্য বড় বাড়িগুলির এটি অন্যতম।[২] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট জাপানী স্থাপত্যরীতি থেকে কিছু-কিঞ্চিৎ প্রেরণা পেয়েছেন।

এই সব স্থাপত্যকর্মের সবিস্তার বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু এই কর্মকৃতিসমূহ ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের নিজস্ব স্থাপত্যরীতি এবং তাঁর জীবনদর্শনের নির্ভরযোগ্য দর্পণ। কি কি নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতির উপর রাইট তাঁর স্থাপত্যকৃতিগুলিকে গড়ে তুলেছেন, এ বাড়িগুলির প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কিত মন্তব্য ও মতামতগুলি জানা প্রয়োজন। স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে রাইটের প্রাথমিক ও প্রধান, বলা যেতে পারে মৌল নীতি হল, জায়গা বা স্পেস সংক্রান্ত। তিনি বলেন, বাড়ির বাইরেটা দেয়াল ছাদ ইত্যাদি নয়, বাড়ির ভিতরটাই আসল; মানুষ যে জায়গাতে ঘোরা-ফেরা করে থাকে, সীমাবদ্ধ সেই জায়গা বা স্পেসটাই হল স্থাপত্যকলার মূল কথা। উপমার আশ্রয় নিয়ে তিনি আরো বলেছেন, কবিতার মতো স্থাপত্যকলারও মর্মবাণী হল 'ভিতরের' (উইদিন) কথা; এই 'ভিতর' টাকে বলা যেতে পারে প্রাণ বা হৃদয়।[৩] অর্থাৎ বাড়ির বাইরেটাকে চকচকে, জৌলুষময়, অলংকারবহুল ও রমণীয় করে তোলার পক্ষপাতী তিনি নন; বাড়ির যে-জায়গায় লোকজন ঘোরা-ফেরা করে, খায়-দায়, ঘুমোয়, সেই জায়গাটিকে সর্ববিধ সৌকর্য-সৌন্দর্য ও বাসযোগ্যতায় তৃপ্তিকর করে তোলাই তাঁর স্থপতিজীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। স্থাপত্যকলা-সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় নীতি হল, বাড়ি তৈরির জায়গার নির্বাচন প্রাসঙ্গিক। জায়গা নির্বাচনে ভুল-ত্রুটি থাকলে বাড়ি কখনোই ত্রুটিহীন হতে পারে না, যত অর্থই সে বাড়ির জন্য ব্যয় করা হোক না কেন; তাঁর ঋজু স্পষ্ট ভাষায়, 'the character of the site is the beginning of architecture'।[৪] বস্তুত, কোন

আকাশ-প্রাসাদ বা 'কাস্‌ল্‌ ইন্‌ দি এয়ার'। প্রাসাদটি এমনভাবে নির্মিত যে মনে হবে সমস্ত প্রাসাদটিই মৃত্তিকা-বিশ্লিষ্ট হোয়ে হাওয়ার সাগরে ভাসছে।

২ . . . his Imperial Hotel at Tokyo (completed 1922), which had flow slabs balanced over central supports to minimize the effect of earthquake shocks, proved a structural triumph as it was one of the few large buildings in Tokyo to survive the great earthquake of 1923.

৩ Like poetry a sense of architecture is the sound of the 'within'. We might call that 'within' the heart. Architecture now becomes integral, the expression of a new-old reality: the livable interior space of the room itself. The room must be seen as architecture, or we have no architecture. We have no longer an outside as outside. Now the outside may come inside, and the inside may and does go outside. They are of each other.

৪ 'First a good site; pick one at the most difficult spot—pick a site no one wants—but pick one that has features making for character: trees, individuality, a fault of some kind in the realtor's mind.

'That now means getting out of the city.

'Then standing on the site, look about you so that you see what has charm, what is the reason you want to build there? Find out! Then build your house so that you may still look from where you stood upon all that charmed you, and lose nothing of what you saw before the house was built, but see more. Architectural association accentuates the character of the landscape, if the architecture is right.'

লয়েড রচিত স্থাপত্যের পটভূমি॥

লয়েডের একটি আভ্যন্তরীণ সজ্জা॥

লয়েড-স্থাপত্যের বহির্ভাগ॥

টমটমে সস্ত্রীক রাইট।

উদ্যানে রাইট দম্পতি।

বাড়ির সৌন্দর্য ঐ বাড়ির জমিনের প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত নয়, জমিনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর বাড়ির পরিকল্পনা ও গঠনভঙ্গী নির্ভরশীল; আর এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে জমিনের প্রকৃতির সঙ্গে বাড়ির প্রকৃতি এবং বাড়ির প্রকৃতির সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ-চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং বাড়ি করার আগে জমিন বাছাই নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। রাইটের তৃতীয় নীতিতে, স্থাপত্যকর্ম নিসর্গমুখী বা নিসর্গ-আশ্রয়ী হওয়া উচিত; মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগের কথা মনে রেখে বাড়ি তৈরি করা উচিত। এ বাড়ি কেমনভাবে তৈরি হবে? রাইট বলেন, যে জমিনের উপর বাড়ি তৈরি হবে সে-জমিনের মূল প্রকৃতি পরিবর্তন করা চলবে না, এবং সে বাড়িকে অবশ্যই জমিন এবং পরিপার্শ্বের সঙ্গে সেখানকার গাছপালা উপলখণ্ড ইত্যাদির মতোই স্বাভাবিকভাবে ও সুন্দরভাবে যথাযোগ্য সামঞ্জস্যে বিধৃত হতে হবে। অর্থাৎ জমিন এবং বাড়ির প্রীতিকর পরিণয়ে স্থপতির ভূমিকা হল প্রদক্ষ ঘটকের। এই নীতির বাস্তব রূপায়ণ রাইটের প্রায় সব ক'টা বাড়িতেই পরিলক্ষ্য এবং এইজন্যে বোধহয় রাইটকে 'ল্যাণ্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট' অভিধায় নন্দিত করা হয়। শেষত কিন্তু সর্বশেষ নয়, যে সকল উপাদান-উপকরণে বাড়ি তৈরি হবে, সেগুলি বাড়ির চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও প্রতিবেশ অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন; শুষ্ক খর অঞ্চলের বাড়ির উপাদান-উপকরণ কখনো শ্যামল-স্নিগ্ধ অঞ্চলের বাড়িতে ব্যবহৃত হতে পারে না; ইট-পাথর-কংক্রীটের রং চেহারা আকার প্রকার বাড়ির উপযোগী না হলে বাড়ির সৌন্দর্য তো খোলেই না, পরন্তু তার সবটাই বিসদৃশ-কুশ্রী ঠেকে। রাইট বলেন, ইট-পাথর-কংক্রীটের ভাষা আছে, তারা বাঙময় হতে জানে, গীতিমুখর হতে পারে, বাড়ি তৈরির সময় তাদের ভাষাকে তাদের গীতিময় অস্তিত্বকে যেন চেপে না মারা হয়। এইসব নিয়ম-নীতি ছাড়া বাড়ির আভ্যন্তরীণ অলংকরণ-সজ্জা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যাপারেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন; তাঁর মতে, বাড়ির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের উপর আভ্যন্তরীণ অলংকরণ-সজ্জা, আসবাবপত্রের আকার-প্রকার নির্ভরশীল।

উপরি-উক্ত নিয়ম-নীতির উপর ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের 'অর্গানিক আর্কিটেকচার' গড়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম দিককার তৈরি 'কুনলি হাউস' বা শেষ দিককার তৈরি আরিজোনার মরু অঞ্চলস্থ ডেভিড রাইটের বসতবাড়ি, যে কোন বাড়িই উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক না কেন, তাতে এই নিয়ম নীতিগুলির সনিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষ করার মতো। এই নিয়ম নীতির বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরকার। বসতবাড়ি, শুধু বসতবাড়ি কেন যে কোন বাড়িরই মূল কথা হল, আলো এবং হাওয়া। আলো-হাওয়া পর্যাপ্ত না হলে বাড়ির বাসিন্দাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কখনো ভালো থাকতে পারে না। এইজন্য রাইট তাঁর প্রত্যেক বাড়িতেই প্রচুর সংখ্যক জানালা স্থাপন করেন; তাঁর বাড়িতে এই জানালাগুলি সাধারণত ভার্টিক্যালভাবে না হয়ে হরাইজন্টালভাবে স্থাপিত হয়। 'কুনলি হাউস' থেকে শুরু করে ডেভিড রাইটের বাড়ি—রাইটের প্রায় সব বাড়িতেই জানালার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়; এই জানালার প্রাচুর্যের জন্য স্বভাবতঃই আলো-হাওয়ার কোন অভাব তাঁর তৈরি বাড়িতে হয় না। দ্বিতীয়ত, রাইটের বেশির ভাগ বাড়িতেই কামরাগুলি কখনো বাক্স-সদৃশ হয় না; বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার ধরনের কামরাতে তিনি বাড়ির ভিতরের জায়গাকে বাক্সের ছকে সীমাবদ্ধ

রাইট-দম্পতির শীতাবাস।

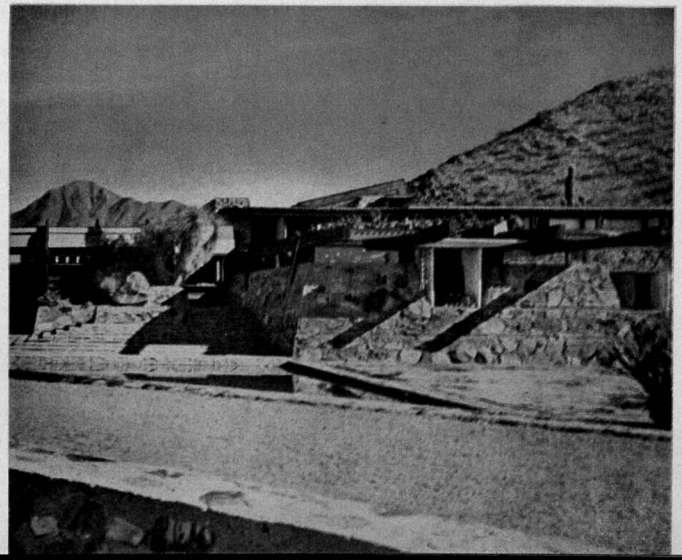

রাইটের আর একটি বাড়ি।

না রেখে প্রশস্ত করেন, যাতে বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি জায়গাই বাসিন্দাদের কাজে আসে; বলা বাহুল্য, বাড়ির ভিতরকার জায়গার প্রশস্ততা বাড়ির বাসিন্দাদের মনের উপরও সুস্থ প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয়ত, অলংকরণের খাতিরে তিনি কখনো কোন বাড়িকে অলংকৃত করেন না; গৃহের কায়া, অর্থাৎ বাড়ির ভিতরের জায়গার সঙ্গে, যতক্ষণ না অলংকরণ সমঞ্জসভাবে যুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ সেই অলংকরণ ভাস্কর্যের নিদর্শন বা স্থপতির কল্পনাশক্তির নিছক বহিঃপ্রকাশের চিহ্নমাত্র; স্থাপত্যের ভাষায় যাকে বাড়ির ভিতরকার জায়গা বলে, তার সঙ্গে সম্বন্ধবিযুক্ত হয়ে পড়ে, এবং শিল্পসমালোচক মাত্রেই জানেন, স্থাপত্যশিল্পের বিচারে এ-হেন অলংকরণ নিরর্থক বাহুল্য মাত্র, যা নিঃসন্দেহে দোষাবহ। এ তত্ত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন বলে রাইটের স্থাপত্যকর্মে অকারণ অলংকরণ কখনো চোখে পড়ে না। চতুর্থত, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিকট-নিবিড় বলে রাইট সব সময়েই জমিনের ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ি তৈরি তো করেনই, পরন্তু নানারূপ গুল্ম-লতা-পাতায় তাকে সজ্জিত করতে প্রয়াস পান; অনেক ক্ষেত্রে তিনি হ্রদ, ঝর্ণা, পুকুর ইত্যাদির আশেপাশে এবং সবুজের সমারোহের মধ্যেই তাঁর বাড়িটিকে সংস্থাপিত করেন। এডগার কাউফম্যানের নিসর্গ-আশ্রিত বাড়ি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রকৃতি বলতে শুধু সবুজের সমারোহ-ই বোঝায় না, তার রুক্ষ ধূসর রূপও বোঝায়; সুতরাং আরিজোনার মরু অঞ্চলও রাইটের

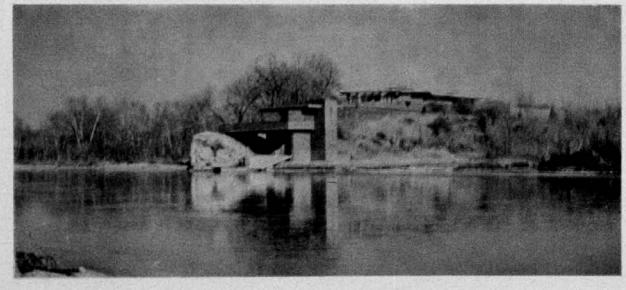

নদীতীরবর্তী একটি বাড়ি।

কাছে সমান আকর্ষণীয় এবং ছেলে ডেভিড রাইটের বাড়ি তিনি প্রকৃতির অন্যতর রূপের মধ্যে যে আশ্চর্য দক্ষতায় সংস্থাপিত করেছেন, তা তাঁর মৌলিক সৃষ্টি-ক্ষমতাই প্রমাণ করে। অবশ্য এ বাড়িতে প্রকৃতির রুক্ষ রূপই যে শুধু পরিদৃষ্ট হয় তা নয়, প্রকৃতির শ্যামল রূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ এর একদিকে গাছপালা গুল্ম লতা ইত্যাদি বিদ্যমান। মোট কথা, বাড়ির জমিনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে রাইট সর্বদা নিবদ্ধ-দৃষ্টি এবং প্রকৃতিকে আত্মীয় জ্ঞান করেন বলে প্রকৃতির কোলেই তিনি তাঁর শিল্পকর্মের সংস্থাপনায় অভিনিবিষ্ট হন। তাঁর এই প্রকৃতিমুখিনতা বা প্রকৃতিমগ্নতা, বলা বাহুল্য, আকাশস্পর্শী 'স্কাইস্ক্রেপারের' আমেরিকায় একটি ব্যতিক্রম-প্রোজ্জ্বল ঘটনা-বিশেষ।

রাইটের প্রকৃতিমগ্নতার কথা বলতে গিয়ে আজকের পৃথিবীর আরেকজন প্রখ্যাত স্থপতির কথা মনে পড়ল যিনি আদর্শগতভাবে রাইটের বিপরীত মেরুতে বাস করেন। এই স্থপতি হলেন ফ্রান্সের লে কোর্বুসিয়ের। লে কোর্বুসিয়ের প্রকৃতি-বিমুখ, প্রকৃতিকে পরিহার করে চলেন। তাঁর বাড়িগুলি সাধারণত সরাসরি মাটি থেকে ওঠে না, মাটির উপর কয়েকটি স্তম্ভ স্থাপন করে তাদের উপর তিনি বাড়ি তৈরি করেন, হাওয়ায় ভাসমান তরণীর তুল্য তাঁর বাড়িগুলি দেখলেই তাঁর প্রকৃতিবিমুখ মেজাজটি ধরা পড়ে; অন্যপক্ষে রাইটের বাড়িগুলি সরাসরি মাটি থেকেই

গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনায় রত ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট।

ওঠে, যেন তারা মাটির সঙ্গে একাত্ম, পৃথিবী-মায়ের সন্তান। ডেভিড রাইটের স্তম্ভের উপর স্থাপিত বাড়ি অবশ্য ব্যতিক্রম বিশেষ ; সে ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধার জন্য অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে ; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সমস্ত বাড়িটি প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মূলত এমনভাবে বিজড়িত যে রাইটের প্রকৃতিমুখী মেজাজ তাতে ধরা কষ্টসাধ্য নয়। রাইট এবং কোর্বুসিয়ের-এর এই মেজাজের তফাতটি জে, এম, রিচার্ডস সুন্দরভাবে বলেছেন ; তাঁর মন্তব্যে : 'Wright builds consciously in sympathy with nature ; Le Corbusier in defiance of it. (An Introduction to Modern Architecture, Penguin : J. M. Richards ; P. 84.)

সার কথা, ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট মনে-প্রাণে প্রকৃতিকে ভালোবাসেন; আর সে জন্যই তিনি বাসিন্দাদের শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও মনের মুক্তির কথা স্মরণে রেখে, বাড়ি তৈরি করেন। যেমন ধরা যায় আমেরিকায় ; আমেরিকায় কেন পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় বোধ হয়, আগে গৃহিণীদের কষ্টের অবধি ছিল না; গৃহস্থালী বলতে তখন বোঝাত, উনুনের আঁচ, দিনের গরম, ধোঁয়া, চলাফেরার কষ্ট। রাইট বাড়ির ভিতরের দিকে, ভিতরের মানুষগুলির দিকে নজর দিয়ে স্থাপত্যশিল্পে বিপ্লব ঘটালেন। স্থাপত্যকর্ম যে শুধু বিজ্ঞান নয়, শিল্পও তা প্রমাণ করলেন একাধিক মনোরম বসত-বাড়ির মাধ্যমে ; যে ইঁট-কাঠ-পাথর ও কংক্রীটে বাড়ি তৈরি হয়, তাদের যে ভাষা আছে, তারা যে গান গাইতে জানে, সেই ভাষা সেই গানের সুর শুনে তাদের ঠিক জায়গায় ঠিক কাজে লাগাতে হয়, এ তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন ; বাড়ি তৈরি করার আগে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের গুরুত্ব আবিষ্কার করেছেন ;

পিয়ানো-বাদনরত রাইট।

আজকের অত্যধিক যান্ত্রিকতার যুগে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ পুনর্জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাস্তুবিজ্ঞানকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করছেন এবং সর্বোপরি বাড়ির বাইরেটার চেয়ে ভিতরটা যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এ চরম মূল্যবান তত্ত্বের ভিত্তিতে শিল্পের সঙ্গে ব্যবহার্যতার সার্থকতম উদ্বাহ-বন্ধন ঘটিয়েছেন। সব মিলিয়ে তাঁর স্থাপত্যকর্ম বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে কবিতা—একটি নিটোল গীতিকবিতা—হয়ে উঠে ; এইখানে তাঁর শিল্পী-পুরুষের পরমতম সিদ্ধি। শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যে শুধু বিজ্ঞানধর্ম নয়, কাব্যগুণও

সমুদ্র-দিগন্তের সন্ধিস্থলে রাইট-শিল্প।

অনেকখানি, মারিতাঁর একটি উক্তিতে সে কথা শোনা যায় :

> In every great work of architecture the virtue of poetry is so powerful that the functional destination is absorbed, so to speak, in the self-subsistence and self-necessity of a man-made cosmos; all that which is directed from the very start—to practical use and the service of human needs, appears only as a result and flowering of the inner requirements of such a self-subsistent cosmos.*

এই উক্তির পশ্চাৎপটে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট যন্ত্রযুগের মহত্তম কবি-স্থপতি।

* Creative Intuition in Art and Poetry: J. Maritain; p. 264.

ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট।

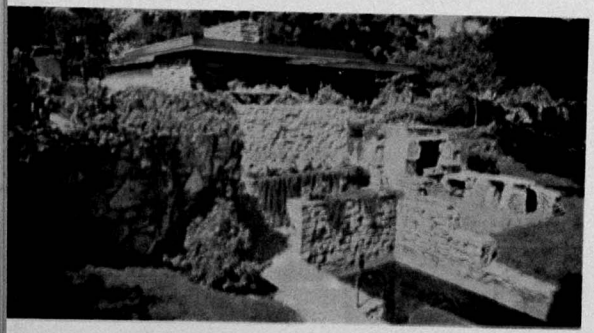

নিসর্গ-আশ্রিত
বসতবাড়ি।

ঘূর্ণায়মান রঙগুলো
ধোঁয়া-ধুলো
আরও কত কি
তারই মধ্যে
তোমার আবির্ভাব।

রকেটের থেকে নেমে এলে
সিংহবাহিনী নও
রকেটবাহিনী তুমি।

বাহন বদলেছে,
চেহারা বদলেছে,
অণুর দাপট
আর
স্পুটনিকের পাখ্সাট...

আমরা শিল্পী
সর্বসহা—
তুবড়ে-যাওয়া তোমার মূর্তি,
তাই গ্রহণ করেছি।

হে শারদ-শ্রী!
শ্রী আর বিশ্রী
একালে
একাত্ম একাকার।

—প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে—

ছবি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মিতভাষণের মাধুর্যে ও ব্যঞ্জনার গভীরতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিটি রচনাই চিন্তাশীল পাঠককে মুগ্ধ করে। মহৎ সাহিত্যিকের এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য লেখকদের অন্যতম। 'আকাদেমি' ও 'রবীন্দ্র' পুরস্কারে নন্দিত হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র এই সব পুরস্কারের ঊর্ধ্বে চিরকালীন সাহিত্যের একনিষ্ঠ পূজারী হিসাবেই সম্মান-স্বীকৃত।

অম্বুজানাথের গল্প শুনতে হয় টুকু সেনের কাছে।

রসিয়ে রসিয়ে এত মজার কথা সে বলতে পারে। অম্বুজানাথকে নিয়ে সে রীতিমত একটা উনবিংশতিতম-পুরাণ খাড়া করে তুলেছে। মাঝে মাঝে সে শাসায় যে পুরাণটা সে শ্রুতির রাজ্যে ফেলে না রেখে একেবারে পুঁথি করে ফেলবে। আর শেষে লিখবে–

অম্বুজানাথের কথা শ্যাম্পেন সমান
টুকু সেন ঢালে ঢলে যত অনড়ান

লেখবার সাহস অবশ্য তার নেই। লেখবার কেন বলবার সাহসও লোক বুঝে সে দেখায়। কথাগুলো অম্বুজানাথের কানে গেলে ত একটু মুস্কিল আছে কিনা। টুকু সেনের কামধেনুই যে তাহলে বিগড়ে যেতে পারে।

টুকু সেন কেন, দায়ে অদায়ে অম্বুজানাথের পকেটে হাত গলায় নি এমন মিঞা খুব কমই আছে রং তুলির রাজ্যে। কাগজের ওপর দৈবাৎ ভুলে রঙের বাটি যে কখনো উল্টেছে সেও অম্বুজানাথের কাছে অনায়াসে গিয়ে হাত পাততে পারে। অম্বুজানাথের বিদঘুটে প্রাসাদের দরজা যেমন সারাদিন খোলা, তেমনি তাঁর তহবিলের থলি। শিল্পীদের সাহায্য করতে করতেই, না ফতুর তিনি নন, তবে তাদের কারুর কারুর কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছেন বটে।

সবাই এমন অকৃতজ্ঞ অবশ্য নয়। অম্বুজানাথের বাড়ি তৈরীর নামে ওই বিদঘুটে চক্ষুশূলের যে পরিকল্পনা করে দিয়েছিল সেই সুবীর বর্ধনও না।

সুবীর বর্ধনের তবু অম্বুজানাথের ওপর আক্রোশ থাকবার কারণ আছে বলে শোনা যায়।

অম্বুজানাথের কাছে সেই একমাত্র নাকি প্রাপ্য টাকা পায়নি বলে কেউ কেউ রটিয়ে আনন্দ পায়।

রটনার মূলে সুবীর নিজে কোনদিন ছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু অম্বুজানাথের কোন প্রসঙ্গ হলে সে হয় চুপ করে থাকে নয় সরে যায়।

অম্বুজানাথকে যারা উপহাস করে না, তারাও কিন্তু টুকু সেনের মজলিশে তার চুটকি গল্প উপভোগ করে যায় মাঝে মাঝে।

অম্বুজানাথের প্রাসাদের দরজা যেমন খোলা, টুকু সেনের দোকানের দরজা তেমনই বন্ধ না হোলেও ভেজানোই থাকে।

সেটা যে দোকান তাও বাইরের কারুর জানবার উপায় নেই। নতুন অল্পবয়সী শিল্পীরা প্রথম কারুর সঙ্গে সে আধ ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পারলে ধন্য হয়। ছোট খাটো হল ঘরটার এধারে ওধারে এলোমেলোভাবে ছড়ানো একটা মোড়া কি কাঠের টুলে বসতে পারলে ত কৃতার্থ, আর টুকু সেনের একটু প্রসন্ন দৃষ্টি পেলে বা একটা কথা শুনলে ত' মুগ্ধ অভিভূত।

তা টুকু সেনকে প্রথম দেখলে চমৎকৃত হবারই কথা। সৌম্য শান্ত চেহারা। আলখাল্লা গোছের একটা পোষাকে যেন উদাসী বাউল ফকির কেউ ভুল করে এসে চৌরঙ্গী অঞ্চলের এই ছবির সরঞ্জাম ছড়ানো ঘরে আটকে পড়েছে মনে হয়। চোখে একটা সুদূর স্বপ্নময় দৃষ্টি। সে দৃষ্টি প্রসন্নভাবে যখন তরুণ কোন শিল্পীর ওপর নিবদ্ধ হয়, তখন মনে হয় শিল্পী জীবনের সব কিছু সাধ পূর্ণ হবার আশীর্ব্বাদ যেন তার ভেতর দিয়ে ঝরে পড়ছে।

এ দৃষ্টি ও এ চেহারা কিন্তু ওই সব নতুন পালক গজানো শিল্পী শাবকদের জন্যেই বরাদ্দ, যারা জানে টুকু সেনের একটু ইঙ্গিত পেলে শুধু এদেশে নয় সাগর পারের সমঝদার মহলও সজাগ হয়ে ওঠে, যাদের বিশ্বাস প্রকাশ্যে নাম না থাকলেও ছবির রাজ্যের বড় বড় সব মেলার চাঁইরা টুকু সেনের পরামর্শ না নিয়ে কিছু করে না। টুকু সেনের ষ্টুডিও বা আস্তানায় তাই উঠতি আঁকিয়েরা ধন্য হতে আসে, ছবির সরঞ্জামও যে সেখান থেকে দুনো দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায় সেটা তাদের প্রণামী।

টুকু সেনের ত রঙ তুলি কাগজ বেচা ব্যবসা নয়, তবে ভালো জিনিষ সবাই চেনেনা আর চিনলেও পায়না বলে নেহাৎ ছেলে ছোকরাদের অনুগ্রহ করবার জন্যে কিছু কিছু সে মজুত রাখে।

টুকু সেনের সৌখীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাত্রার খরচা অবশ্য তাতে কতটুকু আর ওঠে। তার জন্যে অম্বুজানাথ আছেন।

টুকু সেনের মত শিল্পীদের হাত থেকে কবে কি মহৎ

চোখে একটা সুদূরে স্বপ্নময় দৃষ্টি।

সৃষ্টি বেরিয়ে যাবে কে জানে! তাদের বহাল তবিয়তে রাখা তাঁর একটা দায়িত্ব।

টুকু সেনের ওস্তাদের মারের জন্যে ছবির জগৎ অপেক্ষা করছে। গত সাত বছরই যখন অপেক্ষা করতে পেরেছে তখন আরও বছর পাঁচেক বাদে যুগান্তরের সুরুটা দেখতে ক্ষতি কি!

টুকু সেনের ছবি না দেখা যাক্ তার রসাল কেচ্ছা গেলেই শুনতে পাওয়া যায়। শুনতে পায় অবশ্য বাছাই বাছাই কয়েকজন মাত্র। টুকু সেনের এটা আরেক চেহারা। আশীর্ব্বাদ প্রার্থী তরুণ শিল্পীরা ওই সৌম্যশান্ত মুখে সে চেহারা কল্পনাই করতে পারেনা। গল্প তার বেশীর ভাগ অম্বুজানাথকে নিয়ে। অম্বুজানাথকে না হ'লে যেন তার জিভ্ একটু ভোঁতা হয়ে থাকে।

তা অম্বুজানাথ অন্য সব দিকে যাই হন, রসালো গল্পের খোরাক যে তাঁর মধ্যে আছে এটা অস্বীকার করা শক্ত।

অর্থে প্রতিপত্তিতে বংশমর্যাদায় বাংলা দেশে তাঁর তুলনা মেলা ভার কিন্তু তবু তাঁকে দেখলেই কেমন মনে হয় আর কারুর ভূমিকায় তাঁকে যেন জোর করে সাজিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর চাল চলন কথাবার্ত্তা ব্যবহার সব কিছুতেই কি একটা যেন নকল অভিনয়ের আভাস থাকে যা থেকে কৌতুকরসের উপাদান খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

টুকু সেনের নজর খুব সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। সেই সব উপাদানই সে খুঁজে বার করে নির্ভুলভাবে, আর তা কাজে লাগায় অদ্ভুত মুনসিয়ানার সঙ্গে।

অম্বুজানাথ বড় বড় বহু কোম্পানীর ডিরেক্টর। তাঁকে নিজের চেষ্টায় এসব কোম্পানী গড়ে তুলতে হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন। ডিরেক্টরদের বোর্ড মিটিং-এ অম্বুজানাথ কি করেন, টুকু সেনের মুখে তার বর্ণনা শুনে হাসি চেপে রাখা শক্ত।

অম্বুজানাথ মিটিং-এ গিয়ে নাকি রামরূপ জগনলালের কাছে 'চুরণ' খেতে চান পেট ফাঁপার গল্প করে। ত্রিবেদী সাহেবের সঙ্গে একবার বিলেত ঘুরে আসার বাসনা নিয়ে আলাপ করে সেখানে দেশী ধরনের বাথরুম পাওয়া সম্ভব কিনা প্রশ্ন করেন, পরম বৈষ্ণব হরিসুন্দর চক্রবর্তীকে শুধু কচিপাঁঠাল প্রতিলোভটা না ছাড়তে পারার দরুণ কেন যে তিনি পুরোপুরি বৈষ্ণব হতে পারছেন না সেই দুঃখ জানান। আর ভোটের ব্যাপার কিছু হলে নির্বিচারে বেশীরভাগ সবাই যেদিকে তার ঠিক উলটো দিকে হাত তোলেন।

আর পার্টি টার্টিতে খেতে বসে তাঁর কাণ্ডকারখানা আরো অদ্ভুত। সাহেব সুবো, বিশেষ করে এদেশী অথচ পাক্কা সাহেব পার্টিতে থাকলে তিনি যেন ঘাবড়ে গিয়ে আরো কেলেঙ্কারী করে বসেন। না, ছুরি কাঁটা উলটো ধরেন না, বা প্লেট থেকে খাবার ছিট্‌কে কারুর গায়ে ফেলেন না, কিন্তু প্লেটের ওপর ছুরি কাঁটার আওয়াজে আশপাশের সবাইকে সচকিত সন্ত্রস্ত করে তোলেন আর ন্যাপকিনটা যে একটা অবাঞ্ছিত উপদ্রব তা নানাভাবে বুঝিয়ে দেন, একবার গলায় একবার কোলে রাখবার চেষ্টা করে ও মেঝেতে ফেলে। সাহেব সুবোরা'ত বটেই, অন্য সবাইও মনে মনে যাই ভাবুক, প্রায় গোটা টেবিল শুদ্ধ সকলকে যিনি এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচবার ক্ষমতা রাখেন সেই বীরনগরের অম্বুজানাথ দত্তিদারকে মুখের ভাবেও কেউ কিছু জানায় এমন সাধ্য কি! অম্বুজানাথের আবার এক বিশ্রী স্বভাব—ভুল কিছু করলে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসা। যার প্রতি সেই হাসি যখন বর্ষিত হয় জবাবে একটু আহাম্মকের মত না হেসে তার উপায় নেই। আড়ালে তারা অবশ্য এ শাস্তির শোধ নেয় প্রাণ খুলে অম্বুজানাথের এইসব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করে'। 'বীরনগরের কুমড়ো' সেখানে তাঁর ডাক নাম। কথাটা বোধহয় অকাল কুষ্মাণ্ড থেকেই এসেছে। অম্বুজানাথ যে বীরনগরের দত্তিদার বংশের কলঙ্ক আর নিজের কোন কৃতিত্বে নয় নেহাৎ পৈতৃক উত্তরাধিকারের জোরে সোনার সিংহাসনে সঙ্ হয়ে বসে আছেন এই কথাটাই সালঙ্কারে ঈর্ষ্যামিশ্রিত কৌতুকে তাদের মধ্যে আলোচিত হয়। এটুকু অবশ্য সবাই স্বীকার করে যে ব্যাপারটা তবু মন্দের ভালো। অমন একটা সঙ্ না হয়ে অম্বুজানাথ বড় বংশের ঐশ্বর্যের জোরে শয়তানও ত হতে পারতেন! তা যে হ'ন নি এবং দশ বছর আগে বিপত্নীক হয়ে আজও সব সুযোগ থাকতে কোন প্রকার বদখেয়াল যে তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি এটা আশ্চর্য ব্যাপারই বলতে হবে। শিল্পীদের সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর উদারতা অবশ্য তাঁর আহাম্মকির আর একটা প্রমাণ বলেই ধরা হয় এবং পেটে সত্যিকার বিদ্যে কিছু থাক না থাক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপগুলো যে অপাত্রের গায়েই পড়েছে এ বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই দেখা যায়।

টুকু সেন এসব কথা এত জানল কি করে এ প্রশ্ন তার বাছাই করা শ্রোতারা অবশ্য করে না। শিল্পের জন্যে জীবন উৎসর্গ করবার আগে টুকু সেন যে অম্বুজানাথেরই প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল পাঁচবছর ধরে, আর তার প্রতিভায় অম্বুজানাথকেই যে প্রথম মোহিত করে সে এই শিল্পী জীবনই সার করবার সুযোগ পেয়েছে একথা আর কেউ না জানুক, তারা জানে।

কিন্তু এই টুকু সেনকেই সুবীর বর্ধন একদিন চড় মেরে দিল তারই ষ্টুডিওতে বসে।

সেদিন আড্ডাটা ভালো জমেছিল, মৌতাতের মাত্রাটা একটু বেশী হওয়ায় টুকু সেনের জিভ্‌টা আর একটু ধারালো হয়ে উঠেছিল আর অম্বুজানাথের নিজের সংগ্রহের একটি বিশেষ ছবির গল্প সে একটু বেশী রসিয়ে বলেছিল।

এ গল্প তার নতুন নয়। আগেও অনেকে এ গল্প তার শুনেছে। কিন্তু সুবীর বর্ধন বোধহয় তার মধ্যে ছিল না।

গল্প এমন কিছু নয়, টুকু সেনের বলার কেরামতিতেই তার দাম।

অম্বুজানাথের স্ত্রী তখন বেঁচে। অম্বুজানাথ তাঁর একটা পোর্ট্রেট আঁকতে দিয়েছিলেন তখনকার এক তরুণ

ছুরি কাঁটার আওয়াজে আশপাশের সবাইকে সচকিত সশস্ত্র করে তোলেন।

শিল্পীকে যার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার দীপ্তি তিনিই শুধু আবিষ্কার করেছিলেন।

গল্প বলতে বলতে টুকু সেন আর সকলের দিকে যেমন, তেমনি একবার সুবীর বর্ধনের দিকেও তাকিয়েছিল। তার গল্প বলার এও এক কৌশল। বাছাই করা যে জনকয়েককে সে তার রসের কথা শোনায় তাদের প্রত্যেকের উপভোগটুকুর ক্ষমতাও সে যেন মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচাই করে নেয়।

সুবীর বর্ধন তখন নিজের পাত্রটি নিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে।

সুবীরের ধরনটাই অবশ্য ওই রকম। কোন কিছুতেই যেন তার গা নেই। সব সময়েই যেন আধ ঘুমের ঘোরে অন্য কিছু ভাবছে। যেখানে বসে আছে সেইখানটাতেই ঠিক নেই।

টুকু সেনের আড্ডাতেও তাকে খুব কমই দেখা যায়। আজ হঠাৎ কেমন এসে পড়ে আটকে গেছে, মৌতাতের খাতিরেই কি না কে জানে।

টুকু সেন আবার শ্রোতাদের অন্যমনস্কতা বরদাস্ত করতে পারেনা তার গল্পে মশগুল না হয়ে কেউ থাকবে, এ তার অসহ্য।

সে তাই ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে ব্যঙ্গ মেশানো স্বরে—"কি হে বর্ধন মনে পড়ছে? তুমি'ত তখন তোমার Magnum opus ধ্যান করছ।"

কে বুঝি হেসে জিজ্ঞাসা করেছে,—"Magnum opus টা কি? অম্বুজানাথের ওই প্রাসাদ?"

"হ্যাঁ দুনিয়ার সেরা Practical joke! ওটা'ত স্থাপত্য নয় ভাস্কর্য! অম্বুজানাথেরই মানসমূর্তি।"

সবাই হেসে উঠেছে।

সুবীর বর্ধন শুধু কেমন একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

টুকু সেন রসাল কণ্ঠে বলেছে,— "আরে উঠছ কেন বর্ধন, গল্পটা শেষ করতে দাও।"

বর্ধন বসেছে আবার। টুকু সেন তার গল্প শেষ করেছে। পোর্ট্রেট আঁকতে নাকি অনেকদিন লেগেছিল। শেষ আর তা হয় না। অনেকদিন বাদে পোর্ট্রেট আঁকা শেষ হবার পর তা সাড়ম্বরে রসিক গুণীদের দেখাবার দিন। প্রচুর জলযোগ আপ্যায়নের পর নিমন্ত্রিতেরা ছবি আঁকবার ঘরে গেছেন। সকলের উৎসুক দৃষ্টির সামনে ছবির ঢাকনা সরানো হয়েছে।

কারুর মুখে আর কোন কথা নেই। সবাই একেবারে থ'।

মিসেস দস্তিদার যে তার মধ্যে কখন ছাই-এর মত সাদা মুখ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন তাও কেউ লক্ষ্য করে নি।

অম্বুজানাথই সকলের মুখের দিকে চেয়ে বোকার মত হেসে জিজ্ঞাসা করেছেন,— "কেমন দেখছেন!"

কেউ জবাব দিতে পারেন নি, বিমূঢ় হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছেন মাত্র।

ছবিটা আমাদের যাকে বলে আধুনিক। কিন্তু তার রঙ রেখার মাৎলামির ভেতর থেকেও একটা মাকড়সার আদল বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়।

হঠাৎ সুবীর বর্ধনের তীব্র চাপা গলা শোনা গেছে—"ও ছবি আমার আঁকা নয়!"

"তাই নাকি!"—টুকু সেন অদ্ভুতভাবে তার দিকে চেয়ে হেসেছে, "কিন্তু ওই ছবির ধাক্কাতেই মিসেস দস্তিদার তার কিছুদিন বাদেই মারা গেছেন। বীরনগরের বড় তরফের ব্যাপার বলেই আত্মহত্যার কথা কোথাও ওঠেনি।"

ঠিক এই মুহূর্তে সুবীর বর্ধন টুকু সেনকে চড় মেরেছে। শুধু চড় মেরেই সে ক্ষান্ত হয়নি, উন্মাদের মত টুকু সেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

অন্য সকলে শশব্যস্ত হয়ে ধরে ফেলে ছাড়িয়ে না দিলে টুকু সেনকে সেদিন বাঁচানো যেত কি না সন্দেহ।

সুবীর বর্ধনের ওপর সবাই খাপ্পা হয়ে উঠেছে। পিছমোড়া করে তাকে ধরে রেখে উত্তেজিতভাবে বলেছে, "তোমার, মত উন্মাদকে পুলিশে নয় পাগলা গারদে দেওয়া উচিত।"

টুকু সেনই শুধু শান্তভাবে উঠে একহাতে মুখের রক্তটা মুছতে মুছতে বলেছে,—"না, আমার নিজেরই মার ওর হাত দিয়ে আজ পেলাম।"

একটু চুপ করে থেকে সকলের স্তম্ভিত মুখের দিকে চেয়ে তার পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক গলায় বলেছে,—"ও ছবি আমিই এঁকেছিলাম। অম্বুজানাথ লুকিয়ে আমায় আঁকতে দিয়েছিলেন। নিজেকে তার জন্যে আর জীবনে ক্ষমা করতে পারিনি। ভেতরের জ্বালা তাই ব্যঙ্গ করে মেটাবার চেষ্টা করি। কিন্তু উপহাসের সূক্ষ্ম লড়াইতেও অম্বুজানাথই আগাগোড়া জিতে রইলেন। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধেই।"

প্রাগৈতিহাসিক ডায়নোসোরাস
ও ডিনোথেরিয়াম
কালের ডায়নামাইটে
নিশ্চিহ্ন হোয়েছে পৃথিবীর পিঠ থেকে।

দশ হাজার বছর কিংবা বিশ হাজার বছর পরে
মাটির তলা থেকে
বেরোল আজ তার কঙ্কাল।

তাই নিয়ে আবার চললো
কতো পণ্ডিতের আস্ফালন
পাণ্ডিত্যের কতো কুচ্‌কাওয়াজ
আর বাহাদুরী।
গবেষণাগারে চঞ্চল হলো গবেষকরা
চললো কতো রকমের
কতো না গুলতুনী
আর আকাশের গায়ে ঢিল ছোঁড়া।

শেষ অবধি মিউজিয়ামে
সগৌরবে, সমারোহে ঝোলানো হলো
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-এর অরুচি
শেষ অস্তিত্ব সেই অস্থিগুলো।

শিল্পী সন্ধান করে
আরো মহার্ঘ কাঠ-পিঁপড়ের কঙ্কাল।
কিন্তু পাওয়া যায় কি কোরে?
পাণ্ডিত্যের কুচ্‌কাওয়াজ
আজীবন স্থগিত রয়ে যায় তাই।
মিউজিয়ামে ঝোলাতে পারে না কিছুই।

তারুণ্যেই যাঁরা উজ্জ্বল রচনা-বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন কোরেছেন নীলকণ্ঠ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বিদ্রূপ ও শ্লেষের তীক্ষ্ণতায়, পরিহাসের মাধুর্যে, পাঠকচিত্তকে আচ্ছন্ন করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর। সাম্প্রতিক বাংলা লঘু প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি স্বীয় ক্ষমতার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, বর্তমান প্রবন্ধেও তার পরিচয় প্রমূর্ত।

কিতাবপট্টি

নীলকণ্ঠ

বঙ্কিমচন্দ্র আজ আর নেই। তাঁর বদলে আছে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটও কিছুদিন বাদে আর থাকবে না। তার বদলে এই রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে এর আশে পাশে, আগাপাশতলায়, আরও যে সব অলি-গলি আছে সব নিয়ে সমস্ত জায়গাটার নতুন নাম হবে কিতাবপট্টি।

ধনী-চতুর মিলিওনেয়ার মাড়োয়াড়ী ব্যবসাদারদের সঙ্গে কোথাও জুত কোরতে না পারলেও, এখানে, অন্তত এই বই-পাড়ায়, এই একটি জায়গায় বাঙ্গালী এখনও ব্যবসা কোরে যাচ্ছে মাড়োয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে। কোরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু বেশি দিন আর কোরতে পারবে না; কারণ জাত্-মাড়োয়াড়ী মিলিওনেয়াররা গন্ধ পেয়েছে নতুন রক্তের। তারা এলো বোলে।

তারা এসে প্রথম-প্রথম বঙ্কিম চন্দর স্ট্রীটই বোলবে; তারপর অবশ্য সব কিছুকে অর্দ্ধচন্দ্রযোগে বিদায় দিয়ে কিতাবপট্টিতে চালু কোরবে তাদের নিজস্ব চাল। রাস্তা থেকে শোনা যাবে বইয়ের গদিতে বোসে বাঙ্গালী বাবুকে মাড়োয়াড়ী মনিব হুকুম কোরছে; "যাও, দোশ সের 'গীতাঞ্জলি' লিয়ে এস তো।"

বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের শুধু নাম আর ইতিহাসই পাল্টাবে না; তার জিওগ্রাফীও বদল হবে। তার আগেই বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের একটা নকসা ছাপার অক্ষরে পাকা কোরে রাখা দরকার। তার আসল ব্লু প্রিন্টের ট্রু-কপি! এই রাস্তা যাঁর পুণ্য-নামে তিনি এই রাস্তার কথা লিখলে, ভাল হোতো সবচেয়ে। কারণ বঙ্কিম চন্দ্র যতো গল্প উপন্যাস লিখেছেন, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে তার চেয়েও বেশি উপাদান আছে গল্প-উপন্যাসের। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকলে তাঁর নামে এই রাস্তা হোতে পারতো কি না সে-বিষয়ে বোলতে পারেন একমাত্র কাউন্সিলাররা। তা ছাড়াও আরও যে-সন্দেহ মনের কোনে উঁকি-ঝুঁকি দেয় তা হলো: বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকলে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে আজকাল যা হয় তা হোতে পারতো কিনা আদৌ!

কারণ, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্যের জনক; বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কিন্তু হোয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক! এখানে এক সময়ে প্রকাশকরা ঠকাত লেখকদের। এখন লেখকরা ঠকাচ্ছে প্রকাশকদের। তবু এরই মধ্যে একটু আশার কথাও আছে বৈকী! এই তামাসার মধ্যেই বহু ঠকেও নগরে ও গ্রামে যারা আজও সংখ্যায় বাড়ছে তারা হলো বাংলা সাহিত্যের পাঠক।

কলেজ স্ট্রীটের এই কিতাবপট্টিতে অতি সাম্প্রতিককালে যে সব কারবার চলছে তা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত কোনোও কিতাবেই লেখা নেই। কিতাব নিয়েও যে পট্টি চলতে পারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতায় শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট আর তার আশপাশ থেকে সুরু কোরে কলেজ স্ট্রীট ধোরে বরাবর হেদো পর্যন্ত এগুলে তারই অগুন্তি সাক্ষী একের পর এক পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে, হেলে দুলে শুয়ে বোসে কাৎ হোয়ে আপনাকে তার মালুম দেবে। বীণাপানির এই ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডী কয়েক বছর আগেও ছিল অকল্পেয়। লেখা সেদিন নেশা ছিল, পেশা ছিল না বোলেই রক্ষে! আজ লেখা আর নেশা নয়; পেশা। এবং তাইতেই লেখক আর কেরাণীতে তফাৎ অল্পই, দুয়েরই দশটা-পাঁচটা কলম পেশা!

লেখা যেদিন নেশা ছিল টাকা-আনা-পাইয়ের বিচারে লেখকরা সেদিন নিঃসংশয়ে ছিলেন অতি দীন। প্রতিদিন অন্ন চিন্তার চেয়ে মহত্তর কোনো অন্য চিন্তা

অসম্ভব ছিল। তবু সেদিন বাংলা সাহিত্যের জাহ্নবী-ধারার সঙ্গে যুক্ত হোতে পেরেছিল নতুনতর জীবনের নবকল্লোল। আনন্দের তাগিদে, বহুতর অনাসৃষ্টির আগাছা আকীর্ণ অসুন্দরবনের অবাঞ্ছিত আবহাওয়ায় অকস্মাৎ দেখা দিত সৃষ্টির শতদল। এবং সেই একটি কি দুটি রচনার পরিমল লোভে আস্তে আস্তে এসে জুটেছিল অনেকগুলি অলি। তাদের গুঞ্জন বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের কাকলীর সঙ্গে এক না হোয়েও বঙ্গ সাহিত্যের ঐকতানে ধ্বনিত কোরেছিল নতুন সুর। রবীন্দ্রনাথের মতো শুধু লিখি বলবার জন্যে রূপোর চামচে মুখে কোরে ভূমিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। তাই, 'লিখে খাবো'—একথা বলার চেয়ে 'না খেয়ে লিখবো' একথা বলাই সেদিন শোভন ছিল, সঙ্গত ছিল, সমীচীন ছিল। এবং লেখক মাত্রেই সেদিন পেটের দায়ে যা বাধ্য তাই কোরতেন; লিখতেন কিন্তু প্রাণের দায়ে। পাওনাদারের তাগাদায় কপিরাইট বেচতেন সমুদয় রচনার; সে রচনার জন্ম কিন্তু পাওনাদারের জন্যে নয়, সৃষ্টির তাগাদায়।

সেদিনও বাংলা সাহিত্যে দল ছিল; কিন্তু এতো দলা-দলি ছিল না। সেদিনও বাংলা সাহিত্যে বহু হাট ছিল কিন্তু এতো হট্টগোল ছিল না। সেদিনও ঈর্ষা ছিল, আক্ষেপ ছিল, উড়িয়ে দেওয়ার, বাড়িয়ে বলার ছিল উদ্দাম অপপ্রয়াস। কিন্তু সবার উপরে যে-ছিল সে লেখক নয়; লেখা। নতুন লিখছে, এই কারণে নয়, লেখাটা নতুন এই কারণে নন্দিত হোতেন নবীন লেখক। এবং তখন? তখন শত্রুমিত্র দল-বেদল সবাই এগিয়ে এসে স্বাগতম জানাতে কুণ্ঠিত হোতেন কদাচ। বইয়ের কটা সংস্করণ হোয়েছে সেটাই বিচারের একমাত্র মাপকাঠি ছিল না। বইটা সিনেমায় কতোতে বিক্রী হলো—এ ছিল না ঈর্ষাকাতর করুণ মুখের ওপর ভদ্রতার মুখোস পরা সহাস্য প্রশ্ন। রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছে কিনা—এ প্রশ্ন উঠত না, প্রশ্ন উঠত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বইটি পড়েছে কিনা। এবং এই কারণেই সেদিনকার বাংলা সাহিত্যে যদি একশত দলও থেকে থাকে, তবু সেই দলের ফাঁকেই কখনও কখনও ফুটে উঠতে পারতো চিরকালের বিস্ময়,—সাহিত্যের সেই একটি কি দুটি শতদল।

আর আজ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতায় সাহিত্যের কালো বাজারে,—বাংলা সাহিত্যের মুখ যতো কালো,—বাংলা সাহিত্যে মুখ ততো আলো। কিতাবপট্টির সঙ্গে লোহাপট্টির, তুলাপট্টির, সোনা অথবা রূপোপট্টির তফাৎ অল্পই অথবা একেবারেই নেই। যে লেখে তার সঙ্গে যে পড়ে তার একমাত্র পার্থক্য হোচ্ছে যে পড়ে সে পাঠক; যে লেখে সে ঠক। আজকের Writer-এর writing-এর সঙ্গে যতোটা, তার চেয়ে তার যোগ-সাজস অনেক বেশি Writers' building-এর সঙ্গে! বাংলা ভাষার লেখকরা আজ বাড়ী কোরছে, গাড়ী কোরছে, বিদেশ যাচ্ছে, প্রাইজ পাচ্ছে—সবই সুখের কথা। অ-সুখের শুধু যেভাবে কোরছে সে এসব,—চরিত্র, মনুষ্যত্ব, অথবা শিরদাঁড়ার অভাবে বহু বিক্রীত বইয়ের বহুধা বিকৃত বাঙালী লেখক রাজনীতির চাকায়, অর্থনীতির দরজায়, দুর্নীতির দুপায়ে যেভাবে সাহিত্যের নীতি বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর,—অ-সুখের কথা যা কিছু তা হোচ্ছে তা-ই। একদিন যাঁরা বঙ্গ সাহিত্যের সেবক বোলে সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হোয়েছেন তাঁরা লেখক মাত্র ছিলেন না; বাঙালী লেখক ছিলেন। আজ যারা বাঙালী লেখক বোলে পুরস্কৃত তারা লেখক তো নয়ই—বাঙালীও নয় তারা। কাঙালী বোললেই তাদের ঠিক হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে যে অপূর্ব উপায়ে সংঘটিত হলো বাঙালী বিদায়, স্বাধীন ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব রাজনীতির কৃপায় সেই একই উপায়ে চালু হোয়েছে প্রাইজের নামে, বিদেশে সংস্কৃতি প্রতিনিধি পাঠানোর বেনামে—আসল দল বজায় রাখার কারণে নিরুপায়—এই নূতন সাহিত্য-সংহার নীতি;—পাকিস্তানের বাঙালী বিদায়ের মতো, হিন্দুস্থানে এর নাম দেওয়া যায়, কাঙালী বিদায়।

দিল্লী অনেক দূর নয় আজ। লেখকরাও আজ হিল্লি-দিল্লী কোরে বেড়াচ্ছে এবেলা ওবেলা। এই দিল্লীর দরবারে লেখকদের সম্পর্কে যেসব উক্তি সরকারী কর্মচারীদের মুখে আপনি হামেশাই শুনতে পাবেন তাতে লেখকদের সঙ্গে ভদ্রলোক হিসেবে মেশাই শক্ত হবে। দিল্লী যায় লেখকরা বেড়াতে নয়; তম্বির কোরতে। হ্যাঁ। তম্বিরই সব। বসুন্ধরা আর বীরভোগ্যা নেই যে। বসুন্ধরা আজ তম্বিরভোগ্যা। বীরের জায়গা নিয়েছে আজ তম্বির। এবং কিতাবপট্টির অতল অন্ধকারে যেসব ন্যক্কারজনক কারবার আজ চালু হোয়েছে তার খবর যারা রাখে না, সেই সব অর্বাচীনদের ধারণা ভালো লিখলেই বুঝি বড় লেখক হওয়া যায়—হায় রে! আজ লেখকদের কাজ যে লেখা ছাড়া আর সব কিছুই,—আজকের পেশাদার লেখক ছাড়া সেকথা আর তেমনভাবে জানে কে? কিতাবপট্টির হাঁড়ির খবর যারা রাখে, তারাই কেবল জানে যে আজ কেউ বড় লেখক হোতে চায় না; চায়—বড়লোক হোতে।

সেই সব তরুণ কলমচীরা—যারা এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতায় কিতাব নিয়ে ফাটকার বাজারের ফটক পার হবার ছাড়পত্র হাতে পায় নি, তারা ভাবে গাড়ী-বাড়ী-প্রাইজ-ডেলিগেসান, এসব বুঝি ভালো লেখার পুরস্কার! না। তাদের নিরুৎসাহিত করবার কারণে বোলছি না। বোলছি যেন তাদেরও না গাইতে হয়—'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'—এই কারণে। না হলে যোগ্যতার দাবীতে এ পুরস্কার দেওয়া হলে কথাসাহিত্যে এবং কবিতায় এ পুরস্কার যে দুজনের পাওয়া উচিত ছিল সর্বাগ্রে, তাঁদের নাম হোচ্ছে যথাক্রমে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মোহিতলাল মজুমদার। যদি কেউ পুরস্কার প্রদানের পলিসি অথবা রুল্‌স্ এবং রেগুলেশানের কথা তোলেন তাহলে সে কুযুক্তি নাকচ কোরি তৎক্ষণাৎ এই সুযুক্তির সুযোগে যে নিয়মের যূপকাষ্ঠে যোগ্যতার দাবী কখনও বলি হয় না। শুধু এটুকু বোলেই আমি শান্ত না। এর সঙ্গেই, এই সঙ্গেই যে-কথা এখানে যোগ কোরতে চাই তা হোচ্ছে, যাদের এই পুরস্কার দেওয়া হোয়েছে, হোচ্ছে এবং হবে তাদের বেলাতেও কি পুরস্কারের রুল্‌স্ এবং রেগুলেশান মানা হোয়েছে, হোচ্ছে, না হবে? না। যোগ্যতার দাবীর সঙ্গেই পুরস্কার প্রদানের সমস্ত নিয়ম নির্মূল কোরে যেভাবে এই পাঁচ হাজার টাকা দলের লোককে, নিজের দেশের লোককে, দেওয়া হোয়েছে তাতে একে রবীন্দ্র পুরস্কার না বোলে রবীন্দ্র তিরস্কার বোলে অভিহিত করাই সঙ্গত, সমীচীন এবং শোভন হোতো।

কিতাবপট্টির অনন্ত রহস্যের অতল অন্ধকারে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সার্চলাইট ফেলা যাক অতঃপর। সমুদ্রমন্থন পর্বের পর বিষ এবং অমৃত দুই উঠেছিল পুরাণবৃত্তান্তে এমন কথাই বলে। বইপড়ায়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, স্বাধীন দেশের সবচেয়ে সুরুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতির সুষমা-মণ্ডিত, মনীষাকীর্ণ বিদগ্ধ মহল—এই কিতাবপট্টির মাটি খুঁড়লে কেঁচো পাওয়া যাবে না কিন্তু সাপ দেখা যাবে অগুন্তি। সাপ নয়; সরস্বতীর অভিশাপ। মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে কিতাবপট্টির আনাচে-কানাচে। অমৃত নয়; কেবল বিষই উঠবে মন্থন কোরলে। একরকম বিষ নয়; চারশো রকমের বিষ। চারশো বিশেরা শেষ পর্যন্ত অবাধ প্রবেশাধিকার, পার্মানেন্ট ভিসা পেয়েছে সরস্বতীর অন্দর-মহলেও। আর তাতেই পার্মানেন্টলি ভিসাস সার্কল্ গড়ে উঠেছে কিতাবপট্টির চারপাশ জুড়ে। তারা কারা?

তারা হোচ্ছে পাটের, তুলোর, সোনা-রূপোর ফাটকা বাজারের মতোই কিতাবপট্টিতে নতুন আবির্ভূত সাহিত্যের দালাল। এই আলালের ঘরে দালালরা কেউ বিজ্ঞাপন দেবার মালিক, কেউ দৈনিক কাগজের মালিকের আত্মীয়। সেই মূল খুঁটির জোরে এরা বঙ্গ সাহিত্যের এবং বাঙালী সাহিত্যিকের হর্তাকর্তা বিধাতা। ডিফ্যাক্টো এইসব ডিক্টেটরদের শিং-এ পড়েই সাহিত্যের ধার নির্মূল হোতে বোসেছে। লেখকদের এরা যেখানে বই প্রকাশ কোরতে দিতে নির্দেশ দেবে সেইখানেই লেখককে বই দিতে হবে বিনা বাক্যব্যয়ে। না হলে সবচেয়ে চালু কাগজে সে লেখা ছাপা হবে না। সবচেয়ে চালু কাগজে ছাপা না হলে সে-বইয়ের প্রকাশক জুটবে না। জুটলেও নিজের দেশের লোকের বইয়ের যেরকম রিভ্যু হবে, অন্য বইয়ের তেমনই ঠিক তার উল্টো রিভ্যু হবে। এই সব দালালরা আবার নিজেরাই এখন প্রকাশক হোয়ে বোসছে। বিজ্ঞাপন দেবার জোরে যেসব দালালরা প্রকাশক হোয়েছিল তাদের বই বার করবার জন্যে প্রয়োজন হয়নি ক্যাপিট্যালের। ছাপা-ওলা, কাগজওলা, বাঁধাইওলা, ব্লকওলা, সবাইকে বিজ্ঞাপনের দালাল বিরাট টাকার কাজ দিয়ে নিজের প্রকাশনা ব্যবসায় বাধ্য কোরছিল ধার দিতে, এবং ধারের সাহায্যে নিজে উদ্ধার পেতে।

বিজ্ঞাপন-মালিকের ওপরে যায়—এক কাঠি ওপরে যায়—কিন্তু কাগজের মালিকের আত্মীয়। সে লেখকদের কর্ণধার হোয়ে কান ধরে নিয়ে এলো নিজের প্রকাশনার আওতায়। কান ধরলেও, লেখকের অধরে হাসি ফুটিয়েছে সে-ই। সবচেয়ে চালু কাগজে ধারাবাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা কোরে দিয়েছে যে বঙ্গ সাহিত্যের আলালের ঘরের দালাল! কাজেই লেখকের 'না'—বলবার উপায় রেখেছে কি? এমন কি যে অতি-সৌভাগ্যবান দু'একজন লেখকের নিজের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশালয় আছে, তাকেও বাধ্য কোরছে ওই সবচেয়ে চালু কাগজে ধারাবাহিক প্রকাশের ফাঁদ পেতে নিজের দোকান থেকে বই বার না কোরে ওই দালালের দোকান

থেকে বই বার করানোয়। এবং কন্ট্রাক্ট সই করবার মুহূর্তেই লেখকের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, 'জানি। আমার ফাঁসী হলো। তবুও!' তবুও নিজের ফাঁসীর হুকুমের তলায় নিজেরই সই দিতে হোয়েছে নিরুপায় হোয়ে। টিপ সই নয়; Fool-Signature!

আরেকদল এসেছে দালাল। তারা ছাপাখানার মালিক অথবা কর্মাধ্যক্ষ। ছাপাখানারই এককোণে খুলে বোসেছে প্রকাশনাগার। বই প্রকাশের পুরো ব্যবস্থার বদলে তাকে বই-ঠকখানা বলাই সঙ্গত। অর্থাৎ অন্য প্রকাশকদের বই ছেপে দেবার ফাঁকে-ফোঁকড়ে নিজেদেরও দু'একখানা বই ছেপে নেওয়া—এই আর কি! অর্থাৎ কিতাবপট্টিতে অধুনা বই-প্রকাশনার নামে এই ইয়ার্কিও চালু হোয়েছে। বিজ্ঞাপন দেবার মালিক, কাগজের মালিকের আত্মীয়, ছাপাখানার কর্তা অথবা কর্মচারী—এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য গমগম কোরছে কিতাবপট্টিতে। এখন চতুর্দিকে কেবল এদের একারই জয়জয়কার!

এহ বাহ্য। কিতাবপট্টির অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যাক অতঃপর। সেখানে এখন লেখক-প্রকাশকের প্রধান নির্ভর যেদুটি বস্তু—তার নাম—ললাট ও মলাট। কলমের চেয়ে আজকের পেশাদারী লেখক কপালের জোরেই কোরে খাচ্ছে বেশী। কলম বেজুতের হলে এসে যায় না কিছু, যদি কুষ্টি জুতের হয় তবেই রক্ষে। ললাটের পরেই বই কাটছে মলাটের জোরে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের যেমন মেক-আপ ছাড়া দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়, গেট-আপ ছাড়িয়ে বাংলা বইয়ের অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ কোরলে তেমনি ভয়াবহ অন্তঃসার শূন্যতা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না প্রায়ই। এখন এই দুটি বক্তব্যই একটু বিশদ উদাহরণ সহকারে সচিত্র করা আবশ্যক।

প্রথমেই বুঝিয়ে বলা দরকার কলমের চেয়ে লেখকের কুষ্টি জুতের হওয়া চাই কেন? চাই—তার কারণ আজকের বাংলা সিনেমা যেমন সুচিত্রা-উত্তম সর্বস্য—তেমনি আজকের বাঙালী পেশাদার লেখকের সম্বল একটি কি দুটি পত্রিকা। এই একটি কি দুটি পত্রিকার মালিকের দলের অথবা দেশের লোক না হলে এ পত্রিকায় লেখক মাত্রই অচল। এখানে লেখা ছাপা না হওয়া মানেই একজন কি দুজন যে রাজ-প্রকাশক কিতাবপট্টির সিংহাসন আলো কোরে আছে তাদের দোকান থেকে আপনার বই বেরুবার আশা তামাসা মাত্র। তাদের বাদ দিয়ে অন্য যে কোনও অগণ্য প্রকাশকের একজনের কাছ থেকে যদি বই বেরোয় তাতে জানবেন সে বইও কাটছে খুব—তবে ইঁদুরে কাটছে। তফাতের মধ্যে এই যা। এই পত্রিকার গুষ্টির মধ্যে ঢুকতে আপনার কুষ্টি জুতের হওয়া চাই সাজ্জাতিক।

হ্যাঁ। আপনারা কি বোলতে উদ্যত এই মুহূর্তে তা জানি। জানি যে আপনারা বলবেন এমন লেখকও আছেন যাঁর প্রয়োজন নেই কোনোও পত্রিকার মুখ চেয়ে থাকবার। বরং তাঁর মুখ চেয়েই বোসে আছে পাঠক এবং প্রকাশক উভয়েই; প্রকাশক অবশ্য ভয়ে ভয়েই চেয়ে আছে কখন আবার লেখে একখানা বই এবং কাকে দেয়। কিন্তু এরকম লেখক হোচ্ছে অদ্ভুত ব্যতিক্রম। এবং একথা কে না জানে যে ব্যতিক্রম মাত্রেই নিয়মের প্রমাণ! এখন নিশ্চয়ই চর্মভেদ কোরে মর্মে গিয়ে পৌঁছেচে আমার বাণী। নিশ্চয়ই বোধগম্য হোয়েছে এতক্ষণে এ বার্তা যে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে লেখকের মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে কাগজ। কিন্তু আমাদের এই 'এমনটি আর কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'-র দেশে লেখক হোচ্ছে কাগজের মুখাপেক্ষী।

ললাটের পর আসা যাক মলাটের দরজায়। একদিন ছিল যখন দূর থেকে, বহুদূর থেকে দেখেই বোলে দেওয়া যেত যে বাংলা বই। বাংলা বই সেদিন ছাপা-বাঁধাইএ হতশ্রী ছিল। আজ আর সেদিন নেই। আজ বাংলা বই কাছে, খুব কাছে, হাতে কোরে চোখের কাছে ধরলেও চট কোরে বলবার উপায় নেই চকোলেটের মোড়ক না বইয়ের মলাট। মাদুর, বালি, গেরুয়া কাপড়, রঙিন ছাতার মতো টেকনিকালার ফ্লুরেসেন্ট প্রিন্টিং-এর প্রচ্ছদের কৃপায় বই বেরিয়েছে কি বই বেরিয়েছে বাজারে কে বোলবে! কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী অত্যন্ত সাদামাটা অবস্থায় প্রকাশিত হোয়েও কখনও অনুযোগ করেনি যে get-up-এর অভাবেই—অগত্যাই তাদের sit-down! বরং রবীন্দ্রনাথের বই হাতে নিয়ে মনে হোয়েছে, হ্যাঁ, বই এমনি-ভাবেই বেরুন উচিত। অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন প্রচ্ছদ, নির্ভুল ছাপায় চকমকে না হোয়েও বিশিষ্ট, বিরল।

গাড়ীর মাথায় মস্ত বড় বেলুন উড়তে দেখেই যেমন যুদ্ধের সময় বোঝা যেত গাড়ীর হঠাৎ-বড়লোক মালিক কালোবাজারের কৃপায় উড়তে শিখছে, ঠিক তেমনি আজকের হঠাৎ প্রকাশকদের হাতে পড়ে বাংলা বইয়ের,—সে বই ছোট গল্পের অথবা রম্যরচনার, উপন্যাসের বা কবিতার যারই হোক না কেন—তার অঙ্গে গণিকার সাজ। স্থান-কাল-পাত্র সব সময়েই সত্য। আর সত্য বোলেই নতুন বইয়ের সাজ আর নতুন বউয়ের সাজ কখনই এক নয়। বইয়ের বাঁধাই শক্ত হবে; কাগজ সাদা এবং দুপাতাতেই ছাপার যোগ্য হবে, ছাপার ভুল থাকবে না, রচনার চরিত্রানুযায়ী হরফের একটা চরিত্র থাকলে ভালো হয়। আবার বিশেষ ধরনের প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রচ্ছদ টেকনিকালার হোতে পারে—ভেতরের পাতা এবং ছাপা হোতে পারে দুই-ই রঙিন—কিন্তু কোনোও সময়েই তাকে বই বোলে চিনতে সময় লাগলে রচনার অবস্থা তখন অবশ্যই সঙ্গীন। পৃথিবীতে প্রগতির গতি যত দুরই হোক, যতই দুর্গতি হোক তার, মন্দিরে মায়ের আরতি মাটির প্রদীপেই কোরতে হবে—ফ্লুরেসেন্ট অথবা নিওনসাইনের প্রদীপ হাসির খোরাক জোগাবে মাত্র।

আর প্রকাশকে-প্রকাশকে এমন মলাট নিয়ে ষাঁড়ের লড়াইতে দামের গুঁতোয় পাঠক যে লাট খাচ্ছে তার সম্বন্ধে কারুর এতটুকু টুঁ শব্দ পর্যন্ত অশ্রুত। বাংলা বইয়ের মোদ্দা পাঠক এখনও লাইব্রেরীর মেম্বর। লাইব্রেরীতে বই পায়ে হেঁটে গেলেও যা গাড়ী চেপে গেলেও তাই। কয়েকদিনের মধ্যেই চকচকে মলাটের প্রস্থান এবং তার পরিবর্তে সেই চিরকালের দপ্তরীকৃত কালো চামড়া আর পেস্টবোর্ডে বাঁধাইয়ের প্রবেশ। মাঝখান থেকে শুধু মলাটের জন্যে অতিরিক্ত একটাকা বেরিয়ে যাচ্ছে লাইব্রেরীর মেম্বারদের। আর কভার দিয়ে পাঠককে ঠকানো যাবে কতকাল? সে অদ্য, কল্য, পরশু ডিসকভার কোরবেই যে বাংলা বইয়ের এই মলাট-মাহাত্ম্য শূন্যকুম্ভের অর্থহীন নির্ঘোষ অথবা অপদার্থ রচনার অঙ্গে এই অতুলনীয় প্রচ্ছদ কথামালা কথিত সিংহচর্মাবৃত গর্দভের সঙ্গেই শুধু তুলনীয়!

কিন্তু এহ বাহ্য। আসল কথা নয় এও! এবারে আসুন অন্তঃপুরের অন্তরতম প্রদেশে। সেইখানেই চলছে আসল খেলা। সংস্করণের খেলা। বাংলা বইয়ের এখন যেভাবে এডিশন হয়,—সে-এডিশন বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক Edision-এরও ওপরে যায়। একদিন শরৎচন্দ্রের সব রচনারই অসংখ্য সংস্করণ হোতো, বাকী সকলের বই দ্বিতীয় সংস্করণের অভাবে অদ্বিতীয় হোয়ে থাকত প্রথম সংস্করণেই। ভদ্রলোকের এক কথার মতো, বাঙালী লেখকের বইয়ের সেদিন এক সংস্করণই ছিল একমাত্র সংস্করণ! এখন আর সেদিন নেই। মাসে, সপ্তাহে, তিন দিনে সংস্করণও এখন অকল্পেয় নয়; বাস্তব সত্য। এমন কি কারুর কারুর ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণ বেরুবার আগে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলে অবাক হবার নেই। এবং লাইব্রেরী ও পাঠক, প্রকাশক এবং সমালোচক সবাই একমত, যে বইয়ের যটা সংস্করণ সেই বই ততো উত্তম। এবং সেই বইয়ের চলচ্চিত্ররূপ ততো আকাঙ্ক্ষিত। হিন্দি ছবি যেমন পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহে একসঙ্গে মুক্তিলাভের পর পাঁচ সপ্তাহ চলবার পরই—একযোগে পঁচিশ সপ্তাহ চলার বিজ্ঞাপনে রজত-জয়ন্তী সপ্তাহের ঘোষণা করে,—সংস্করণের পর সংস্করণে বাংলা বইয়ের তেমনই আজ বিজয়-বৈজয়ন্তী।

এই সংস্করণ কেমন কোরে হয়, বেচারা পাঠকের তা জানবার আশা নেই বোলেই সংস্করণের পর সংস্করণের ধাপ্পায় পাঠকদের সঙ্গে প্রকাশকদের অবিরাম তামাসা অব্যাহত। এ সংস্করণ কেমন কোরে হয়? যেমন কোরে তিনসের দুধ জলযোগে ছ সের হয় তার চেয়েও সহজে। এক হাজার বই ছাপা হয় একসঙ্গে। কিন্তু আড়াইশো ছাপবার পরই—তার পরিচয় পত্র, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় টাইটেল-পেজ, অর্থাৎ যেখানটায় গোদা গোদা টাইপে সংস্করণের সংখ্যা ছাপা থাকে—সেই পাতাটা আড়াইশো বই ছাপা হবার পরই পালটে যায়। সেখানে তখন দ্বিতীয় সংস্করণ কথাটা বসে। আবার আড়াইশো ছাপা হবার পর দ্বিতীয় হয় তৃতীয়। এইভাবে এক-হাজার বই লাইব্রেরীকে গছানো মানে বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে লিখতে পারা: 'চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলো চার মাসের মধ্যে'! এই জাতীয়, এই বচ্ছাতীয় সংস্করণের মহিমায়—বইয়ের দর এবং লেখকের আদর দুইই বাড়ে এই অর্থে কিতাবপট্টির অন্দরমহলে সাঙ্কেতিক ভাষায় এর নাম হচ্ছে দরবারী সংস্করণ।

সংস্করণের পরেই আসছে নামকরণ। সেক্সপীয়র যদি কিতাবপট্টি দেখে যেতে পারতেন তাহলে কিছুতেই লিখে যেতে পারতেন না—'নামে কি আসে যায়'! নামে কিছু আসে যায় বৈকি! কিতাবপট্টিতে নিশ্চয়ই আসে যায়। বইয়ের নাম আজ লেখকের নামের চেয়েও

মজবুত হওয়া প্রয়োজন। কারণ বইয়ের বাজার আজ বিয়ের বাজারের মুখাপেক্ষী! বিয়েতে সেই বই-ই ততো উপহারযোগ্য যে বইয়ের নাম যতো উপভোগ্য। রূপালী পর্দায় যেমন বউদির বোন, ওগো শুনছো, তেমনি বইয়ের প্রচ্ছদেও প্রিয়াদের পছন্দসই নামেতেই কিস্তিমাৎ! এখন সেইজন্যে একই নামে একাধিক বই বেরুনোর চল্ আরম্ভ হোয়ে গেছে। তাই বোলছিলাম, নামে এসে যায়; বই যদি চালাতে হয় বউ-ভাত উপলক্ষে। তাহলে বই যাই হোক, বইয়ের জন্যে বেশ আলু ভাতে মার্কা নাম দিন; ঠিক কেটে যাবে! কেটে যাবে, কারণ কলিযুগে নাম-ই সব!

এরপরেও আরও এগুতে চান যদি তাহলে outdoor থেকে কিতাবপট্টির indoor patient হোতে হবে আপনাকে। গাম্বারের Inside Asia-র মতো বাংলা বইএর ভিতরে অনুপ্রবেশ করা হবে অত্যাবশ্যক। বাংলা বই বিক্রী হোতে আরম্ভ হওয়া মাত্র বিকৃত হোতেও আরম্ভ কোরেছে! কারণ যে বই যতো বিকৃত, সে-বই ততো বেশী বিক্রীত। এবং অধুনা বাংলা বইয়ের একমাত্র অবলম্বন তা-ই সেক্স। সেক্সপীয়রের এককাঠি ওপরে যায় বাঙ্গালী লেখক,—এরা সবাই Peer of Sex। এবং বইয়ের বাজার তেজী দেখে এখানে এখন যারা এসে ভীড় কোরছে তারা কেউ তান্ত্রিক, কেউ পঞ্চতান্ত্রিক। কেউ পুলিশ, কেউ ফিল্মস্টার। কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল। কিন্তু কেউই লেখক না। জাত লেখকরা এই সব বজ্জাত লেখকদের হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁদের কেউ কেউ আপাতবিস্মৃত অবিস্মরণীয় বাণী: 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্মো ভয়াবহঃ' বিস্মৃত হোয়ে তাঁদেরও কাউকে-কাউকে দেখছি সস্তায় বাজী মেরে দেবার সহজ রাস্তায় ন যযৌ ন তস্থৌ-র ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন।

বাংলা সাহিত্য আজ ব্যাধিগ্রস্ত। ব্যক্তির মতো জাতিরও জীবনে জোয়ার ভাঁটা আছে। জাতীয় জীবনেই আজ বজ্জাতীয় আবহাওয়া বহমান। এবং রোমের মতোই রোগও একদিন crisis-এ গড়ায় না। দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু কোরে রোগের প্রকোপ বাড়তে বাড়তে মৃত্যুর শেষ কোপ ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। ব্যক্তির জীবনে যেমন জাতির জীবনেও তেমনই Rogue-এর প্রতাপ বাড়তে বাড়তে জাতটাকেই নর্গের দিকে নিয়ে যায়। এবং সেই সঙ্গেই জানি যে একটা বাড়ীর যেমন বহুদিন ধরে মেরামতের অভাবে এক সময়ে মেরামতের অযোগ্য হোয়ে গিয়ে ধ্বস নামে—তেমনই বাঙ্গালী জাতেরও বোধহয় আরোগ্যের দিন বিগত। এবং সে জাতের সব দিক আজ দুর্নীতি আসক্ত তার সাহিত্যের দিকটাই শুধু শক্ত থাকবে—এ কখনও হয় না। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির ক্রীতদাস বাংলা সাহিত্যও আজ তাই rogue-আক্রান্ত! সেইটেই বিজ্ঞানসম্মত, প্রকৃতিসঙ্গত কথা!

কিন্তু কেন এমন হলো? এমন হলো, একজনও সৎ সমালোচকের অভাবে এবং একাধিক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশকের স্বভাবে। প্রকাশকের কাছে আজ সে-ই বই-ই বই, যে-বইয়ের সাতদিনে সংস্করণ হয়! এ বৈ আর সব বই, বই বটে,—কিন্তু সেগুলি শুধু বই-ই, বই বৈ আর কিছুই নয়। কিন্তু সব লেখক এমন বই লিখতে পারলেও লিখতে রাজি হবে কেন। বই তো ঘুগনী নয়, যে গরম গরম বিক্রী না হলেই, বাসি হোয়ে যাবে। আর প্রকাশক-মাত্রেই যদি লেখককে কেবল মাত্র চানাচুরের মতো, গরম ঘুগনী দানার মতো বই খানাকেও কেবল দ্রুত নিঃশেষযোগ্য কোরে তোলাতেই উৎসাহ দেয় তাহলে লেখক মাত্রেই সেই সিক্রেট, বিক্রীর চিচিং ফাঁক,—পার্ভার্সনকেই সম্বল কোরবে। কারণ সে জানে যে বইতে যত পার্ভার্সন,—সিনেমা-থিয়েটার-রেডিও per version তার আদর ততো বেশী। দর ততো চড়া!

প্রকাশকের স্বভাবে নষ্ট হোচ্ছে লেখক। আর বিনষ্ট হোচ্ছে সাহিত্য সেই সমালোচকের অভাবে যে বার কোরে দেবে বাংলা সাহিত্যে ঢুকে পড়া এই বেণো জল। তাদের বিতাড়িত কোরে তুলে ধরবে আপাত অবহেলিত সৎ লেখককে। সে রকম সমালোচক আজ আর জীবিত নেই। জীবিত থাকলেও,—অসৎ পত্রিকার আসরে তাঁর ঠাঁই নেই। তাঁর লেখা ছাপবার জন্যে নেই প্রকাশযোগ্য পত্রিকা অথবা প্রকাশক। কাজেই এমন সমালোচক জীবিত থাকলেও, যতটুকু জীবিত তার চেয়ে অনেক বেশী মৃত।

কিন্তু তবুও। তবুও উচ্চারণ কোরছি না ভৈঃ। সমালোচক এবং প্রকাশক নেই বটে কিন্তু কিছু সৎ পাঠকের অস্তিত্ব আজও অব্যাহত আছে। অবশ্য সংখ্যায় তারা আজ অত্যন্ত স্বল্প। সংখ্যায়, বাংলা সিনেমার দর্শক যারা আজ বাংলা সাহিত্যের অবাঞ্ছনীয় পাঠক—তারাই অগণ্য। তা হোক। তবুও সেই স্বল্পসংখ্যক সৎ-পাঠকই আজ ভরসা। তাদের প্রতিবাদ যেদিন সক্রিয় হবে, যেদিন তারা চকচকে মলাটে বীভৎস রসের বই পড়ার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে, সেদিন তাদের সম্মিলিত কুচকাওয়াজের সামনে, তোপের মুখে অগণিত শত্রু-সেনার মতো, অসৎ সাহিত্যের অক্ষৌহিণী উধাও হোয়ে যাবে মুহূর্তে। সেদিন দূরে। কিন্তু খুব দূরে নয়। আমরা তারই জন্যে অপেক্ষা কোরে আছি। আমরা অপেক্ষা কোরে যাবো।

রানী পালঙ্ক

বিজন ভট্টাচার্য

বিজন ভট্টাচার্য সেই অল্পলিপ্সাহ্যা লেখকদের অন্যতম যিনি সামান্য উপজীব্যকে উপযুক্ত প্রসাধনগুণে অসামান্য কোরে তোলেন। সহজ আঙ্গিকে, সাবলীল ভাষায় জীবনের কথা, মানুষের কথা আন্তরিকভাবে লেখার ক্ষমতা তাঁর করায়ত্তে। একদা গণনাট্য আন্দোলনের শিল্পী-নেতা।

॥ এক ॥

জবরদখলদার শেষ কয়েক ঘর অপরাহত ফৌজ। এদের আর শেষ পর্যন্ত তোলা গেল না। কাদামাটির দুর্গে শস্ত্রহীন নিরাশ্রিত জনমানুষ রাতের অন্ধকারেই পালিয়ে গেল হাতবোমা খেয়ে। ভোর বেলা দেখা গেল, না, সব না, কয়েক ঘর তখনও ঘাড় গুঁজে মাটি কামড়ে পড়ে আছে। কচি কলাপাতার নিশান উড়ছে সেখানে।

জান কবুল আর মান কবুল। সকাল বেলাই যোগীবর সূত্রধরের দুই চোখ জবাকুসুমসংকাশং। হাতে শাল-সেগুন 'ছ্যাও' মারা দুর্ধর্ষ পরশু। আপনা থেকেই চেঁচাচ্ছে। বোলছে, "কইল ব'লে পাউছ্যা। আরও পাউছ্যা। তো পাউছ্যালাম। ঘর দুয়ার, ক্ষ্যাত খামার, সাধের নবাব নগরের কাঠগোলা, সব ফালাইয়া থুইয়া পাউছ্যালাম। পেরথমে নাও, পরে ইস্টিমার। কালীদহ-ই না ডুবাইয়া আইলাম ব্যাবাকু, সব স্বপ্ন সাধ।" ভেঙে, চিরে যায় যোগীবরের কণ্ঠস্বর।

সৌরভির চোখে ঘুম ছিল না। মাটির ওপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে সে শুধু লক্ষ্য কোরছিল যোগীবরকে। বেশ ছিল মানুষটা, ক্ষ্যাপামিটাও কমে এসেছিল ইদানীং। হঠাৎ গত রাত্রির দুর্ঘটনার পর থেকে আবার ভুলভাল বোকতে সুরু কোরে দিয়েছে। সারাটা রাত ধরে চেঁচিয়েছে, এখনও চেঁচাচ্ছে। লোকে বোলবে পাগল, কিন্তু সৌরভি জানে যোগীবর পাগল না। এই মানুষটাই আবার যখন কথা কোইবে না একটা, সাতদিন দশদিন একনাগাড়ে চুপ কোরে থাকবে আপন মনে, তখন সবাই বোলবে মৌনী যোগীবর, সাধু যোগীবর। সৌরভি কিন্তু তখনও জানে, যোগীবর মোটেই চুপ কোরে নেই। মুখে বোলছে না বটে, কিন্তু অশান্ত, উদ্দাম হোয়ে আছে আর কোনোখানে, অন্য কোন ভাবে। ভাব আর ভাবনা, এই নিয়েই যোগীবর সূত্রধর। একটি দিনের ছেদ নেই, এক রাত্রির ব্যবধান নেই,—পঞ্চান্ন বছর একসঙ্গে বসবাস কোরে অন্তরে অন্তরে জেনেছে সৌরভি এই কথা।

পদ্মাপারের মেয়ে সৌরভি,—পদ্মার চোরা ঢেউ-ই বুঝি বা বুকপাঁজরে ভাঙে তার, ঠিক বোঝা যায় না। যোগীবর চুপ কোরে যেতেই উঠে বসে সে। এখন আর মুহূর্তকাল চুপ কোরে অপেক্ষা করা নয়। কোথায় বসন, কোথায় ভূষণ, যেমন আছো তেমনই, ছুটে গিয়ে এখনই বুকে জাপটে নিতে হবে যোগীবরকে সন্তানের মতো। শ্বাসপ্রশ্বাসে জলঝড়ের মাতন তুলে গালে গাল চেপে ধরে চোখের জল মুছিয়ে দিতে হবে আঁচলে। ডান হাতে বুক-পিঠ সাপটে মিথ্যা আশ্বাসের ছড়া-পাঁচালীতে জুড়িয়ে দিতে হবে শ্রবণ। যোগীবর ততো-ক্ষণ সৌরভির বুকের মাঝখানে মাথা-মুখ খুঁড়ে আকুল হবে। বেদনার্ত মুখখানা বার বার তার মুখ ছুঁয়ে ডুবে যাবে সৌরভির বুকের মাঝখানে। ত্বকে, স্বেদে, এবং আঁখিজলে সেখানে তখন আর এক লবনাক্ত সমুদ্র। ...সৌরভি অশান্ত হোলে তবে শান্ত হবে যোগীবর।

সকাল হলো। সূর্য উঠলো। নিলাজ সূর্য। মানুষের অপমান, মানুষের লজ্জায় কিছুমাত্র লাজরক্ত নয় সেই দিবাকর। অকৃপণ পাপঘ্ন সেই আলো সমান-ভাবে ছড়িয়ে পড়লো আশীর্বাদের মতো দুষ্কৃত আর তার দুষ্কৃতির ওপর। তবু প্রণাম কোরলো যোগীবর, সূর্য-প্রণাম।

হাতের পরশু আগেই কেড়ে নিয়েছিল সৌরভি। এখন সেটা আবার তুলে নিল যোগীবর। কথা বোললো না। সরাসরি এগিয়ে গিয়ে লাউকুমড়োর মাচাংটা একটানে ভুঁই-এ হেলিয়ে দিলো। গিঁঠওলা শক্ত দুখানা বাঁশ কঞ্চিসমেত হিড় হিড় কোরে টেনে বার কোরে মাপ কোরে কাটতে বোসলো। লাউমাচা গৃহস্থের শোভা, —'আলো মালো' চীৎকার তুলে দোহাই দিতে লাগলো সৌরভি যোগীবরকে। কথা কানে নিল না যোগীবর। বাঁশের ওপর কুড়ুলের কোপ মেরে বোললো, "মাথার উপুর চাল তো একখান উঠাই আগে, লাউমাচা কোরতে কতোক্ষণ?"

যতো ফুল ততো জালি, লতাপাতায়ই বা কি সবুজের

সমারোহ—বুকের মাঝখানে হায় হায় করে সৌরভির। বলে, "অহন থিক্যা জনে জনে চাল একখান বাইন্ধ্যা বেড়াও মাথায়, যেইখানে যাইবা সেইখানেই ঘর। বাস্তর আর হইছে ঠিক ভবসংসারে।"

পদ্মাপারের মেয়ে সৌরভি, পদ্মার খরচোট তার প্রতি কথায়। তবু উত্যক্ত হয় না যোগীবর। বলে, "বাস্তই যখন বোঝ ভবসংসার, তখন কলোনীর লাউ-মাচায় আর জড়াও ক্যান? দ্যাখই আগে টিকতে পারো কি না?"

এক রাত যায় আরেক রাত আসে। সামনের রাত-গুলো যে কতো নিরন্ধ্র কালো সে কথা ভেবে খই পায় না সৌরভি। বেটা, পুত, নাতি, নাতনী নিয়ে বাড়বাড়ন্ত সংসার তার। মরে হেজেও তেরটি প্রাণীর মুখে রোজ দুবেলা এখনও দুই মুষ্টি তুলে দিতে হয়। যোগীবরের কথা শুনে আবার মেঘ ঘনিয়ে আসে সৌরভির মুখে। সত্যিই আবার যদি ঠাঁইনাড়া হোতে হয়! আবার যদি বেনামদার বজ্জাতের দল রাতের অন্ধকারে এসে হামলা করে?

সূর্যশিয়রি পদ্মা, তা সে যতোই খরতর হোক—ভয় নেই। কিন্তু ওপরে কালীকৃষ্ণ মেঘ আর নীচে পদ্মা, —আকাশ কালো না পদ্মার জল কালো—সে ছবি অতি ভয়াবহ। অনেকক্ষণ কথা বোলছে না সৌরভি। যোগীবর মুখ তুলেই দেখে, থম থম কোরছে সৌরভির মুখ। গমগম কোরছে সে মুখে দুখিনী মানিনীর অভি-মান। কুড়ুলের হাতলটা চেপে ধরে দুমড়োনো পিট-টান টান কোরে সোজা হোয়ে দাঁড়ায় যোগীবর। বলে, "আকাশ-পাতাল ভাব কি তুমি অমন বইস্যা? এক সুতা দুই সুতা বাটালিতে যেই হাতে কাঠের উপুর ফুল তুলছি, সেই হাতে যখন আবার বাঁশল্যা ধরুম, তখন দেইখব্যা যোগীবর ছুতারের রুদ্ররূপ। ভাইবো না। ভবসংসার বাস্ত কইছি বুল্যা দুঃখু পাইও না। আমি থাকতে কেও তোমারে ঠাঁইনাড়া করতে আইবো না। যাও বেলা হইছে, ছড়াঝাঁট দিতে কও বউগোরে। এত বেলা তক্ ঘুমায় কোন সুবাদে সুবলের মা। সুবল্যার ঝাপে না চোট খাইছে জবর কাল রাইতে? ঠ্যাং-ই না কি হাত ভাঙছে?—যাও লাউমাচা তোমার আমি খারা কইর‍্যা দিমুঅনে। ও ফুলজালির এট্টাও ক্ষয়-ক্ষতি হইব না। যাও!"

যোগীবরের কথায় দেবতার প্রত্যাদেশ শোনে কানে যেন সৌরভি। মহা আশ্বাস পায় বুকে। মনে হয়, দু দশটা জুড়োনো কথায় অমঙ্গল দূরে দূরে ঠেলে ছন্নছাড়া সংসারের চারপাশে এই যে গণ্ডি দিয়ে দিল কারিগর, কোন দুষমন তা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারবে না কোনোদিন। ইতিপূর্বেকার সন্ত্রস্ত হতাশী মানুষটার কথা সৌরভির যেন আর মনেই থাকে না। মনে হয়, যোগীবর সব জানে, সব পারে। ফুলজালির আশ্বাসের কথাটা সৌরভির চোখে মুখে লাগে গঙ্গাজলের ছিটের মতো। প্রাণ হয় গঙ্গাযমুনা। গৃহকর্মে চলে যায় সৌরভি।

জুড়ে তেড়ে লাউমাচাটা আবার কি ভাবে খাড়া করা যেতে পারে, সেই কথা ভাবতে বসে যোগীবর। লতা-পাতায় ফুলজালিতে কেমন ছড়িয়ে আছে সৌরভি। প্রাণের আবেগ সঞ্চারিত হলো কারিগরের সমস্ত দেহ-মনে। ফুলজালিসমেত একটা ডগা কি এখন আর সে কাঠে কুঁদে বার কোরতে পারবে না? লতাগুল্মের অবসানে কি নিয়ে থাকবে সৌরভি? অশান্ত যোগীবর চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো নাতি সুবলকে, "সুবল্যা আমার যন্ত্রপাতির থইল্যাটা আনিস তো! অ সুবল! বউ!" সাড়া নেই। ব্যস্ত সবাই, কাজ আছে সংসারে প্রত্যেকেরই। যোগীবরের ডাকে উত্তর দেবার মতো অবকাশ নেই কারো। কিন্তু যোগীবর কারো কোন অবকাশের অপেক্ষা রাখে না। চেঁচিয়েই চলে আপন মনে, "সুবল নি আছিস—সুবল্যা কানে শুনিস না?" সাড়া শব্দ না পেয়ে যোগীবর নিজে গিয়েই নিয়ে আসে ছোট করাতখানা, আর ক'খানা পাকা সেগুন কাঠের টুকরো। ফুলজালিসমেত গোটা একটা সুপুষ্ট লাউডগা যে কি কোরে, কি ভাবে হবে এই কাঠে সে মন্ত্র জানে এক যোগীবর সূত্রধর। চুলে নেই তেল, তবু অভ্যাসমতো করাতখানা মাঝামাঝি মাথায় ফেলে ধনুকের মতো কোরে বাঁকায় একবার। তারপর করাতচলে গভীর অভিনিবেশে। সৌরভির সাধ-সোহাগের একটি গুল্মলতা জন্ম নেয় কাঠের কারুশিল্পী যোগীবর সূত্রধরের ধ্যানধারণায়;—উদ্ভিন্ন উদ্বাস্তুর পোড়ো ভিটে-মাটির জীবন্ত বাস্তুসাপ।

আমি থাকতে কেও তোমারে ঠাঁইনাড়া করতে আইবো না।

॥ দুই ॥

নিরন্নের অন্ন যতোই আন না কেন ছোটবড় মিলিয়ে তেরটি মুখ, পেট ভরানো বড় সহজ কথা নয়। বড়দের যতো না খোরাক ছোটগুলো খায় গাং শালিকের বাচচার মতো। যতো দেবে ততো খাবে, হাঁ কোরেই আছে ঠোঁঠ অহর্নিশ। সুবলের মা'র কোলজোড়া কিন্তু পেট খালি। তিন ওক্ত তিন থালা ভাতেও বাতাসীর ক্ষিদে যায় না। সুবলের বাপ গৌরহরির কামাই ভাল। —উটকো ধরা কাজ, আড়াই টাকা তিন টাকা রোজ হিসেবে পাওনা ছাড়াও মাসের মধ্যে চার ছ'টা ফুরোন কাজের আয়ও নেহাৎ কম নয় তার। তার ইচ্ছে বউ আর একটু ভালো থাক, ভাল পরুক। কিন্তু মেজো-ছেলে নরহরির বউ আটকুঁড়ে হোয়েও যখন থালা থালা ভাত টানে, সৌরভি তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরেও ভাতের হাঁড়িতে সরা চাপা দিতে পারে না। একদেহ এক রক্ত, একই গাছের বিভিন্ন ডালপালা, ছেঁটে ফেলো বোললেই তো আর কেটে ফেলা যায় না। তা ছাড়া বিধবা জা আর মেয়ে শেফালী আছে ঘাড়ের ওপর। ভাত কাপড়ের আশ্বাস দিয়ে যোগীবর নিজে তাদের উপযাচক হোয়ে নিয়ে এসেছে। এ দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। আসলে ব্যয় আছে আয় নেই, খাওয়াইয়া আছে তো খাদ্য নেই ঘরে, এই নিয়েই অশান্তি যতো সংসারে। বড় ছেলে গৌরহরি বলে "কই বলে ক্যাম্পে গিয়া থাকেন খুড়িমা আর শেফালী। ক্যাশ ডোলে পুরুষ মানুষের চরিত্তির যদি বা নষ্ট হয় মাইয়া মানুষের বেলায় সেই দোষ হইত না। বুড়ারে তুমি এটা বুঝাইয়া কও। আর টানতে পারি না সংসার।"

কষ্টের রোজগার, বোলতেই পারে এ কথা গৌরহরি। কিন্তু তাই বোলে এতো বড় কথা? দুঃখ পায় সৌরভি মনে মনে।

একদিন যায় দু'দিন যায়, সৌরভিকে আবার একদিন গৌরহরি কথাটা জোর দিয়ে বলে, "কি কইছিল্যা মা কথাটা বাবারে?"

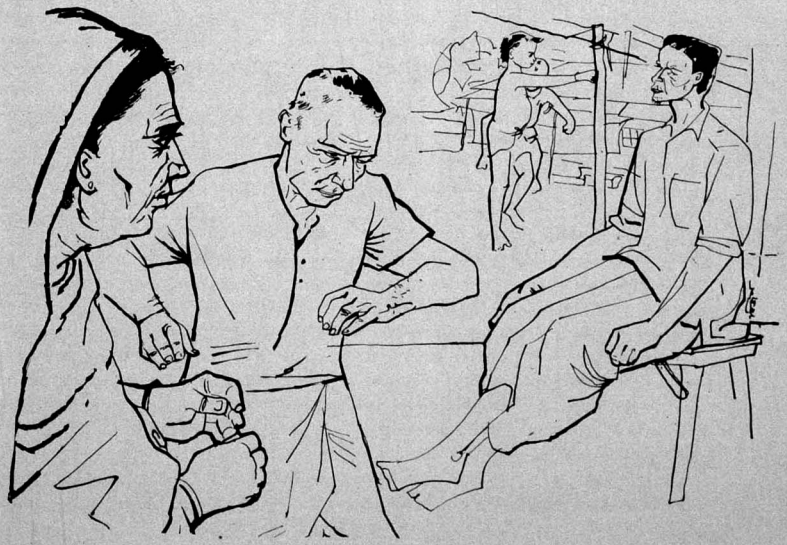

সৌরভি হাঁ না কোনো উত্তর করে না। ক্যাম্প মানে তো নির্বাসন। যোগীবরের কানে কোন সাহসে কথাটা তুলবে সৌরভি? বলে, "কইবার হইলে তো তুই নিজেই তো কইতে পারিস। নাইলে আমারে কইস আমি যাই ক্যাম্পে। শেফালিরে আমি পরান ধইর‍্যা ক্যাম্পে যাইতে দিমু না।"

"দিমু না তো দিও না। রাজতক্তে বসাইয়া খাওয়াও মাইয়ারে, আর আমরা ইদিকে উপোষ দিয়া মরি।" রাগতভাবে মায়ের মুখের ওপর মুখচোপা করে গৌরহরি।

একেই বলে ভাঙন। নতুন কোরে শিউরে ওঠে সৌরভি।

কথাটা সরাসরি যোগীবরের কানে না উঠলেও, পাকেচক্রে সে জানতে পারে। যোগীবর বুঝতে পারে সংসার এবার ছত্রভঙ্গ হবে। আর বেঁধে রাখা যাবে না। শেফালি কেন, হয়তো বা একদিন সৌরভিও চলে যাবে ক্যাম্পে। হয়তো বা কোনদিন পরে যদি তার দেখাও হয় যোগীবরের সঙ্গে, সৌরভিও যোগীবরকে চিনতে পারবে না। বেঁকি বাটালিটা তেরছা কোরে ধরে কাঠের হাতুড়িটা তাড়াতাড়ি ঠোকে যোগীবর। দারুময় একটি স্বপ্নলতিকা। যোগীবরের বিশ্বাস, জানপরিচয়ের এই একটি মাত্রই বন্ধন কোনদিন কোন-কালে তাদের বিচ্ছিন্ন হোতে দেবে না।

দিনরাত্রি থেমে যাবার কথা। সূর্য-চন্দ্রের ওঠবার-কথা নয়। তবু দিন আসে, রাত্রি হয়। লাজলজ্জা মানুষের না ভগবানের নেই, ঠিক বোঝা যায় না।

রাগ চণ্ডাল। গৌরহরি একদিন বাতগীর ফুঁসলেমিতে বিধবা খুড়িমার পিঠে বাটালি বসিয়ে দেয়। সুবল আবার 'মাইজ্যান কত্তামার' নয়নমনি,—সে ছুঁড়ে মারে গৌরহরির চোখে তুরপুন। ক্ষোভে দুঃখে যোগীবর সেদিন নিজের মাথার উপরেই আত্মঘাতী হবে বলে বাঁশলে তুলেছিল,—সৌরভি ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নেয় সেই বাঁশলে। কোনক্রমে রক্ষা হলো বিপর্যয়।

তারপরের দিনগুলো আসে শার্দুলের নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে। গৌরহরির রোজগারপাতি মাস তিনেকের মতো একেবারে বন্ধ। শেফালী গেল না ঠিকই কিন্তু নরহরি তার পরিবার সমেত চলে গেল ক্যাম্পে। এক রইলো সুবল। বড় জোর বছর বারো তেরো বছর বয়েস। বাপের চোখে তুরপুন মারার পর থেকে অন্তর্ধানির তার শেষ ছিল না। নিজে সে একজন মহাপাতকী—এই জ্ঞানে সে প্রথমটা বড় রাস্তায় বাস বা লরি চাপা পড়বার চেষ্টা কোরলো। তারপর আপনা থেকেই মতি বদলালো। ফিরি কোরে সে সংসারে দুপয়সা আনবার চেষ্টা কোরতে লাগলো। এক চক্ষুর বিনিময়ে সন্তানের সুমতি দেখে মনে মনে খুশী হলো গৌরহরি। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও তখন তার বারণ আছে ডাক্তারের। গৌর-হরি সুবলের হাতে হাত বুলিয়ে বোললে, "তর মায়েরে দেখিস। আর খুড়িমারে কইস বলে ঈশ্বর আচাঁধির খন মলম আইন্যা যেন পিঠে লাগায়। বাবায় আইস্যা কবিরাজের সব দেনা চুকাইয়া দিব।"

ডগা পাতার পাশে প্রচ্ছন্ন একটা ফুলজালির সম্ভাবনা কারু কাঠের ওপর তখনও অস্পষ্ট। সূক্ষ্ম পলকা কাজ, ধরে ধরে একটু একটু কোরে এগুতে হয়। সময় লাগে প্রচুর। সৌরভির আর সহ্য হয় না যোগীবরকে। সকাল বেলাই রণরঙ্গিনী। গোটা সর্বনাশের দায়িত্ব সে যোগীবরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কপাল চাপড়ে কাঁদতে বোসলো। ঘটির বাড়িতে কপাল ফুলিয়ে ফেলে তর্জনী শাসনে জবাবদিহি কোরতে লাগলো কারিগরকে, "ঘরের মধ্যে বইয়্যা বইয়্যা দিন রাইত খুটুস খুটুস, ক্যান দুই পা-ও আগাইয়া গিয়া তুমি দুইখান কামও কি কইর‍্যা আইতে পারো না? অহন সুবল্যা তোমারে খাওয়াইবো, সুবল্যা তোমারে পরাইবো, গলা দিয়া সেই ভাত তোমার নামে ক্যামনে বে-আক্কিলা কারিগর?"

একটা সূক্ষ্ম কাজ তখন যোগীবরের বাটালির মুখে। সৌরভির কথায় খেঁকিয়ে ওঠে, "বে-আক্কিলাই যদি কইলা তো আক্কেল আর আসে ক্যামনে কারিগরের? যাও সোর পাইড়ো না, তফাৎ যাও।"

সৌরভির তখন অনেক নালিশ। চোখের জলে হাউ-মাউ কোরে কেঁদে বলে, "আমার কচি দুধের বাল্য,—কাইল হাতুড়ির বাড়ি খাইয়া ডান হাতখান নুজা কইর‍্যা আনছে, তোমার এটা পরানে এটা কথা কয়না? আইজ থিক্যা কইলাম বলে তুমি সুবল্যার সাথে রোজ কামে যাইবা। বুড়া মানুষ, চলতে ফিরতে পারো না, কিন্তু তবো বাইর তোমার হওনই লাগবো। সুবল্যা তোমারে আগলাইবো, তুমি সুবল্যারে আগলাইবা। পোলাপানের নাগাল কাঠের উপুর তোমার ফুল ফুটাইতে হইব না। আমার জলজীয়ন্ত ফুলফলই যদি বেঘোরে বিপাকে ভুঁই-এ ঝইর‍্যা পড়ল তো তুমি বুড়্যা গাছ খারাইয়া

নিরন্নের অন্ন যতোই আন না কেন ছোট বড় মিলিয়ে তেরটি মুখ; পেট ভরানো সহজ নয়।

থাইক্যা আমার লাভ? সুবল্যার সাথে কাইল থিক্যা তুমি কামে যাইবা কইয়া থুইলাম।"

যতো কান্না ততো কথা সৌরভির, আর সব কথা তার কাছে। ভাবতে বসে যোগীবর। সৌরভির ব্যাথাটাও বুঝতে পারে সে নিঃসন্দেহে। বাটালি রেখে বলে, "বেশ আমি বাইর হইলে সুসার হয় সংসারে তো যামু কাইল থিক্যা কামে। তুমি আর তোমার গুণধর ছেইল্যারাই তো ঠেকাইছিল্যা আমারে। কইছিল্যা ব'লে মাথা ঘুইর‍্যা কবে মুখ থুবড়াইয়া পোড়বা রাস্তায়, তোমার আর শহর বাজারে কাম কাম কইর‍্যা ঘুইর‍্যা বেড়াইতে হইব না। কইছিলা না? তা যামুঅনে। ডরাই?"

শহরের রাস্তায় সাধারণ ফিরিওয়ালারা যেমন হেঁকে ডেকে কাজ সংগ্রহ ক'রে গৃহস্থের বাড়ীতে, ছুতারের বেসাতির সে রকম কোন হাঁকডাকের রেওয়াজ নেই। সুবল বলে, "চেঁচাইও না ডোক্কার পাইড়্যা, এমনেই আউগাও। দরকার যার হে বস্তা দেইখ্যাই ডাইক্যা নিব অনে।" যোগীবর কিন্তু সুবলের কথার কোন অর্থ খুঁজে পায় না। বলে, "ডাইক্যা নিব কি পিঠে আমার ল্যাখা আছে—সূত্রধর যায়। তিন দিনের বেপারী তুই দেখি ব্যাবসার কেতা সব জানছস বুঝঝস। চেঁচা, ক বলে ছুতার যায় ভাল ছুতার।—টেবুল বল, চেয়ার বল, খাট পালঙ্ক কি আলমারি ভাল, সব বানাই, সব সারাই। —চেঁচা।"

শহরের রাস্তায় চলতে ফিরতে ছুতোর সুবল অনেক দেখেছে। কিন্তু কাউকেই ঐ ধরনের হাঁক ডাক কোরতে দেখে নি। যোগীবরের কথাটা তার আদৌ পছন্দ হয় না। বলে, "চেঁচাইতে হয় তুমি চেঁচাও। আমি পারুম না।"

—"ক্যান পারবি না?"

—"আমার লজ্জা করে।"

—"লজ্জা করে!" সুবলের কথা শুনে হাসি পায় যোগীবরের। বলে, "সে সেন্ করবো মাইয়ামানষের। তুই না পুরুষ মানুষের বেটা? চেঁচা!" কথাটা বলে যোগীবর সুবলের অপেক্ষা না কোরে নিজেই হাঁক ছাড়ে, "কাঠের কামের ছুতার চাই বাবু!" শ্লেষ্মাজড়িত একটা বিশ্রী ফাটা গলা, অর্দ্ধেকটা তার শোনাই গেল না। সুবল হাসে মুখ আড়াল কোরে। যোগীবর হাঁক দেয়, "ছুতার যায় ছুতার চাই।"

সূত্রধরের কাজের যতোটুকু ইজ্জত ছিল, যোগীবর সেটা ধুলোয় লুটিয়ে দিল মনে হয় সুবলের। সে ভাবে, গৌরহরির সঙ্গেও তো কতো দিন সে কাজে কর্মে ঘুরেছে শহরে। কিন্তু বাবাকে সে কোনদিনও ঠাকুর্দার মতো এইরকম হাঁকডাক কোরতে শোনে নি। শুধু গৌরহরি কেন, কোন ছুতোর মিস্ত্রিই এইরকম জাত-ব্যবসায়ের বেইজ্জতি করে না পথেঘাটে। যোগীবরের কাণ্ড দেখে কান লাল হোয়ে ওঠে সুবলের। বলে, "থাক হইছে। ডাকলে অহন এমনেই ডাগবো মান্‌ষে। আর চেঁচাইও না।"

শহরের রাজপথে হরেক কিসিমের পথচারীদের মধ্যে দু'ইজন ছুতোর ঠাকুর্দার দিকে কৌতুক বিস্ময়ে তাকাতেই কথাটা আরও বিশেষভাবে মনে পড়লো সুবলের। যোগীবরের এই অব্যবসায়ীসুলভ আচরণে মনে মনে রুষ্ট হয় সুবল। আগে জানলে যোগীবরের সঙ্গে সে কাজেই বেরুত না। দূরত্ব রেখে একটু আগে আগে হাঁটে সুবল। এক মিস্ত্রী যেন আর এক মিস্ত্রীর সঙ্গে আসে নি।

বড় রাস্তা পার হোয়ে সুবলের হাত ধরে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে যোগীবর। বলে, "কাম আছে গলির মধ্যে। বড় রাস্তায় খালি গাড়ীঘোড়া।" সুবল বলে, "এইখানে আর ডাক পাইড়ো না।" তুই থানেক,"—নাতিকে একটা ধমক দিয়েই ফাটা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে যোগীবর, "ছুতার চাই ছুতার যায়।"

"ও মিস্ত্রী শোন!"—পাশের বাড়ীর জানলা থেকে ডেকে কথা কয় একটি বউ। "কাঠের কাজ কোরতে পারো? চেয়ারের পায়া? নতুন কোরে লাগাতে হবে কিন্তু! পারবে?" সুবলের হাত ধরে এগিয়ে যায় যোগীবর। বলে, "দেখান দেখি তাইলে জিনিস। না দ্যাখলে..."

"ঠিক এইরকম হবে কিন্তু,—পলকাটা।" পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় বৌ যোগীবরকে।

মেয়েটির আগ্রহ দেখে কাজটি হবে বোলেই মনে হয় যোগীবরের।

বাতিল আসবাবপত্র আর কাঠকুটোর পিঁজরাপোল থেকে টেনে বার কোরে আনা হয় একখানা পুরোনো চেয়ার। খানদানি জিনিস। দুই পুরুষ বোসে গেছে। বাকি একটা পায়া ঠিকমতো সারিয়ে নিতে পারলে আগামী দুইপুরুষও স্বচ্ছন্দে বোসতে পারবে।

কাজের মাত্রা পরিমাপ কোরে যোগীবর বলে 'পুরানো পায়াটা থাকলে কাজও কম হইত, দামও সুবিধার পড়ত। ভাঙ্গা পায়াটা কই গেছে?"

রাজপথে হরেক কিসিমের পথচারীদের মধ্যে দু'জন।

"কেন, নতুন পায়া কোরতে পারবে না তুমি?"

"পারুম না ক্যান—কাঠ আছে? জারুল জাম হইলে কিন্তু চলবো না মা। আসল সেগুন চাই। নাইলে যখন পালিশ পড়বো তখন দেইখ্যাব্যান জেল্লায় ফারাক হইছে। কইবেন বলে, বুড়া মিস্ত্রী ঠকাইয়া গেছে আমারে।"

"না ভাল কাঠ, সেগুনই দেবো। মজুরী কতো নেবে বলো?"

"মজুরী নেব,...পাঁচটা টাকা দিবেন। কমে পারুম না।"

"দশ টাকায় আজকাল নতুন চেয়ার হয় জানো?"

"জানি কিন্তু মানি না",—যোগীবর হেসেই উত্তর করে মেয়েটির কথার,—"পঞ্চাশ টাকা খর্চ করলেও আপনে এই চেয়ার আইজ পাইবেন না।"

সাধারণ ব্যাপার হলে অনেকদিন আগেই বাতিল কোরে দেওয়া হোতো এই চেয়ার। কিন্তু কতকগুলি সুখস্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে এই কাঠই হোয়েছে হঠাৎ সোনার সিংহাসন। সারাতেই হবে!

মেয়েটি বলে, "কিন্তু তাই বোলে পাঁচ টাকা?"

যোগীবর হেসে বলে, "পাঁচ পয়সায় অখুসী কইর‍্যাই কি খুশী হইতে পারবেন মা। পূর্ব পুরুষের একখানা জিনিস,—পাঁচ টাকা আমি খুব বেশী চাই নাই।"

প্রবীন পুরুষের মুখে পূর্বপুরুষের কথা শুনে খুশী হয় মেয়েটি। বলে, "জিনিস দেখে আমি দাম দেব কিন্তু। কাজ করো।"

কাজ চাই, পাওয়া গেল কাজ। কিন্তু যন্ত্রপাতির একান্তই অভাব। বিশেষ কোরে পল তোলার কাজে মুন্সীয়ানার চাইতে যন্ত্রপাতির প্রয়োজনই বেশি। যোগীবরের এক আছে হাতুড়ি বাটালি আর একখানা করাত। কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

—"নে খোলেক দেখি বস্তা। যন্ত্রপাতি আনছস্ কিছু?" সুবলকে প্রশ্ন করে যোগীবর। —"হাফ্‌রাউও বাটালি আছে?"

বস্তা ঘেঁটে একখানা বেঁকি বাটালির সন্ধান পাওয়া গেল। তুরপুণ আছে তবে ছড় নেই। র‍্যাঁদা একখানা যদি বা আছে, মরচে পড়ে জং ধরে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বোসলো যোগীবর।

সুবলের দুশ্চিন্তাও কম নয়। যন্ত্রপাতির অভাবে শেষকালে কি দুর্দিনের পাঁচটা টাকা হাতছাড়া হোয়ে যাবে? ঠাকুর্দার ওপর তার প্রগাঢ় বিশ্বাস। সে জানে বুড়ো কাঠে হাত ছোঁয়ালেই কাঠ কাদার মতো নরম হোয়ে যায়। যা খুশী তাই কোরতে পারে যোগীবর। কিন্তু যোগীবরের উৎকণ্ঠা সুবলকেও ভাবিয়ে তুললো। ভাঙা চেয়ার আর বৃদ্ধ যোগীবরকে সে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ কোরে বোললে, "কি, হইব না রে দাদা?"

দুই জ্রর মাঝখানে একটা হিসেব তখন দানা বেঁধে উঠেছে বুড়োর। বলে, "হইব মানে হওয়াতেই হইব। এক কাম কর। চার গণ্ডা পয়সার পালিশ কাগজ লইয়া আয় তুই মায়ের থন পয়সা লইয়া। আমি দেখি ইদিকে আলগাইয়া লই কাম। বইয়া থাকলে চলবো না।"

যোগীবরের কথামতো পালিশ কাগজ আনতে চলে যায় সুবল। ভাঙা চেয়ার আগলে বসে কারিগর। কড়া পড়া হাতে যন্ত্র মন্ত্রের মতো কাজ করে। বর্তুলাকারে ডোল উঠে আসে কাঠে অল্পক্ষণের মধ্যেই। সুবল এসে দেখে কাঠের কাজ শেষ কোরে পালিশ কাগজের মুখ চেয়ে বোসে আছে যোগীবর। যোগীবর বলে, "লাগা পালিশ কাগজ! একখানা কাম করতেই যদি আধবেলা গেল তো সারাদিনে কি রোজগার করতাম?"

বেলা বাজে আড়াইটে। এক কোট পালিশ লাগিয়ে চেয়ারখানা নিরীক্ষণ করে যোগীবর। আর সুবল দেখে যোগীবরের চিটে পেট পিঠে গিয়ে লেগেছে। মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে নাই কুণ্ডুলির কাছে। সুবল ভাবে কর্তামা যে কথায় কথায় 'পেটে নারায়ণ' কথাটা বলে, বিষয়টা ঠিকই।

এক কোট-এর পরই দুই কোট। রাজ-সিংহাসনের মতো ঝকমক করে চেয়ার। মেয়েটি খুব খুশী। যোগীবর চেয়ারখানার তারিফ কোরে বলে, "এই চেয়ারে যে বইব মা, ফকির হইলেও তারে দেখাইব রাজার নাগাল; আর যে রাজা তারে দেখাইব সম্রাট। আহা ঘরের শোভা! নেন্ উঠাইয়া থোন মা।"

নগদ বিদেয় করকরে পাঁচ টাকা। খুশী হয় যোগীবর। প্রথমেই মনে হয় তার সৌরভির কথা। অন্যদিন, অন্য বয়স হলে মনোহারী একটা কিছু হয়তো সওদা কোরে ফিরবার কথা মনে হোতো তার। আজ সে দিন নয়; বয়সও নেই।

গলির মোড়েই বড় রাস্তা। রাস্তার ওপরেই মিষ্টান্নের দোকান। কাচের শো কেসের ভেতরে হরেক রকমের মিষ্টান্ন পথচারীকে লোভাতুর কোরে তোলে। দাঁড়িয়ে পড়ে সুবল। গরম জিলিপি সে যে কতদিন খায় নি ভাবতেই পারে না। যোগীবর বলে, "ইচ্ছা করে তো বইয়া পর না? খাইয়া ল দুই চার খান!"

—"খাউক গিয়া।"

—"আবার খাউক ক্যান। আস্তারে কষ্ট দিতে নাই।"

—"না, আমার ইচ্ছা নাই।"

—"ইচ্ছা না করে আলাদা কথা। দ্যাখ.."

"না. চল"—, যোগীবরের হাত ধরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সুবল। এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ প্রশ্ন করে ঠাকুর্দাকে, "আচছা আস্তারে কষ্ট দিলে কি হয়রে দাদা! পাপ হয়?"

যোগীবর হেসে বলে "পাপ মানে? মহাপাপ হয়।"

—"তাইলে কিন্তু খাইলে পারতাম খান দুই।"

—"খোলসা কইস না ক্যান্? চল দেখি!"

—"তুমিও খাইও দুই খান।"

—"আচছা দেখুম অনে, চল।"

দুখানা দুখানা চারখানা কোরে আটখানা হলো জিলিপি। বেশ লাগে যোগীবরের। নিদস্ত-মুখে শিশুর মত জিব চোকলায়। সুবলের মুখও ভরে নি, পেটও ভরে নি। খালি ঠোঙা হাতে কোরে বোসে কাচের শো কেসের ভেতর সে জিলিপির পিরামিড দেখে। হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে। সে দেখে যোগীবরও জিলিপির দিকে তাকিয়ে আছে। হেসে ফেলে দুজনেই। যোগীবর বলে "আর দুইখান কইর‍্যা লওন যাক।" সুবলের মতামতের অপেক্ষা না কোরেই যোগীবর ফরমায়েস করে, "দুই দুইখান দিবেন তো!"

রসাল মুখ মিষ্টি থাকতে থাকতে এক ঘটি জলে পিপাসার নিবৃত্তি করে বৃদ্ধ। পরম আহ্লাদে মুখখানা তার হাসিতে ভরে যায়। সুবলকে সমঝে দিয়ে বলে, "বাড়ীতে যাইয়া আবার কইস না কিন্তু। বাদল আবার চিল্লাইতে থাকবো।"

"না কমু না," আশ্বাস দেয় সুবল।

দিনের বাকি অধ্যায়টুকু শুধু হয়রানি। হেঁকে ডেকে আর একটা কাজও পাওয়া গেল না। সুবল বলে, "ছুতারের কামের সময় গেছে রে দাদা, আর কেউ ডাকতো না আমাগো আইজ, চল বাড়ী যাই।" যোগীবরও পথশ্রান্ত। যন্ত্রপাতির চাইতে শরীরের ভাবনাই তার বেশি মনে হয়। সুবলের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, "যাক তবো সের পাঁচেক চাউলের ব্যবস্থা হইল।"

অস্তশেষ পশ্চিম আকাশের শেষ আলোটুকু সৌরভির লাউ মাচার ওপর ঢেলে পড়েছে নিঃশেষে। সৌরভি শুকনো ডাল হাতে নতুন লাউজালির সংখ্যা গুনে দেখছে। পেছন থেকে হঠাৎ সুবল এসে আঙুল দেখিয়ে গুনতে আরম্ভ করে, "বারো, তের, চোদ্দ, পনোরো..।"

সঙ্গে সঙ্গে খুরি কেটে হাউ মাউ কোরে ওঠে সৌরভি, "আইস্যাই নতুন জালিগুলারে খাইয়া রাখলি তো! ভরসন্ধ্যায় কি আক্কেলে তুই গাছের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইলি? অর এট্যাও তো বাড়বো না। ব্যাবাকটি ঝইর‍্যা যাইবো। শিগগির হাত কামড়া, দাঁতে কাট আঙুল।" আঙুল দিয়ে দেখালে কি দোষে যে ফুলজালি নষ্ট হবে কিছুতেই ভেবে পায় না সুবল। তবু সৌরভির মনতুষ্টির জন্যে সে দাঁতে আঙুল কাটে। সৌরভির কিন্তু তবু রাগ পড়ে না। বলে, "ঘোরন ঘারন আসা আর যাওয়া, এট্যা পয়সার মুরাদ নাই, লাউডগাই তো বাঁচাইয়া রাখছ।—ফলন হইলে তরাই খাইয়া বাঁচবি।"

যোগীবর সৌরভির কথার যথার্থ বোঝে। সুবলের উপর কৃত্রিম রোষ প্রকাশ কোরে সৌরভির দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা করে। চালের পোঁটলাটা সৌরভির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, "কইছে না বলে, গরু;—গরু না হইলে আর লাউ মাচার দিকে আঙুলের খোঁচা দেখায়?" গলা নামিয়ে বলে, "সের পাঁচেক চাউল আছিল। বেশ সরেশ চাউল। তোমার সেই কালাজিরা আর কাঁচামরিচ ফোড়ন দিয়া লাউ ডোগার ঝোল আর এই চাউলের ভাত, —কি কইস সুবল্যা?" আনন্দের আতিশয্যে সুবল বলে ওঠে, "জিলাপি ফালাইয়া খাইতে হয়। যোগীবর প্রথমটা একটু থতমত খেয়েই সুবলকে ধমক দিয়ে বলে ওঠে "আরে থো ফালাইয়া তোর মিষ্টিমণ্ডা। কিসে আর কিসে। তবু 'জিলাপি' কথাটার উল্লেখ সৌরভির কানে খচ খচ কোরে বেঁধে। সুবল আর যোগীবরের মুখের দিকে বারবার নিরীক্ষণ কোরে বলে, "অ' তাইলে বুঝি তোমরা জিলাপি খাইয়া আইছ?" "ছেউ ছেউ," অশ্রদ্ধায় মুখ ঝামটা দেয় যোগীবর। বলে "জিলাপিও মানুষে খায়? পাগল হইছ। যাও যা কইলাম তোমারে, কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিয়া.." যোগীবরের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে সৌরভি একগাল হেসে বলে "লাউ ডোগার ঝোল, নাকি? তো আচছা!"

চালের পোঁটলা নিয়ে চলে যায় সৌরভি। যোগীবর

সুবলের মুখটা ঠোনা দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়। বলে, "এমন সব কাম করস না তুই!—কথার মধ্যে কথা নাই, জিলাপি; আরে জিলাপির কথাটা আইল কেমনে। না তর লগে আর মিঠাই-এর দোকানে যাওয়া হইত না। কই নাই বলে বাড়ী গিয়া কইস না কথাটা?"

সুবল বোকার মত হেসে বলে, "কত্তামা ধরতে পারে নাই দাদা।"

—"না ধরতে পারে নাই। অর বুদ্ধি পাতায় পাতায়।" পরে একগাল হেসে বলে, "ঐ যে ফোড়ন দিয়া লাউ ডোগার ঝোলের কথা কইছি, খুব খুশী বুড়ী।"

সৌরভির কথা বলতে গিয়ে কেমন একটু আনমনা হোয়ে হাসি হাসি মুখ কোরে থাকে যোগীবর। বলে, "মনটা সরল তো..!"

সুবল বুড়ো যোগীবরের আর সব বাতিকের মানে পরিষ্কার বুঝতে পারে। এক বুঝতে পারে না, যোগীবর যখন হঠাৎ কত্তামার কথার উল্লেখে বোকার মতো হাসে এইরকম। প্রবীন মানুষটার মগজে এক রত্তি বুদ্ধি আছে বোলেও তখন মনে হয় না সুবলের। কত্তামার মতোই সুবল দেখে তখন যোগীবর ও লাউগাছের ফুলজালির মধ্যে যেন কিসের অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছে। সুবল আছে কি নেই, তাই খেয়াল নেই বৃদ্ধের। হাসিটার জন্যে মনে হয় আরও দূরে, অনেক দূরে চলে গেছে যোগীবর কত্তামার লাউগাছের ফুলজালি ডগা পাতা দেখতে দেখতে।

প্রশ্রয়ের যেখানে সীমা নেই বাধাবাধি কড়াকড়িটা বোধহয় সেইখানেই বেশি। প্রতিহিংসার উলোটা রূপটাই হয়তো ভালবাসা। ভালোবাসাই ঘা খেলে হয় হিংস্র হিংসা। কিন্তু এমনও সংসারে হয় কোনো কোনো সময়, যখন মনে হয় ভালোবাসাই প্রতিহিংসা। ভালোবাসতে বাসতে ভালোবাসা যখন সব নিল সব খেল তখন ভালোবাসাই ভালোবাসাকে গিলতে থাকলো। সাংঘাতিক একটা অন্তর্বিরোধ। অবক্ষয় আর রক্তারক্তির পর রইলো যেন একটা অভিশপ্ত জটকুণ্ডলী—ভালোবাসারই প্রেতরূপ।

আজ দেহ একেবারেই অশক্ত। নলায় নয়, হাড়-পাঁজড়ার ভেতরে প্রাণই অস্থির। বোসে বোসেই হাঁপিয়ে উঠতে হোচ্ছে। হাতের তালু, কপাল, থেকে থেকে ঘেমে উঠছে। শুকিয়ে যাচ্ছে গলা। দৃষ্টি অস্বচ্ছ বরাবরই, আজ আরও একটু বিভ্রান্ত। দেহ-মনের একটা অদ্ভুত অবস্থা যাচ্ছে গতকাল থেকেই। উপরোউপরি পাঁচ দিন রোদ বৃষ্টি মাথায় কোরে শহর প্রদক্ষিণ করা হোয়েছে। শরীর যন্ত্র। একটু বিকল হোয়ে পড়েছে। বোসে খাবার সময় না। তবু কাল সারাটা দিন বোসে গেছে। আজও বেরোতে পারবে বোলে মনে হোচ্ছে না। কিন্তু তবু বেরোতে হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে শরীর উপেক্ষা কোরেই বেরোতে হবে। সৌরভি বোলেছে, "লাস হইয়া কেন না ফের, পোলাপানের মুখ চাইয়া বইয়া তোমারে আমি কিছুতেই থাকতে দিমু না। তুমি অন্য আইনা দিবা, তয় এরা দুগা মুখে দিব। এতদিন কই নাই। চইলা গেছে একরকম কইরা। কিন্তু আজ তোমারে আমি উত্যক্ত করুম। মানুষে যদি কয়ও বলে পতি ঘাতিনী সতী হইবি নাকি লো তুই শেষকালে,...বুড়ারে পাঠাইস না যেন কামে, তো আমি কমু তুমি কামে যাও। গতরে খাইট্যা পার, ভিক্ মাইঙ্গা পার, অন্ন তোমারে যোগাইতেই হইব। আজ আমি নিরুপায় বুইলা তোমারও উপায় নাই। আইজ আমি ডরাইছি কারিগর। বুকের মধ্যে জ্বইলা যায় আমার, আমি তোমারে নিশ্চিন্ত থাকতে দিমু না। কি মানুষ, কি দেবতা, আমার কথা কেউ শোনে না গো। তাই তোমারে আমি শুনতে কই আমার কথা।"

শুয়ে ছিল। উঠে বোসলো যোগীবর। সুবলকে ডেকে বোললে, "কামে বার হওনের আগে নিতাইচাঁদরে একবার ডাকিস তো সুবল্যা। আজ আমি নিতাইচাঁদের সঙ্গ নিমু। ডাক নিতাইচাঁদরে তাড়াতাড়ি।"

মোড়ল মাতব্বরের পরোয়ানা। না শুনে উপায় নেই। একটু পরেই সুবলের সঙ্গে নিতাইচাঁদ এসে হাজির।

—"কি কয়েন মিস্ত্রী।"

রক্তনেত্র তুলে ধরে যোগীবর নিতাইচাঁদের দিকে। বলে, "কামে যাইস্?"

—"হ।"

—"কেমুন কাম? রোজা না ফুরান?"

—"ফুরান কাম মিস্ত্রী। পেরথমে তো আন্দাজ পাই নাই। এখন একেবারে গলায় ঠেকেছে।"

—"ক্যান?"

—"আরে তিন ছয় মাপের দশ ডজন খাট, কারিগর নিছি আষ্টিজনা, তবো দ্যাখ সাতদিন টায়েমের চারদিন অন্ত হইয়া গেল এখনও পাঁচ ডজন খাট নামাইতে পারলাম না। বিশ তারিখের মধ্যে ডেলিভারি দিতে না পারলে ব্যাবাকই বাতিল। লোকসানডা অনুমান করছো।"

—"খুবই সমস্যা।"

—"মহা সমস্যা মিস্তরি কি করি কওচেন দেহি।"

—"পাঁচডজনও তো নামে নাই কইলি।"

—"খান পঞ্চাশেক নামছে।"

—"অহনও অর্দ্ধেকের বেশী।"

—"ঘাটখান তো বটেই! হইব কও?"

—"কেমনে কই! পারে এক বিশ্বকর্মা।"

—"এমুন একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ছি না!"

—"এক কাম কর।"

—"কও।"

—"আমারে নে।"

—"তুমি...অন্তর ধরলে তো তোমারেই জানি এক বিশ্বকর্ম্মা,—যাইবা মিস্তরি আমার লগে?"

—"যামু।"

—"দেহ ঠিক আছে?"

—"আছে! আর এক্কেরেই বেযুত হইয়া পড়ে তো কাছাকাছিই তো থাকুম, একখানা খাটে না হয় উঠাইয়া দিস হরিবোল দিয়া। কাম যা দিমু তাইতে একখান খাটের দাম অন্ততঃ মজুরীতে উশুল কইর‍্যা দিয়া যামু।"

এমনিতেই জিজ্ঞাসাবাদ করে না বোলে একটু কুণ্ঠিত হোয়ে ছিল নিতাইচাঁদ। যোগীবরের কথা শুনে দুঃখ হলো তার। তবু কথায় সে কিছু প্রকাশ কোরলো না। বোললো, "বড় বাজে কথা কও তুমি মিস্তরি। কইলাম না মরনেও সময় নাই অহন। এক মরতে পার ফুরান কাম শেষ হইলে। তুমি আগে গেলে আমার লাভ?"

সংসারে লাভ লোকসানের হিসেব যোগীবরের ঠিক মাথায় আসে না আজও। হেসে বলে, "লাভ না হয় লোকসান করুম না। চল দেখি।" হাসিমুখে যন্ত্রপাতির থলেটা কাঁধে তুলে নেয় যোগীবর। নিতাইচাঁদ হাত কাড়াকাড়ি কোরে নিজেই বোঝাটা তুলে নেয়। বলে, "তুমি যাইবা আমার কামে এই না কত! আর বোঝা টানতে হইব না। দায়টা যদি উদ্ধার কইর‍্যা দিবার পার না মিস্তরি, তো তোমারে আমি এই আস্তর ছুঁইয়া কইলাম, খুশী কইর‍্যা দিমু। পরে কইবা যে হেঁ, কথা একখান কইছিল নিতাইচাঁদ। অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে অঙ্গীকার।"

মনে মনে ভারী খুশী হয় যোগীবর। নিতাইচাঁদের হাত ধরে মিনতি করে বলে, "এট্টা কথা কই।"

—"নিশ্চয় কইবা।"

—"থাকে তো গোটা দুই ট্যাহা দিয়া যা তর আজিমার হাতে। আমার কথা কিন্তু কিছু কইস না। জিগাইলে কইস কামে গেছে মিস্তরি। আমি আউগাইয়া গেলাম বস্তা লইয়া।"

ভুতেরই বোঝা। অথচ প্রয়োজনেও কোন ভগবান সেই বোঝা বয় না। বইতে এক যোগীবরকেই টানতে হয় সেই বোঝা। টপ টপ কোরে জল পড়ে বুড়োর দুচোখ বেয়ে। শারীরিক কষ্ট তো আছেই। কিন্তু সৌরভির কথায় যে এতো জ্বালা, ভাবতেই পারে না যোগীবর। আজ যেন দেহটাই একটা লাঠি। ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আরেক যোগীবর সেই লাঠিতে।

॥ তিন ॥

ঠিক পার্টনার বোলতে যা বোঝায়, নিতাইচাঁদ কিন্তু সে রকম একটা কিছু নয় এই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফার্নিচারের দোকানে। তবে সাত জায়গা ঘুরে সে যা কাজ জোগাড় কোরে আনে ফার্মে, সেই কাজের ওপর নিতাইচাঁদ বড় জোর একটা কমিশন পায় মাত্র। গোবিন্দ পোদ্দারই দোকানের একমাত্র স্বত্তাধিকারী। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড খাট, পালং, সোফা সেট, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি ছাড়া ভাঙা বাথ-টাব, ফাটা বেসিন, পেতলের ফ্রেমে বাঁধাই করা বড় বড় ল্যাণ্ডস্কেপ, চাইনীজ ভাস, টুকিটাকি 'কিউরিও'—রাজ্যের জিনিস জড়ো কোরে এক সাম্রাজ্য গঠন কোরে বোসেছে পোদ্দার দেড় দুই কাঠা জুড়ে। শীততাপ ও বর্ষায় হেজে মজে পচে যাচ্ছে জিনিস, পোদ্দারের ভ্রূক্ষেপ নেই। নতুন পুরোনো যা মাল পাও বাজারে সব এনে জমা করো দোকানে। সবুরে মেওয়া ফলবে ব্যবসায়।

প্রাচীন আসবাবের ওপর প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও নতুনকে বর্জন করেনি পোদ্দার। একশো বছরের পুরোনো বিশ হাত বাই ষোল হাত একখানা রানী পালঙ্ক যেমন আছে পোদ্দারের দোকানে, তেমনি পাবেন হাল আমলের সিঙ্গল্ বেড্ কট। ফোল্ড করা মিলিটারী কট, স্থানাভাবে ফুটপাতেও যে কট ডবল্ বেডের সুখসম্ভোগ দেবে, তাও পাবেন পোনেরো বিশে। ছিল

না এক আম জাম জারুলের সস্তার সুলভ সংস্করণ। আশপাশের ব্যবসাদাররা জারুল কাঠের সেক্রেটারিয়েট, আম কাঠের খাট কনসেসন রেটে বাজারে ছাড়ে, পোদ্দার কিন্তু ও সবে নেই। খদ্দের এলে বলে, "ব্যবসার নামে বেইজ্জতি করি না। পাবেন, পাশের দোকানে পাবেন। পাশের দোকানে যান।" হতকুচ্ছিৎ হওয়া সত্ত্বেও পোদ্দারের স্মিতমুখটা তখন বনেদীয়ানার জেল্লায় চকচক কোরে ওঠে। চুনোপুঁটি স্বল্পবিত্ত খরিদ্দার হলে দ্বিরুক্তি না কোরেই চলে যায় মাথা নিচু কোরে। কিন্তু একটু স্বচ্ছল অবস্থার মেজাজী খরিদ্দার হলেই পোদ্দারের পোদ্দারির চ্যালেঞ্জ কোরে বসে, "ঠিক আছে সেগুনেরই কি মাল আছে দেখাও দেখি। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড তো?"

ব্যস; আর রক্ষে নেই। লোক ডেকে হৈ চৈ কোরে একখানার জায়গায় তখন বিশখানা খাট দেখাবে পোদ্দার। খদ্দেরের মতের পছন্দ অনুযায়ী নিজের লোকজনের ওপরেই এমন তাড়া লাগাবে যে খদ্দেরের আর বক্তব্য কিছু থাকবে না। সব শেখানো পড়ানো ব্যাপার, —চল্লিশ পঞ্চাশের সিঙ্গল্ কট নিজের লোককে দিয়েই সত্তর আশী হাঁকিয়ে তেড়ে এক ধমক দেবে তাকেই। বোলবে, "সব জায়গায় ব্যবসা চলে জাদু? ব্যবসা কোরতে বসেছো! মারবো এক ঝাপড় কানপাট্টায়! সত্তর আশীর মাল তোকে কে দেখাতে বোলেছে? চার নম্বর লটের মাল নেই?"

—"আছে।"

—"কতো!"

—"পঞ্চাশ ঘাট।"

—"পঁয়ত্রিশ চল্লিশের ভেতরে নেই?"

—"আজ্ঞে না।"

—"কেন গুদোমে ছিল না?"

—"আজ্ঞে আনা হয় নি।"

—"আনা হয় নি? তার জন্যে খদ্দের ফিরে যাবে আমার? শালা কাজ দেখাচ্ছো?"

খদ্দেরের তখন মুখ বন্ধ। আপোষে ঝগড়ার এমন সার্থক অভিনয়ের প্যাঁচে তালকানা হোয়ে সে হয়তো তখন খাটের পালিশে হাত বোলাচ্ছে। পোদ্দার তখন এক অমায়িক হাসিমুখ কোরে খদ্দেরের কাছে এসে বোলবে, "কি করি বলুন স্যার?" দু চোখে ধরে রাখবে পোদ্দার খরিদ্দারকে যতক্ষণ না সে কথা বলে।

খদ্দেরের মনে তখন কিন্তু এক স্বার্থ ঘুর ঘুর কোরছে, "আশী টাকার খাটখানা পঞ্চাশের দরে নিতে পারি!" একটু কুণ্ঠিত হেসে খরিদ্দার বলে, "এই খাটখানাই যদি হয়তো দিয়ে দিন!"

হেলে দুলে গতোর পিছলে পিছলে এগিয়ে আসবে তখন পোদ্দার সেই হাসি মুখে কোরে। এসে টোকা মারবে খাটের কাঠে, আঙুল বোলাবে পালিশে। একটু পরে, যেন কতো না মুস্কিলে পড়েছে, এই ভাব দেখিয়ে আস্তে বোলবে, "কতো বলছেন?"

আশীর দাম পঞ্চাশ বোলতে খরিদ্দারও তখন একটু কুণ্ঠিত। তবু দাঁও ছাড়া নয়। খরিদ্দার বলে, "আবার কত! আমার বাজেট পঞ্চাশ।"

সঙ্গে সঙ্গে জিব কাটবে পোদ্দার। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে লোকজনকে বোলবে, "মাল তুলে ফেল।"

—"কি হলো?" খরিদ্দারও দাঁও ছাড়বার নয়।

—"না পঞ্চাশে হবে না স্যার।" ক্ষুণ্ণ হোয়ে বোলবে পোদ্দার।

—"আমার বাজেটটা তো ভাই আমি আগেই বলেছি।"

—"হ্যাঁ তা বলেছেন। তবে আশীর খাট পঞ্চাশ..."

—"সেকেণ্ড হ্যাণ্ড তো!"

—"পালিশ মারলেই ফার্স্ট হ্যাণ্ড! গুদোমে পচছে তো।—এই মালই যখন আবার ঘসামাজার পর চলে যাবে পার্ক ষ্ট্রীট তখন দেখবেন দেড়শো।"

—"দিয়ে দিন, এলাম আপনার দোকানে, একদিনের কারবার নয়..."

—"আজ্ঞে না পারবো না। আসুন!" সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে পোদ্দার। আগুন—তাও পোদ্দারই লাগায় পোড়া মুখে।

—"ফিরে যাবো?"

—"দেখুন শেষ একটা কথা বলি। কুলি খরচা বাবদ আর দশটা টাকা ধরে দেবেন। যান, নিয়ে যান খাট।" সঙ্গে সঙ্গে হাঁকে "—ওরে বার কোরে দে রে খাটখানা।"

দাঁও মারা হয় না আর দশ কবুল কোরলে। খরিদ্দার দারুণ হুশিয়ার। হাত নেড়ে বলে, "না, পারবো না।"

—"খুব পারবেন। দেখুন এ খাটের একটা আলাদা ইজ্জৎ আছে।"

—"জানি, কিন্তু আমার ইজ্জতের চাইতে বেশী হলে আর পারি কি কোরে বলুন।"

—"ঠিক আছে আর পাঁচটা টাকা ধরে দিন।"

— মাফ করুন।"

হাত জোড় কোরে ক্ষমা প্রার্থনা করে পোদ্দার। কিন্তু তবু না। পঞ্চাশোর্দ্ধে 'বারগেন' হবে না। দাঁও একটা মারতেই হবে। বড়াই কোরে বলা যাবে বাড়ীতে, একটা 'বারগেন'।

—"না ঐ পঞ্চাশ।"

—"মাথায় বাড়ি মারবেন না স্যার।"

—"না যা, বলিছি।"

—"দিন ছাড়ন, টাকা দিন।"

খরিদ্দার দর কোরে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার কোরে দেয় পোদ্দারের হাতে। পোদ্দার বলে, "না মশাই, ভেবেছিলুম আম জাম জারুলের কারবার কোরবো না। কিন্তু এই রেটে যদি ব্যবসা কোরতে হয় তো...।"

প্রতিনমস্কারান্তে খুশী হোয়ে খাট নিয়ে খরিদ্দার চলে গেলে হাতে মুখ নিয়ে ব্যবসার কথা ভাবতে বসে পোদ্দার। রইল কিছু, কিন্তু খরচ খরচা বাদ দিয়ে লাভের অঙ্কটা আর কতো!

পোদ্দার হিসেব কোষে একদিন দেশের কারিগর নিতাইচাঁদকে বলে, "ব্যবসা বাড়াতে হবে নিতাই। শুধু মেহগ্নি, শাল আর বার্মা সেগুনে চলবে না। লোকে এখন চাইছে চটকদার সস্তা জিনিষ। শাল সেগুনের জায়গায় জারুল আর কেরোসিন কাঠের ঠুনকো আসবাবই এখন চলবে বেশী। তুমি কারিগর আনাও। আমি ধান গাছের তক্তায় খাট বানিয়ে সস্তার তিন অবস্থা কোরে ছাড়বো। নিয়ে এসো যতো বাঁজা মাল—আম, জাম, জারুল। দেখছো না বাস্তত্যাগীর হিড়িক, ছেয়ে গেল রাস্তা ঘাট দেখতে দেখতে। সব যাবে ক্যাম্পে কলোনীতে। ক্যাশ ডোলের সামান্য টাকা থেকে আসবাব বাবদ আর, তোমার ক' পয়সা খরচা কোরবে ওরা। উঠছে গিয়ে সব মাঠে ঘাটে, নিদেন খাট একখানা ওদের কিনতেই হবে। অতএব চালাও করাত, মার সস্তা,—এক এক খানা খাট পাঁচ পাঁচ টাকা। কি?"

নিতাইচাঁদ কাঠের মিস্ত্রী। পূর্ববঙ্গে একদিন কাঠের গোলা ছিল। কপাল দোষে সব হারিয়েছে। এখন অবস্থা বৈগুন্যে দেশত্ব বিধায় পোদ্দারের শরণ নিয়ে বেলেঘাটা কাঠগোলায় হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। নিতাইচাঁদ ভেতরের কাজও করে বাইরের কাজও ধরে। দু তরফেই কিছু কিছু রোজগার হয়। চলে যায় ঘর সংসার। অনেক দিনের বিশ্বাসী লোক। পোদ্দারও যথেষ্ট ভালবাসে। সুতরাং পোদ্দার বোললো বোলেই লাভ-লোকসান না খতিয়ে দুম কোরে একটা উত্তর দিতে পারে না নিতাই। বলে, "পাঁচ টাকা দরে খাট দিবেন, পড়তা থাকবো?"

নিতাইচাঁদ টানে খাল বিলে খ্যাপলা জাল, আর গোবিন্দ পোদ্দার মাছ ধরে টানা জালে মাঝ দরিয়ায়। বলে, "পড়তা না ফেলে আর তুলছ কেমন করে পড়তা। ব্যবসার জাত মেরে তারপর পাঁতি দাও শালা সব সম্বন্ধিকে। তুমি কলোনী ঘুরে কারিগর যা পাও সব কব্জা কর। আমি দেখি এদিকে সুঁদরি গাছের জঙ্গলটা যদি জমা নিতে পারি। সব ব্যবসাদার দেখবে তখন তোমার হাতধরা। কি?

—"হেঁ তা যা কইছেন—কামে করতে পারলে তো হয়ই।"

—"দ্যাখ তুমি মিস্ত্রী দেখ। চল্লিশ পঞ্চাশ—বাঁধা মাস মাইনে,—বুঝতে পারলে?"

—"বিলক্ষন!"

—"আমি দেখি সুঁদরি কাঠের জঙ্গলটা...,"

"—আগে বনের রাজা ছিল বাঘ সিংহি, জ্যান্ত ছাগলেই কাজ হাসিল হোতো। এখন দ্যাখ সেখানেও সব ঘোষ, বোস, মিত্তির—পাঁঠা বা মোষ কিসে যে তৃপ্তি বুঝতেও পারি না সব সময়...। ভালো কথা, কেষ্টর মেয়েমানুষের খবর পেলে?"

—"ছেউ ছেউ ছেউ ছেউ। মানুষ একজন, কয়জনরে সামলাইবেন?"

পোদ্দার হাতের নুলোয় পাঁজরের মাংস চুলকে বলে, "আরে ভাই, আমি নিজে আর কি সামলাচ্ছি, কাকে সামলাচ্ছি। সব লেগে যাচ্ছে এই কাঠকুটো আর ফার্নিচারের দোকান সামলাতে। সে দুঃখের কথা আর বলি কেন।...হ্যাঁ শুনতে ভালই লাগে, আমার দোকান। কিন্তু এই দোকানও জানবে মেয়েমানুষের মতোই বেইমানী আর নেমকহারামী কোরে বোসে আছে,—দোকানের দেখি প্রত্যেকে,—সব শালা ভাগীদার।"

মদের ঘোরে কথা বলে বোলে সব কথাই যে গোবিন্দ পোদ্দারের অপলাপ নয়, সে কথা বোঝবার বুদ্ধি নিতাইচাঁদের সত্যিই নেই। পোদ্দারও এ কথা জানে। নইলে নিতাইচাঁদকে পুষতো না গোবিন্দ পোদ্দার এতোদিন।

॥ চার ॥

সুঁদরি কাঠের জঙ্গল যদিও বা জমা পায় নি গোবিন্দ পোদ্দার, পাঁচ টাকার সুলভ সংস্করণের খাটে কিন্তু সে ছেয়ে ফেলেছে শহর বাজার। পাঁচ থেকে পনোরো —যার যেমন সামর্থ্য।

কাঁচা কাঠের কারবার। 'ছ্যাও'-মার আর পেরেক ঠোক। সুলভ মূল্যে কাঠের খেলনা তুলে দাও খরিদ্দারের হাতে। মানুষের ঘর সংসারের হালও খেলাঘরের মতো। আজ আছে, কাল নেই। পুতুলের সংসারে পলকা খাটই ঠুনকো মানুষের মানায় ভালো।

কারবার গোবিন্দ পোদ্দারের কিন্তু ব্যবস্থাপনা করে নিতাইচাঁদ সূত্রধর। ফালতু কাঠের কাঁচা কারবারেই পাকা লাভ। পোদ্দার খুব খুশী নিতাইচাঁদের ওপর। নিতাইচাঁদই আনে, নিতাইচাঁদই কাটে,—বাজারের উঠতি পড়তি চাহিদা, তার দায়িত্বও নিতাইচাঁদের। পোদ্দার শুধু বোসে বোসে ষোল আনার পনেরো আনা বখরা মারে।

হঠাৎ একটা বড় কনট্রাক্ট; গোবিন্দ পোদ্দারই সংগ্রহ কোরে আনে। সামরিক ছাউনীতে একশো কুড়িখানা খাট চাই সাতদিনের মেয়াদে। কাঠ যেমন তেমন; খাট হলেই হলো। কারিগর চাই।

সুরু হলো কাজ।

গোবিন্দ পোদ্দারের কাঠগোলা সরগরম। দিনরাত কাজ চলছে। তক্তা নামছে, জোড় পড়ছে আর খাট উঠছে লরীতে। পোদ্দার শুধু মধ্যে মধ্যে এসে হাঁক ছাড়ে অকারণে, "হাত চালাও, কাজ তোল, এমন তেমন হলে জানবে লাটে উঠে যাবে কারবার—হুঁ হুঁ, সৈন্য-সামন্তের ব্যাপার! সব শ্রীঘর বাস।"

সাতদিনের চারদিন কেটে গেছে। অর্দ্ধেকের ওপর কাজ বাকি। পাঁচ দিনের দিন সকাল বেলা নিতাই-চাঁদ নিয়ে এল যোগীবর মিস্ত্রীকে। কাঠ, তক্তা আর কারিগরের সংখ্যা যোগীবরকে ভালো কোরে বুঝিয়ে দিয়ে মুখ চেয়ে রইল নিতাইচাঁদ যোগীবরের। যোগীবর কি বলে!

জোয়ান জোয়ান কারিগর থাকতে একজন বুড়ো মিস্ত্রীর সঙ্গে আবার এতো সলা পরামর্শের কি আছে? ক্ষুণ্ণ হলো আর সবাই। কিন্তু নিতাইচাঁদ সে দিকে ফিরেই তাকালো না। নিতাইচাঁদের তখন শিয়রে শমন। কারো কথা শোনবার মতো মেজাজ নেই তখন তার। যোগীবরকে বোললো, "যা দিয়া যা হয় এখন কও দেখি মিস্তরি। আর বেশী সময় হাতে নাই কিন্তুক।"

হিসেবের ব্যাপার। উৎপাদনের হার সময়ের নিক্তিতে মোটামুটি একটা হিসেব কোরে নিয়ে যোগীবর বোললো, "তবো পঁচিশ তিরিশ খান খাট কম পড়ত্যাছে। আরও কমপক্ষে পাঁচজন মিস্ত্রী আন।"

যোগীবরের কথা শুনে আর সব ছুতোর মিস্ত্রী তো ক্ষেপে লাল। ফুরোন কাজের পয়সায় ভাগ বসাতে আসবে বেফয়দা আরও পাঁচজন মিস্ত্রী—এ কেমন হিসেব? সাতদিনের কড়ারে কাজ বুঝে নিয়েছে তারা, তাদের একটা হিসেব নেই? বিব্রত বোধ করে নিতাইচাঁদ। কথাটা সে সময় থাকতে গোবিন্দ পোদ্দারের কানে তুললো। সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া বিপদকালে বুদ্ধিমানের কথা নয়।

বোললো বটে কথাটা নিতাইচাঁদ পোদ্দারকে, পোদ্দার কিন্তু খুশী হলো না। নিতাইচাঁদের ওপর খেঁকিয়ে উঠে বোললো, "ওরা বলছে পারবে, তুমি বলছ পারবে না; এ অবস্থায় আমি কার কথা শুনি? তোমার কথা মেনে নিতে হলে বাড়তি আরও পাঁচজন মিস্ত্রীকে কাজে লাগাতে হয়। তার খরচা আছে। টাকা কে দেবে? অবিশ্যি লাগলে কথা নেই। লোকসানের তুলনায় সে খরচা গায়ে লাগবে না। কিন্তু যদি দরকার না পড়ে? আর সব মিস্ত্রী কি তুমি বোলতে চাও ঘাস খেয়ে হিসেব দিয়েছিলো?"

গোবিন্দ পোদ্দার ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসাদারের মতোই কথা বলে। অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু যোগীবরের কথা, নিতাইচাঁদ জানে, ভুল হোতে পারে না কোনক্রমেই। বুক ঠুকে পোদ্দারকে বলে, "ইয়ার পর এমন তেমন হইলে আমার উপুর কিন্তু কোন দায়িত্ব থাকল না। আমি যার জোরে কথা কইছি তার নাগাল মিস্ত্রী এইখানে এক-জনও নাই। কত মিস্তরি কত কাঠ কি কাজে কতখানি কি পারে না পারে—এ তাঁর নখদর্পণে। আপনি তাঁরে চিনেন না।"

কাঠের ব্যাপারী গোবিন্দ পোদ্দার, ছুতোর মিস্ত্রী নিয়ে তার আজন্ম কারবার, কত কাঠে কি বৃত্তান্ত শুনতে যাবে সে নিতাইচাঁদের কাছে? বললো, "তা হলে তো বলতে হয় তিনি একজন বিশ্বকর্মা। লোকটাকে দেখাতে পারো?"

—"সাথে কইর‍্যাই আনছি মিস্তরিরে, ডাকুম?"

—"ডাকো। নাম কি?"

—"নাম কইলে কি চিনতে পারবেন!—নিবাস আছিল নবাব নগর,—ঢাকা। খারান, ডাকি মিস্তরিরে।—এই যে, আইসেন।"

নবাব নগরের নাম শুনে কৌতূহলী হয় পোদ্দার। বলে, "নবাব নগরের নবাব ছিল জানি তো এক যোগীবর সূত্রধর।"

পার্টিসনের সুইং ডোর ঠেলে ঘরে ঢোকে যোগীবর মিস্ত্রী। পোদ্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "আইজ্ঞা আমিই সেই যোগীবর সূত্রধর। আইজ আর সেই নবাব নাই। রাজ্য পাট সব হারাইয়া এইখানে আছি নিতান্তই নফর হইয়া। আপনে..."

পোদ্দার যেন ভূত দেখছে। বিস্মিত হোয়ে বলে, "তুমিই সেই যোগীবর মিস্ত্রী?"

যোগীবর হাসে। বলে, "নামেই তাইলে গণ্ডগোল আছিল।—যোগী তো কোনদিনও না, আর বর যা পাইছি হে তো চেহারায়ই মালুম করতে পারবেন।"

গদি থেকে নেমে আসে পোদ্দার। যোগীবরের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় কাঠগুদামের অন্ধকার গলিপথ দিয়ে। নিতাইচাঁদও সঙ্গে চলে।

স্তূপাকার কাঠের আসবাবপত্রের গলি ধরে টর্চ লাইটের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলে পোদ্দার। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় একটা জায়গায়। হাঁক ছাড়ে, "বাত্তি মার।"

আলো জ্বলে ওঠে কারুকাঠের রাজ্য নবাব নগরে। সেই রানী পালঙ্ক।

পোদ্দার বলে, "মিস্ত্রী চিনতে পারো?"...রানী পালঙ্ক যেন ঝাড়লণ্ঠন—চড়া পালিশের ওপর বৈদ্যুতিক আলোর বর্ণ বিচ্ছুরণে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ।

..."তোমার হাতের সেই রানী পালঙ্ক!"

যোগীবর কোনো কথা বলে না। গম্ভীর হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ কোরে। স্রষ্টার সামনে স্রষ্টা যেমন সুগম্ভীর।

পোদ্দার এতোদিন কাঠের আসবাবের গর্ব কোরতো। বোলতো, "দোকান সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হলে কি হবে, এমন স্টক তুমি আর কারো দোকানে পাবে না।" এখন বোলতে লাগলো কারিগরের কথা। যোগীবরের সঙ্গে তুলনা কোরে অন্য দোকানের মিস্ত্রীর নাম উল্লেখ কোরে বোলতে লাগলো, "হ্যাঁ চামচিকেও বোলতে হবে এখন পাখী!"

বাঁধা টাইমের নির্দিষ্ট কাজ। যন্ত্রপাতির বস্তা কাঁধে নিয়ে আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হোচ্ছে না—এর ভেতরেই ভগবানের একটা বিরাট অনুগ্রহ দেখতে পেল যোগীবর।

প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক,—দু পাঁচ দিন পরেই কাজের হিড়িকে পোদ্দার ভুলে গেল যোগীবরের কথা। কিন্তু যোগীবর গোবিন্দ পোদ্দারের নামকীর্তনে বিরত হলো না,—আহা যা কোরছে, যা দিচ্ছে, যে চোখে নিচ্ছে—বশংবদ দীনহীন প্রত্যুপকারীর শ্লাঘাক্ষীত উপকারীর প্রতি যেমন হয় আর কি!

এদিকে নিতাইচাঁদের খাটের টেণ্ডার সার্থকভাবে যোগীবরের তত্ত্বাবধানে সমাধা হোয়েছে। যোগীবর ঠিকই বোলেছিল। পাঁচ জনের জায়গায় উভয় পক্ষের কথামতো চারজন বাড়তি মিস্ত্রী সেই দিনই নিয়োগ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়। যোগীবরের কথাই ঠিক। সাতদিনের তখন মাত্র একদিন বাকি। অথচ কাজ বিস্তর পড়ে আছে। লাভ লোকসান না খতিয়ে পোদ্দার তখন বাড়তি মিস্ত্রী নিয়োগ কোরে রোজ হিসেবে। হাতে হাতে কাজ উঠে যায় নির্বিঘ্নে।

॥ পাঁচ ॥

কাজ উঠল ঠিকই, কিন্তু কারিগর পড়ে গেল।

অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে অসুস্থ হোয়ে পড়ল যোগীবর। নিতাইচাঁদের ওপর না, পোদ্দারের ওপর না, কারো ওপর না,—সব রাগ তার সৌরভির ওপর। অন্য লোকে কি খবর রাখতে যাবে যোগীবরের? পঞ্চপ্রাণ তার যে দিন অস্থির, স্থির হোয়ে দাঁড়াতে পারছে না, তাবৎ সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সৌরভি সে দিন বোললো কিনা তাকে, "লাস হইয়া কেন না ফের, পোলাপানের মুখ চাইয়া বইয়া তোমারে আমি থাকতে দিমু না।" ভুলবে সে কথা যোগীবর? সৌরভি তাকে বোলেছে, "গতোরে খাইট্যা পার, ভিক্ নাইগ্যা পার, অনু তোমারে যোগাইতেই হইব। আমি নিরুপায়, তোমারও উপায় নাই।" দেহের কষ্টে যতোটা নয়, অসুস্থ যোগীবরকে আচ্ছন্ন কোরে ফেলে আর এক দুঃখ, আর এক সংশয়।

সৌরভি বোলেছে, "আইজ আমি ডরাইছি কারিগর!" ভয় পেয়েছিল সৌরভি। তাই ভয়হারা হোতে হোয়েছিল যোগীবরকে। নিতাইচাঁদকে ভোরবেলা সুবলকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে কানে কানে বোলতে হোয়েছিল, "আমি কামে যামু নিতাই...জেঠিমার হাতে তুই অন্ততঃ দুগা ট্যাহা দিয়া যা...।" ফুলজালি সমেত সেই লাউ-ডগাটায় সেই থেকে সে বাটালি ধরতে পারে নি একদিন। কাঠের লতা, কাঠের ফুল, তবু এতদিনে সে লতা কি এতটুকু শুকোয় নি? অথচ সৌরভিকে এ কথা কিছু বলা যাবে না। কোন কথা বুঝবে না সৌরভি।

আজ তিনদিন কোন জ্ঞান নেই। জ্বর বিকারের সঙ্গে সঙ্গে চলছে একটা আচ্ছন্ন অবস্থা। সৌরভি, সুবল, বাদল, বাদলের মা বাতাসী, পোড়াকপালী শেফালী—সবাই বোসে আছে যোগীবরকে ঘিরে। কিন্তু যোগীবরের কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই আজ। আচ্ছন্নের ভাব কাটতেই আসে একটা উন্মাদনা। জ্বরবিকারে চেঁচিয়ে ওঠে রৈ রাই কোরে। চেঁচায় আর খালি বলে, "সুবল্যা আমার একসূতার বাটালিখানা চালান দে,...দ্যাখ দ্যাখ কাঠের লাউলতায় কেমন সুন্দর ফুলজালি ধরছে, তর জেঠিমার ডাইক্যা আইন্যা দেখা।"

সবাই বোঝে সবাই জানে জ্বরবিকার। কিন্তু সৌরভি জানে ফুলজালির বৃত্তান্ত। চোখের কোলে কাপড় টিপে সে জড়িয়ে ধরে কারিগরকে। অস্থির হয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বলে, "হ হ দেখছি, কাঠের ফুল, কাঠের জালি, তুমি আমারে বানাইয়া দিবা,—শোনছো,—এই যে—!" দুহাতে বুকের মাঝখানে চেপে ধরে অশান্ত যোগীবরকে শান্ত করে সৌরভি। নিস্পলক পাথরের চোখে স্থির হোয়ে তাকিয়ে থাকে যোগীবর সৌরভির মুখের পানে। কি দেখে সেই জানে। সৌরভি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "কি দ্যাখ কি? কাঠের ফুল, কাঠের জালি!—উঁ!...একটু ঘুমাও;—ঘাট!"

ধাক্কা আসে ধাক্কা যায়। চৈতন্য আর অচৈতন্যের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চারদিনের দিন একটু সুস্থির হলো যোগীবর। জ্বর আছে কিন্তু বিকারের ভাবটা কম। মানুষ চিনছে, কথা বোলছে একটু একটু।

সৌরভি কিন্তু যোগীবরকে ছেড়ে একমুহূর্ত নেই। তার স্নান নেই, খাওয়া নেই সাত দিন। বোলে বলে, "পূর্ণিমার গণ না কাটলে আমি মিস্তরিরে ফালাইয়া উঠুম না—তোমরা আমারে উঠতে কইও না।"

নিতাইচাঁদ খুব কোরছে। ডাক্তার ডাকা ওষুধপত্র আনা,—পয়সার কোন কার্পণ্য নেই। অবস্থা একটু ভালোর দিকে জেনে অন্তরঙ্গ দুচারজন মোড়ল মাতব্বর যোগীবরের সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছে। বল ভরসা যা দেবার এখনই দিতে হয়।

"আর বিপদ নাই। বিপদ কাইট্যা গেছে। বুঝতে পারছ। অহন সুস্থ হইয়া ওঠ ভগবানের আশীর্বাদে।"

যোগীবর হাত তুলে তাদের আশ্বাস দেয়। অস্ফুটে বলে "আইছ্যা। আইছ্যা!"

দিনমান একভাবে গেল। মাঝখানে বাতাসীর অনুরোধ উপরোধ সৌরভিকে একবার তুলে দেবার চেষ্টা হলো। কিন্তু দেখা গেল যোগীবর সৌরভির আঁচলের নুটো শক্ত কোরে চেপে ধরে আছে। দুচুমুঠ আলগা করবার চেষ্টা কোরতেই কটমট কোরে তাকালো যোগীবর সৌরভির দিকে। বুঝলো সৌরভি। উঠে যায়,—ইচ্ছা নয় যোগীবরের। বোললো, "না যামু না। কোনখানে যামু না। এইখানেই বইয়া থাকুম। তুমি একটু ঘুমাও।"

চুপ কোরেই ছিল। হঠাৎ দূরে কি যেন নিরীক্ষণ কোরতে লাগলো যোগীবর। নদীমাতৃক দেশে ঘর না হলে সাধারণ মানুষ সে চোখের ভাষা বুঝবে না। এ চোখের দৃষ্টি কোনখানে ব্যাহত নয়; অব্যাহত, প্রসারিত। বিরাট একটা জলবিস্তৃতির ওপর যেন তাকিয়ে আছে যোগীবর। কি যেন দেখছে।

সৌরভি এই চোখের ভাষা যেন কিছুটা আন্দাজ কোরতে পারে। মেঘনা আর পদ্মার বুকে পাহাড়ের মতো কালো কালো গয়নার নৌকাগুলো যখন আকাশ গঙ্গা থেকে মর্তের নদীর বুকে নেমে আসে, তখন এমনি কোরেই দেখতে হয় সেই নৌকো। আশা জাগে, আবার ভয়ও করে সৌরভির। যোগীবরের অস্থির চোখের দৃষ্টির সীমানা জুড়ে সৌরভির দুই কালো চোখের মণিও নাচানাচি করে কালো বিন্দুর মতো। আবার আকুল হয় সৌরভি, "কি হইছে? কি দ্যাখ? এই যে..."

যোগীবর আঙুল তোলে। ইঙ্গিতে যেন কি বোলতে চায়।

"কি? কি কইবা?" —যোগীবর ছ'টা আঙুল দেখায় সৌরভিকে, অস্ফুটে বলে, "ছয় কারিগর।"

স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন—ঠিক আন্দাজ কোরতে পারে না সৌরভি। গভীর মমতায় বলে, "তুমি একটু ঘুমাও তো।"

ঘুমের কথা শুনে চোখ বড় বড় কোরে তাকায় যোগীবর সৌরভির দিকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে কপালে মুহূর্তমধ্যে। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেয়। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "বদর বদর বদর বদর!...জোকার পাড়, শঙ্খ বাজাও, মাইয়া উঠাও কোলে,...আতসবাজীর ঘটা কি! ছয়জন মিস্তরি তার ছত্রিশ দফা অন্তর...।" যোগীবরের কথার সবটুকু প্রলাপ নয়। সৌরভির স্পষ্ট মনে পড়ে—গৌরহরি তখন তার কোলে,—জমিদার জগৎ-কিশোর রায়ের মেয়ের বিয়ে,—ছ'জন চীনে মিস্ত্রীকে আনা হলো নববরবধূর বাসরের পালঙ্ক তৈরি হবে...।

যোগীবরকে আশ্বস্ত কোরে বলে সৌরভি; "জানি জানি।—সেই যে মাটির দুই জালা ভইর‍্যা তুমি তত্ত্ব করলা বড় রায়বাবুরে।—ছয়জন চীনা মিস্ত্রী হিমসিম খাইয়া গেল, তবো কাঠের সিংহাসনে জোর ধরাইতে পারল না...ইজ্জত রাখলা তুমি দেশোয়ালী কাঠের মিস্ত্রীর ছয়জন কারিগররে চমক লাগাইয়া...তারা তোমারে কত ভাল কইল, সম্মান দিল,—বড় রায় খুশী হইয়া পত্তনী দিল তোমারে স্বগ্রামে, আমার সব মনে আছে গো..."

সৌরভির কথায় গল্প কাহিনীর সেই কাঠের উপাখ্যান অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে যোগীবরের চোখের সামনে। অপূর্ব এক আনন্দে ভাস্বর হোয়ে ওঠে তার চোখ মুখ। সৌরভি বোলে যায়,..."মা পদ্মার মুখ চাইয়া বইয়া আছি দুই দিন দুই রাইত, তিন দিনের দিন তুমি আইলা ভোর ভোর শমকালে...নাও দেইখ্যা গলুই-এর কাছে ছুইট্যা গেলাম আমি,—কাঠের মালাছড়া তুমি আমার হাতে দিয়া কইলা...।"

একটি সুখস্মৃতি, তবু কণ্ঠরোধ হোয়ে আসে সৌরভির। যোগীবরের বুকে মুখ লুকোয় সৌরভি। দূরের বিন্দু নিকটতর হয়। যোগীবরের চোখে এবার গোটা দৃশ্যটা সুস্পষ্ট হোয়ে ওঠে।

॥ ছয় ॥

বড় রায় জগৎকিশোরের মেয়ের বিয়ে। পালঙ্ক বানাতে হবে বাসর ঘরের। এমন পালঙ্ক বানাতে হবে যে রাতের বাসরের একটি মাত্র সোহাগ প্রদীপ শত দীপ জ্বালাবে সেই পালঙ্ক ঘিরে। সেই আলোতে বরবধূ পরিচয় হবে। একজন আর একজনকে দেখে বিমুগ্ধ হবে।

অফুরান ঐশ্বর্য বড় রায়ের। সুতরাং ইচ্ছার পূরণ কোরতেই হবে। আমলা গোমস্তারা সব মাথায় হাত দিয়ে বোসলো।—এ কি রকম ধারা আজগুবি ফরমায়েস! কথা একটা বোললেই হলো?

বিস্ময় প্রকাশ কোরে কথাটা যে বোললো, পরমুহূর্তেই সে-ই কিন্তু গম্ভীরমুখে ভাবতে লাগলো, কি দিয়ে কি করা যায়। অনেক সলা পরামর্শের পর কলকাতা থেকে ছ'জন চীনা মিস্ত্রী আনার পরিকল্পনা হলো। দিশি মিস্ত্রীকে দিয়ে এ সব কারু কাজ হবার নয়। সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো চিঠিপত্রে। নির্দিষ্ট দিনে আমলা গোমস্তা রওনা হোয়ে গেল কলকাতায় কারিগর আনতে।

বহুমূল্যে মিস্ত্রী এলো ছ'জন একমাস পর। সবাই জাতিতে চীনা। কাঠের কাজে চীনা মিস্ত্রীর দক্ষতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠল না। সাহেব কোম্পানী থেকে ভাড়া কোরে আনা হলো বোলে কারিগরের ইজ্জত গেল আরও বেড়ে। ধন্য ধন্য রব উঠলো চতুর্দিকে। বড়রায় জগৎ কিশোরের স্বীয় তত্ত্বাবধানে কাজ সুরু হলো শুভদিনে। কাঠের গায়ে স্বস্তিকা আর ফোঁটা চিহ্ন কেটে দিনক্ষণ দেখে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হলো, সে-ও ছোটোখাটো একটা রাজসূয় যজ্ঞ। তেল, সিঁদুর আর গুয়া পান ছুঁইয়ে তন্ত্রমন্ত্র সম্মতভাবে যন্ত্রপাতি শোধন করবার পর যথাযোগ্যভাবে সম্মানিত করা হলো কারিগরদের। এই সুবাদে কলকাতার সাহেব কোম্পানীর এক সাহেব এসে তিনদিন রাজার হালে থাকলো জগৎকিশোরের গেস্ট হয়ে। মদ খেলো প্রচুর আর বন্দুক ফুটিয়ে দাঁতালো শুয়োর মারলো তিনটে। বায়না-তেই যে ধুন্ধুমার কাণ্ড সুরু হলো, আসল বিয়েতে গাঁয়ের লোক ভাবলো না জানি স্বর্গই বুঝি মর্তধামে নামবে।

পালঙ্কের কাজ সুরু হলো এবার। তার মাপ জোপ এঞ্জিনিয়ারিং—সব আলাদা। রাষ্ট্র হলো, বাটালির ঘা'য়ে ঘা'য়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে চীনা মিস্ত্রী। খবর পেয়ে রাজদ্বারে ভেঙে পড়ল আপামর সাধারণ। বিশেষ কোরে দেশের সূত্রধর শ্রেণীর মধ্যে সবিশেষ চাঞ্চল্যের

সৃষ্টি হলো। কৌতুহলী কারিগর শ্রেণী ভেঙে পড়ল রাজবাড়ীতে,—কি কাজ, কেমন কাজ, যন্ত্র নাকি সব মন্ত্রের মতো কাজ কোরছে চীনাদের হাতে—এ দৃশ্য তাদের দেখতেই হবে। বড় রায়ের কাছে খবর গেল। কিন্তু ম্যানেজারের মারফৎ তিনি বোলে পাঠালেন যে ভিড় কোরলে কাজ পণ্ড হবে। সুতরাং তারা যেন ফিরে যায়। সাধারণ অশিক্ষিত গেঁয়ো লোকের সম্পর্কে কথাটা অবশ্য বড় রায় ঠিকই বললেন, কিন্তু সূত্রধর সম্প্রদায়ের বেলা তাঁর এ কথা খাটলো না। এক মিস্ত্রী আর এক মিস্ত্রীর কাজ দেখবে, শুনবে, ভাববে—এসব তো ভাল কথা। সূত্রধর শ্রেণীর কথা বয়ে নিয়ে ম্যানেজার আবার গেলেন ভেতর অন্তঃপুর। কিন্তু এবার আর বড় রায় নয়। স্বয়ং হেড মিস্ত্রীই আপত্তি কোরে বোসলো ম্যানেজারের প্রস্তাবে। বোললো, সব কাজেরই একটা স্বকীয়তা আছে, পদ্ধতি আছে। কাজ দেখলেই নবাব নগরের কারিগরদের কিছু উপকার হবে না। আর, তা ছাড়া কাজটা তো হাতের! —ফিকির ফন্দী কায়দা কানুনগুলো তারা অন্য মিস্ত্রীকে দেখিয়ে কাজ বেহাত হোতে দেবার ঝুঁকি নিতে পারে না। এক কথায়, পাছে কেউ চীনে মিস্ত্রীর কারিগরী বিদ্যা চুরি করে, সেই সংশয়ে রাজী হলো না চীনারা। ম্যানেজার যথারীতি পরিবেশন করে গেলেন খবরটা—না হবে না। চীনে মিস্ত্রীরা কেউ রাজী নয়। দু চারজন ভাল কারিগর অন্তরের আগ্রহ প্রকাশ কোরতে গিয়ে অযথা ধমক খেল ম্যানেজারের কটু ভাষায়। বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়। ম্যানেজার খেঁকিয়ে বোললো, "বানাও তো স্রেফ পিঁড়ি আর পিলসুজ। আরাম কোরে বসে একটু স্নান কোরবো, তাই কাঁঠাল কাঠের একখানা জলচৌকি আজ পর্যন্ত তৈরী কোরে দিতে পারলে না কেউ, তার আবার...। পালঙ্কের কাজের বোঝ কি? দুখানা মাত্তর হাত অথচ পাল্টাপাল্টি কোরে অন্তর চালাচ্ছে দেখগে বিশখানা। তোমরা তা চোখেও দ্যাখনি। কাজ দেখবো,—যাও যাও বাড়ী যাও। আগে বাটালি ধরতে শেখো তারপর চীনে মিস্ত্রীর কাজ দেখতে এসো—যাও তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।"

অপমান একার নয়। মাথা হেঁট হলো সেদিন তামাম পূর্ববঙ্গের সূত্রধর সম্প্রদায়ের। নবীন কারিগর যোগীবর সূত্রধরের বুকে ম্যানেজারের কথাগুলো বিঁধলো সড়কির মতো, এপাশ ওপাশ ফুঁড়ে। বললো, "মিস্ত্রী যদি মিস্তরীর সঙ্গে বেচাল কথা কয় তো তার আমি জবাব দিমু যন্তর দিয়া। কিন্তু আপনের তো দেখি আমি পিঁড়িতে বসনেরও যোগ্যতা নাই। রাজতক্তে বইয়া হুকুম ছাড়েন, দ্যাশের কারিগরের সম্মান রাইখ্যা কথা বলতে পারেন না?"

যোগীবরের জিভ সেইদিনই কাটা পড়তো যদি না বড় রায় এসে বাধা দিতেন ম্যানেজারকে। শুভকর্মানুষ্ঠানের আগেই একটা জ্যান্ত নরবলি—কাজটা ঠিক তাঁর মনঃপূত হোল না। যোগীবরকে তিনি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা কোরে বার কোরে দিলেন রাজবাড়ী থেকে। আর বল্লেন, যন্তর দিয়ে জবাব কোরবে বোলে সে যে চীনে মিস্ত্রীকে শাসিয়েছে, কথাটা তাঁর ভালোই লেগেছে। যোগীবর যদি পারে তো সেই ভাষায়ই যেন উত্তর দেয় ভবিষ্যতে। খুশী হবেন বড় রায়।

পদ্মার জল কতো গভীর সেই দিনই পরখ কোরে দেখতো যোগীবর যদি চীনা মিস্ত্রীদের তরফ থেকে এই চ্যালেঞ্জ না থাকতো। আর যদি না থাকতো সৌরভি। এক ফোঁটা জল পড়লো না যোগীবরের চোখে। দশদিন যোগীবরের দুই চোখ শুধু রক্তজবা হোয়ে রইল। যে রক্ত টুকু ক্ষরণ হোয়েছে ভেতরে ভেতরে, তার সবটুকু জমে গেছে চোখে। লজ্জা ও অপমানে হেঁট হোয়ে রইল কারিগরের মাথা।

কথা বোলতে গিয়ে বার বার ধমক খেয়ে ফিরে আসতে হয় সৌরভিকে। অকারণ চীৎকার করে আর বুক চাপড়ায় যোগীবর, জিনিস পত্তর ভাঙে, আর গজরায়। স্নান নেই, খেউরি নেই—এক মুখ দাড়ি নিয়ে দিনরাত বোসে থাকে চৌরিবাড়ী। যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে আর কথা বলে কাঠকুটোর সঙ্গে।

ভালমানুষ, অসুখ নেই বিসুখ নেই, আনমনে থাকে আর গাছগাছালির সঙ্গে কথা বলে অনর্গল—লোকে নানান কথা বলে। বলে, যোগীবরের মাথা খারাপ হোয়ে গেছে। কথা শুনে ধড়াস ধড়াস করে সৌরভির বুক। রাই-পাগলিনী সৌরভি পাল পার্বনে মানত করে, নীল'-এর পুজোয় সন্ন্যাসিনী হোয়ে কুল কাঁটায় বুকের রক্ত ঢালে, আর কলা গাছের খোলা ভাসায় পদ্মার জলে। চোখের জলে বুক ভাসে সৌরভির। কারিগরের নামে মানসিক ভাসিয়ে কড়জোড়ে মা পদ্মার দরবারে মানত করে। দুই আঁজলে জল ছিটিয়ে বলে,

"কাঠের ঘর কাঠের বাড়ী
সোয়ামী আমার শৈলসুরী
কারিগরের নামে কই শান্তর
যদি পাই বিশ্বকর্মার অন্তর।
যে বা শোনে যে বা মানে
মা জননীর নাম বাখানে
মনোস্কাম পূর্ণ হয়
আমার খোলা গঙ্গায় যায়।
গঙ্গার জল উলটি বয়
খোলার ডোঙ্গা কৈলাসে যায়
শিব শোনেন আমার শান্তর
কারিগরের হাতে আসে অন্তর।"

ওদিকে চৌরিঘরের দরজা বন্ধ। তিন মাসের মধ্যে মুখ দেখা যায় না যোগীবরের। কাঠ ধ্যান, কাঠ জ্ঞান—কাঠ আর যন্ত্রপাতি নিয়েই ডুবে আছে রাতদিন। কাটা জানালার জালি পথে ভাত জল যা পৌঁছে দেয় সৌরভি,—সেই তার কর্তব্য শেষ। খেলো কি না খেলো যোগীবর, দেখবার পর্যন্ত এক্তিয়ার নেই চোখে। কথা বোললে জবাব করে না, আর যদি জবাব করে তো বাটালি তুলে, "কথা আছে। পরে কমু কথা, গোল করিস না!"

ভয় পেয়ে সরে আসে সৌরভি। কি জানি যদি হাতের বাটালিই বসিয়ে দেয় রাগের মাথায় কারিগর। মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে দিনযাপন করে সৌরভি। আপন মনেই কাঁদে, আপন মনেই হাসে। কোন কোন দিন ভাবে, এমনি কোরে থাকতে থাকতে হয়তো সেও একদিন কারিগরের মতোই সুখদুঃখের পরপারে চলে যাবে।

পাগল হবে সেও। কিন্তু ভবিষ্যতে কারিগরের যদি আবার কোনদিন মতিস্থির হয়, তখন সৌরভিকে পাগল দেখে কারিগরের আবার কতো কষ্ট হবে, সে কথা ভেবে চোখের জল আঁচলে মুছে অনেক কষ্টে শান্ত করে মন। চুলের জট ছাড়িয়ে, খোঁপা বেঁধে, ধোওয়া কাপড় পরে লক্ষ্মীর শ্রী ফেরায় সেদিন সংসারে সৌরভি। ঝক ঝক করে ঘটিবাটি, তক্ তক্ করে উঠোন,—এবার মা পদ্মা কারিগরের মতি ফেরাবেন।

কাজেকর্মে সন্ধ্যা হয়। শ্রীহীন সংসারে শ্রীমতীর মন কোনদিন হু হু করে অকারণ। অভিমান মেঘ কোরে আসে মনে। ইচ্ছে হয়, কারিগরের সংসারে আগুন জেলে দিয়ে একদিকে ছুটে পালিয়ে যায়। বাপের বাড়ী না, শ্বশুর বাড়ী না—সে এক অন্য বাড়ী। আমতলা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ায় এক রাতে। অনেক রাতেও কেরোসিনের ডিবরি জ্বলছে কাঠগোলায়। কাজ কোরছে কারিগর একমনে। ডেকে ফেরায় নি কেউ, তবু সৌরভির মনে হলো, যোগীবর যেন তাকে শতকণ্ঠে ডাক দিল। ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ খট্ খট্—যন্ত্র চলছে যোগীবরের। ঠোঁট কামড়ে দরজায় সেদিন ঘা মারল শ্রীমতী—

—"দরজা খোল চে!"

—"কে!"

—"গলার স্বরে ঠাওর পাও না তুমি আমার কেমুন কারিগর গো?"

রানী পালঙ্কের কাজ প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে। টুকরো কারু কাঠের জোড় লাগিয়ে কারিগর দেখছিল হাতের কাজ কেমন হলো। এমন সময় ডাকলো সৌরভি।

—"বলি খুলবা না ফির‍্যা যামু?"

কাজ শেষ কোরবে কারিগর কিন্তু দেখে তা তারিফ কোরবে কারিগরনী। আনন্দে আত্মহারা হোয়ে দরজা খুলে দেয় যোগীবর।

—"ফির‍্যা যামু, ফিরবার দিলে তো!" কড়া পড়া পরুষ পাঞ্জায় ছিনিয়ে নেয় সৌরভিকে যোগীবর। বলে, "দ্যাখ, পালঙ্ক।"

পালিশের কাজ তখনও বাকি। তবু চমক লাগে কারিগরনীর চোখে। সৌরভির চোখে চোখ রেখে দেখে কারিগরের স্থির বিশ্বাস হয়, একটি প্রদীপ নিঃসন্দেহে সহস্র দীপ জ্বালাবে পালঙ্ক ঘিরে।

পালঙ্ক আর কারিগর—এক দৃষ্টিতে দুই ধরা যায় না। সৌরভি পালঙ্ক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় যোগীবরের দিকে। বলে,

—"রানী পালঙ্ক কও!"

—"রানী আবার আসলো কোনখান থিক্যা।"

—"আইলওে যদি চ'ক্ষে না পড়ে রাজার, তো পালঙ্কে শুইলে তো তারে রানী কইবা।"

গা এলিয়ে দেয় পালঙ্কে সৌরভি। শ্রীমতীর সুবাস নাকে মুখে লাগে কারিগরের। যোগীবর বলে, "রানী পালঙ্কই।" ঈর্ষাই বলে একে। হিংসা। তারাজ্বলা আকাশে নিশিথিনীর সহস্র নয়ন যখন এই দৃশ্য দেখে রাতজাগা চোখ-গেল পাখীর ডাকে জ্বলে যায় পুড়ে যায়।

কাঠ ধ্যান, কাঠ জ্ঞান—কাঠ আর যন্ত্রপাতি নিয়েই ডুবে আছে দিন-রাত।

আরও দিন পনেরো লাগলো পালিশ ধরাতে। নরম হাতে পালিশের টান জমে ভাল। সৌরভির হাতের প্রলেপ লেগে পালঙ্কে এলো এক আশ্চর্য দ্যুতি। ঝকঝক কোরতে লাগলো পালঙ্ক। কারিগর দেখলো, এক রানী পালঙ্কের পল খাঁজ কাঠে প্রতিফলিত হোয়ে শত রানীর বিভ্রান্ত সৃষ্টি কোরছে। কারিগর নিজেই তখন বিভ্রান্ত। সৌরভিকে হেসে শুধালো, "আইচ্ছা দ্যাখ, আমিই কি বানাইছিলাম এই পালঙ্ক?"

যোগীবরের কথা শুনে হাসতে হাসতে কাঠকুঠোর ওপর ছড়িয়ে গেল সৌরভি। "বললো, না, ঐ পাড়াওয়ালারা।"

ওদিকে এগিয়ে এসেছে বিয়ের রাত। জগৎ-কিশোরের মেয়ের বিবাহবাসরের পালঙ্কও শেষ হোয়ে এসেছে চীনা কারিগরের হাতে। অপূর্ব সব খোদাই-এর কারুকাজ। চোখ ফেরানো যায় না একবার দেখলে।

দেউড়ীর দরজা একদিন বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন খুলে দেওয়া হোয়েছে। কাতারে কাতারে রাজ্যের লোক জগৎকিশোরের মেয়ের বিয়েতে নজরানা দিতে গিয়ে পালঙ্ক দেখে আসছে। প্রশংসা ধরছে না তাদের মুখে। কঠিন কাঠের ওপর লোহার বাটালি নাকি কাজ কোরছে রং তুলির সৌকর্যে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টানে প্রকৃতির মাধুরিমা ছড়িয়ে দিয়েছে চীনা কারিগররা পালঙ্ক ছেয়ে।

যোগীবর শুনলো কথাটা। ভাল লাগলো, আবার লাগলোও না। ঈর্ষা কি? চোখ বুঁজে রূপসায়রে ডুব দিয়ে দেখলো একবার যোগীবর। বুঝলো, হ্যাঁ ঈর্ষাই। তবে কারিগর নয়, কারিগরী। এইখানে এসেই কি রকম ঠোক্কর আর চক্কর খাচ্ছে বোধটা। কারিগরীতে সে হার স্বীকার কোরবে না। কারিগর ছেড়ে কারিগরী নয়। কিন্তু বিরোধের ব্যাপারটা, যোগীবর স্পষ্ট বুঝতে পারে, কারিগরী নিয়েই। কারিগরীর অভিমান ত্যাগে কারিগরের সম্মান যায়। কারিগরীরও ইজ্জত থাকে না। এ কথা সত্যি না হলে তো রানী পালঙ্ক মিথ্যে হোয়ে যাবে। মিথ্যে হোয়ে যাবে সৌরভি। একটা দ্বন্দ্ব আছেই। প্রেম বড়, না প্রেমী বড়? কে তার উত্তর দেবে?

ওদিকে পদ্মায় গণ এসেছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে কীর্তিনাশা। এই গণেই ভাসাতে হবে নৌকো। রানী পালঙ্ক যাবে সে নৌকোয়।

যাত্রা ছিল প্রথম প্রহরে। মাঝি মাল্লা ডেকে রওনা হোতে হোতে দেরী হোয়ে গেল অনেকটা। নৌকো ছাড়লো রাত্রির তৃতীয় যামে। দড়িদড়া টানতে টানতে হাঁক ছাড়লো মাঝিরা, "বদর বদর বদর বদর...।"

পাঁজির নির্ঘন্ট মতো বরানুগমন ছিল আজ সন্ধ্যায়। কিন্তু বর এসেছে পরশ্ব দুপুর বেলা, চব্বিশ ঘন্টারও আগে। কারণ পদ্মার অবস্থা দেখে, বড় রায় আগে থাকতেই ব্যবস্থা কোরেছিলেন ব্যাপারটা। সুতরাং মহোৎসব সুরু হোয়ে গেছে দু'দিন আগে থাকতেই। বরযাত্রীদের সময়ক্ষেপনের জন্য যে বাইজীদের আসার কথা ছিল মাত্র এক রাত্রির মুজরোতে, চতুর্গুণ অর্থ দিয়ে তাদের দু'দিন আগে থাকতেই নিয়ে আসা হোয়েছে কলকাতা থেকে। আনন্দ উল্লাস আর হুল্লোড় যা চলেছে এখন ভেতরে! রাজবাড়ীর চৌহদ্দির বাইরে, বিশেষ কোরে পদ্মার বুকে আজ আর কোনো মাতামাতি নেই। আপাত নিস্তরঙ্গ জলমুকুরে আলো ঝলমল প্রাসাদের ছায়া ছবি মুখ দেখার মতো কোরে ধরে, চুপ কোরে আছে কীর্তিনাশা।

"বদর বদর বদর বদর"—এমন সময় ধ্বনি উঠলো পদ্মার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল কাঁশি আর সানাই-এর রোলারুলি। কেউ আসছে, বা কিছু আসছে, ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। কাচঘর থেকে দূরবীন দিয়ে দেখেও ঠিক আন্দাজ কোরতে পারলেন না বড় রায়। ম্যানেজারকে বললেন লোক পাঠাতে। পোদ্দার বা বসাক বাবুরা যদি কেউ হন তো সম্বর্দ্ধনায় যেন কোনো ত্রুটি না হয়। কলকাতা থেকে অতর্কিতে কিছু সাহেবসুবোরও আসবার কথা আছে; ম্যানেজারবাবু যেন খেয়াল রাখেন।

পাইক পেয়াদা নিয়ে এগিয়ে গেলেন ম্যানেজারবাবু ঘাটের দিকে। অপেক্ষা কোরতে লাগলেন বজরার।

ভাটার টান সুরু হোয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বুকে হিঁচড়ে কোঁচ খাওয়া বুড়ো কাতলার মতো কোনমতে ঘাটে এসে ভিড়ল নৌকো।

গণ্যমান্য অতিথি কেউ নয়। জমিদারেরই আশ্রিত একদল বশংবদ প্রজা। ভেট নিয়ে এসেছে বিয়েতে। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ম্যানেজারবাবু। শান বাঁধানো ঘাটে মুখোমুখি যোগীবরকে দেখেও যেন চিনতে পারলেন না তিনি।

পাইকদের ডেকে হুকুম দিলেন, "বজরা হটাও, ঘাট পরিষ্কার কর তাড়াতাড়ি।"

নিমন্ত্রণ ছিল না কোনো। সুতরাং উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানেরও প্রশ্ন নেই। জবাব দেবার কথা, জবাব সে পৌঁছে দিয়ে গেল আজ। রানী পালঙ্ক পাইক-বরকন্দাজদের হাতে তুলে দিয়ে বজরায় গিয়ে উঠলো যোগীবর। ভাটার টানে খালি বজরা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ওদিকে শুভ লগ্ন সমাগত। প্রজাপতি ঋষির মন্ত্রোচ্চার গান সুরু হোয়ে গিয়েছে। বর অপেক্ষা কোরছে বহু বিচিত্র পিঁড়িতে। কনে এলেই হৃদয় বিনিময় হবে, — যদিদং হৃদয়ং মম...।

বড় রায়ের মন ভাল নেই। কন্যা সম্প্রদানের তখনও দেরী আছে। অন্য মনে বিচরণ কোরছেন জগৎকিশোর মণ্ডপের বাইরে। বড় নরম হোয়ে আছে মনটা। কণকাঞ্জলি ঢেলে দিয়েই চিরতরে চলে যাবে মেয়ে? ব্যস, সব ঋণ শোধ হোয়ে গেল!

হল্লা আর হুল্লোড়—এখন একটু ভাটা পড়েছে। নাচগান বন্ধ। নৈষ্ঠিক আচার ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অনুসরণে বরযাত্রীরাও এখন একটু শোভন, শালীন। অপেক্ষাকৃত শান্ত—সুন্দর পরিবেশ। অপেক্ষা কোরছেন জগৎকিশোর। দেউড়ীর ভিতর দিয়ে পদ্মার দিকে তাকিয়ে আছেন চুপ কোরে। এমন সময়ে পাইক বরকন্দাজ আর একতারা গ্রামের তাবৎ সূত্রধর সম্প্রদায় রানী পালঙ্ক নিয়ে সিংহদ্বার অতিক্রম কোরে রাজবাড়ীতে এসে ঢুকলো। হট্টগোলে বিঘ্নিত হলো শান্তি। এগিয়ে গেলেন বড় রায়।

হ্যাঁ, উপঢৌকনই বটে। বিচিত্র কারুকাজ করা সুবৃহৎ এক পালঙ্ক, শ্যামারণ্যের শোভা বয়ে নিয়ে এসেছে। লতাগুল্ম, ফল, ফুল, পাখী—চুপ কোরে তাকিয়ে থাকলে যেন কুজনটিও শোনা যাবে। ঠিক এমন একখানি কারু পালঙ্কের কথাই তাঁর মনে ছিল বরাবর। মনেই ছিল কিন্তু প্রকাশ কোরতে পারেন নি কোনদিন ভাষায়। জগৎকিশোর বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হোয়ে চেয়ে রইলেন পালঙ্কের দিকে। আশ্চর্য, ভাষায় তিনি যে রূপ প্রকাশ কোরতে পারেন নি, শিল্পী সে অরূপ রূপ বাটালির ঘায়ে কাঠের বুকে ফুটিয়ে তুললো কি কোরে? সম্প্রদানের কথা বিস্মৃত হোয়ে তিনি শিল্পীর সন্ধান কোরতে লাগলেন। কে সে গুণী! কোথায় সে? আত্মহারা হোয়ে সন্ধান কোরতে লাগলেন জগৎকিশোর সেই দুর্লভ প্রতিভার।

বিবাহ মণ্ডপ উজাড় কোরে চারদিক থেকে ভেঙে পড়লো মানুষ। উচ্ছসিত প্রশংসায় মুখরিত হলো রাজবাড়ী। সবাই দেখলো সবাই বোললো, কাঠের এমন কারু কাজ তারা জীবনে কোনদিন প্রত্যক্ষ করে নি। বিস্ফারিত চোখ মেলে জগৎকিশোর দেখলেন, পালঙ্কের পলে, খাঁজে, কাঠে, প্রতিফলিত হোয়ে, এক দৃশ্য সহস্র দৃশ্যের বিভ্রম সৃষ্টি কোরছে। একটিমাত্র প্রদীপের আলো পালঙ্কের লতা, পাতা, ফুলে, বিচ্ছুরিত হোচ্ছে ঝাড়লণ্ঠনের গরিমায়।

সংবাদ পেয়ে এলো চীনা কারিগরের দল। দেখে শুনে পরখ কোরে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তারা স্তুতিবাদ কোরতে লাগলো কারিগরের। শুধু হেড মিস্ত্রী কোন কথা বোললো না। তার মনে শুধু একটা কথাই খচ খচ কোরে বিঁধতে লাগলো। সে যাকে চোর ঠাউরে দেখতে পর্যন্ত অনুমতি দেয়নি তাদের হাতের কাজ, সেই রূপচোর কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ না কোরেই উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছে তার যা ছিল সব কিছু। কারিগরের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না। ওয়াং লুং শুধু মাথা নত কোরলো কারিগরীর কাছে।

বড় রায় ইচ্ছা প্রকাশ কোরলেন, এই অচিন কারিগরের হাতের পালঙ্কে বাসর শয্যা রচনা কোরলেই খুশী হবেন তিনি। আর হেরে গিয়ে জিতে গেল ওয়াং লুং। বোললো, কাঠের ফুলপাতা মনের মতো কোরে সাজাতে পারি নি বোলে ভেব না বাসরের বিছানাটাও আমি সাজাতে পারবো না। একটা গোলাপ ফুল সে সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিল পালঙ্কের ছত্রীতে। হাসতে গিয়ে জল এলো প্রবীন চীনা কারিগর ওয়াং লুং-এর চোখে।

উৎসবময় বাসর রাতের অবসান হলো। এখন উষাকাল। পালঙ্কের বিভ্রান্ত সুন্দরী দেহমনের ক্লান্তি নিয়ে তখনও যেন ঘুমিয়ে আছে গোটা বাড়ীটায়। প্রাসাদের আনাচে কানাচে ঘুম। নিশিশেষে যে আলোটা জ্বলছে, তার চোখেও ঘুম। সব ঘুমুচ্ছে।

আরও কিছুকাল পর বড় একখানা সোনার পরাত কীর্তিনাশার পূর্বগর্ভ বিদীর্ণ কোরে চ'লকে ছ'লকে কেঁপে কেঁপে উঠবে দিগন্তে। তখন আবার সাড়া জাগবে রাজবাড়ীতে। রোলাক্কলি কোরে তখন আবার শানাই বাজবে, নহবৎ বাজবে। এখন ঘুম।

ঘুম নেই শুধু এক বড় রায়ের চোখে। সেই যে ভোররাতে একবার ছুটে গেছে তন্দ্রা আচমকা, তারপর আর ঘুমই আসেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনে শুধু সেই এক কথা, কে সে গুণী? কে সে কাঠের কারু কারীগর যে ইন্দ্রজাল বিছিয়ে দিয়ে গেলো দুই চোখে। শিয়রে কালো পাথরের গ্লাসে জল থাকতো। শয্যা-ত্যাগ কোরেই অভ্যাসমতো সেই এক গ্লাস জলপান কোরে তিনি কাছারীবাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। ম্যানেজার-বাবুকে ডেকে বল্লেন;—রানী পালঙ্কের কারিগরকে বিদেয় না দিয়ে মেয়ে জামাইকে অবধি রওনা করে দেওয়া যাবে না। সুতরাং সম্ভবমত তাড়াতাড়ি যদি রানী-পালঙ্কের কারিগরকে হাজির করা যায়, সব দিক দিয়ে মঙ্গল। বাবাজীবন নিজের হাতে কিছু সম্মানী বকশিষ কোরতে চান কারিগরকে।

বড়রায়ের সনির্বন্ধ মনোস্কামনা। সুতরাং সূর্যোদয়ের আগেই আটমাল্লার এক নৌকো নিয়ে রওনা হোয়ে গেলেন ম্যানেজারবাবু। সঙ্গে নিলেন চার পাঁচ জন বিশ্বস্ত অনুচর আর পাইক। মুখও চেনা, নামটিও জানা। শুধুমাত্র ব্যবধান এপার ওপার। যোগীবরকে ধরে নিয়ে আসতে আর কতোক্ষণ লাগবে? রওনা হোয়ে গেলেন ম্যানেজারবাবু তড়িঘড়ি।

ঘরের মানুষের যদি সংসারে মন না থাকে তো সে সংসারে লক্ষ্মী থাকে না। সব দিকেই অনাসৃষ্টি আর বিশৃঙ্খলা—একদিক বেঁধে তোলে তো অন্যদিক ভেসে ম'জে যায়। যোগীবর ব্যস্ত ছিল এতদিন রানী পালঙ্কের কাজে। সংসারের দিকে ফিরে তাকাবারও সে ফুরসুৎ পায়নি একদিন। আর সৌরভি তো মনে মনে একরকম ঠিক দিয়েই রেখেছিল যে সোয়ামীর তার একেবারে মাথা খারাপ হোয়ে গেছে, মাথার অসুখ মিস্ত্রীর আর কোনদিনও ভাল হবে না।

এতোদিন পর আজ সাতসকালে উঠে। সে না পদ্মার বুকে ডুব দিয়ে সবে মুক্তি স্নান কোরে এসেছে। তার খোলার ডোঙ্গা কৈলাসে গেছে,—তার মনের কথা জানতে পেরেছেন, জানতে পেরে যে সোয়ামী তাকেই সোয়ামী কোরে দেবতা আবার যোগীবরকেই মিলিয়ে দিয়েছেন সৌরভির ঠাঁই। সৌরভি জেনেছে পাগল না, ছাগল না, যে স্বামী তার সেই স্বামীই শিবের কৃপায় বহাল আছে;—পতি যে এক পরম গুরু সে তার এক যোগীবরই।

নানা কারণে মনটা আজ ভরে আছে সৌরভির। ভরে আছে সদ্য পড়া কলাকাঁদির মত। আড়াই হাত গাছটি; অথচ এক গণ ছেড়ে আর এক গণে নাকি সেই কাঁদি কলাগাছকেই ছাপিয়ে যাবে বাড়ের দিক দিয়ে। মাটির গভীরে যদি তখন গর্ত না কোরে দাণ্ড তুমি তো কাঁদিই নষ্ট। এই কাঁদি নেমে যাবে নাকি সরাসরি দু'তিন হাত মাটির গভীরে-ওপর নীচে তখন ছড়িয়ে পড়বে ফল সোনার ভারে, ছড়ায় ছড়ায়। কাঠের কাজ শেষ হোতেই সৌরভি হাত ধরে টেনে এনে বসিয়ে দিয়েছে যোগীবরকে এই সংসারের কাজে। গর্ত খুঁড়ে কলার কাঁদি নামাচ্ছে যোগীবর মাটির গভীরে।

সৌরভি বসে নেই। মোটা দুখানা বাঁশ কাঁচির মতো কোরে মাঝামাঝি বেঁধে মা-কলাগাছকে ঠেকা দিয়ে ধরেছে সৌরভি মাটির ওপর। আর দুই হাতে বুকে জাপটে ধরে পড়ন্ত কলার কাঁদি নামাচ্ছে যোগীবর সন্তান বাৎসল্যে। এক বিয়োন, এক ফল, কাঁদির ভারে নুয়ে পড়েছে যোগীবর। মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে টপ্ টপ্ কোরে অথচ সৌরভির আর আহ্লাদের শেষ নেই। কাঁচি করা বাঁশ পায়ে আটকে বাঁ হাতে সে গাছের মাথা উঁচু কোরে ধরে যোগীবরকে বলে, "এক বিয়ানী এক গাছ, তাই দেখি হিমসিম খাইয়া গেল্যা,-পোলার মায়ের বেলা কি তা করতা?" কলার কাঁদির ভারে তখন নুয়ে পড়েছে যোগীবর। তবু সৌরভির কথার জবাব ফিরিয়ে বলে, "পদ্মাপারের মাইয়া, অথচ মাজা তো দেখি গেছে বাঁইক্যা,—দশ বিউনীর স্বপন দ্যাখস তুই গাছটারে উচা কইর‍্যা ধরতে পারিস না?"

মুখে কথা, হাতে কাজ, সামনে বিস্তৃত সোনার স্বপ্ন, ঘরগৃহস্থ, ছেলেপুলে—ফলভারে আনত এই সোনার কলা গাছ। সূর্য তখনও মাথার ওপরে ওঠে নি। এমন সময় বড়রায়ের ম্যানেজারবাবু এসে হাজির পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ নিয়ে। পরোয়ানা—এখনি যেতে হবে। বড় রায়ের আদেশ।

গালে হাত দিয়ে ভাবতে বোসলো যোগীবর। স্ত্রীকে শুধালো, "কি করণ যায়!"

"যাইবা না এক কথা।" কপালের গোলা সিঁদুর টিপে সর্ব পাপঘ্ন সূর্য ঝলকায় যেন চকিতে সৌরভির। বলে, "সিংহাসন তো দিয়াই আইছ বানাইয়া আবার তার কারিগররে রাজার কোন দরকার? তুমি যাইবা না।"

অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি শোনে যোগীবর। সৌরভি

ঠিক কথাই বোলেছে। তবু রাজানুগ্রহ ক্ষুন্ন হ'লে জীবন সংশয়াপন্ন হোতে পারে। বলে, "চোট্ যদি আসে, সামলাইতে পারবি?"

প্রত্যুত্তর হয় দৃষ্টির অঙ্গীকারে। যোগীবর শুধু সেই কথাটা জানিয়ে দিয়ে আসে ম্যানেজারবাবুকে।

ইচ্ছা হোয়েছিল, একবারে বেঁধে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সে বিষয়ে বড় রায়ের মনোভাবটা ঠিক আন্দাজ কোরতে না পেরে তর্জনী শাসনে ধমকে দিয়ে যান ম্যানেজারবাবু যোগীবরকে, "পিপিলীকার পাখা ওঠে মরিবার তরে...। তোর ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে ছাড়বো এই কথা জানিস?"

অভিসম্পাত দিয়ে ফিরে গেলেন ক্রোধান্ধ ম্যানেজারবাবু সাঙ্গপাঙ্গ সহ। বড়রায়ের কাছে গিয়ে বললেন, 'এলো না সে পামর। এলো তো না-ই, উপরন্তু রাজানুগ্রহের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ কোরে কড়া কড়া কতকগুলো কথা শুনিয়ে দিলে। আজ্ঞা হয়তো ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে আসি স্পর্দ্ধা;—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আসি একতারা গ্রামের যোগীবর সূত্রধরের ভিটেমাটি।

বড় রায় শুনলেন ব্যাপারটা। শুনে মর্মাহত হোলেন। ম্যানেজারবাবুকে বললেন, "আমারই অন্যায় হোয়েছে আপনার মতো একজন অর্বাচীন আমলাকে রানী পালঙ্কের কারিগরকে আনতে পাঠানো। যাক, প্রায়শ্চিত্তটা যখন আমারই করবার কথা তখন প্রজা না এলে রাজাকেই যেতে হবে। তা বলে রাজ্যটাতো আর নষ্ট হোতে পারে না রাজার পাপে!" বজরা নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন বড় রায় পাত্রমিত্র সহ। সঙ্গে সঙ্গে উপঢৌকন নিয়ে চললো ছ'জন চীনা মিস্ত্রী। ওয়াং লুং-র হাতে চীনা কারিগরীর এক অপূর্ব নিদর্শন, কাঠের একছড়া ফুলমালা। এবার সে নিজের হাতে যোগীবরের গলায় মালা পরিয়ে দেবে।

পয়গম্বর পর্বতের কাছে যান নি বোলে পাথরের সেই অচলায়তন যে গড়াতে গড়াতে একদিন পয়গম্বরের পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল,—এই দৃশ্য আবার নতুন কোরে দেখবার জন্যে জনমানুষ ভেঙে পড়লো একতারার নদীচরে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে—উপঢৌকন নিয়ে স্বয়ং বড় রায় এসেছেন কাঠের কারুশিল্পী যোগীবরকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে। আর ওয়াং লুংকে অগ্রগামী কোরে চীনা কারিগররা এনেছে কাঠের ফুল কাঠের মালা। যোগীবরের হাতের রানী পালঙ্ক বিমুগ্ধ, বিস্মিত কোরেছে তাদেরও।

বড় রায় নিজে এসেছেন শুনে প্রথমটা শঙ্কিত হলো যোগীবর। ভাবলো রাজানুজ্ঞা লঙ্ঘন কোরে যে মহাপাপে লিপ্ত হোয়েছি, এবার বুঝি বা রক্তের বিনিময়েই সেই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হয়। কিন্তু হর্ষোৎফুল্ল মানুষের মুহুর্মুহু জয়কার ধ্বনিতে সম্বিৎ ফিরলো তার। ওয়াং লুং-এর হাতে কাঠের ফুলমালা দেখে সে আশ্বস্ত বোধ কোরলো। সৌরভিকে ডেকে বোল্লো, "শঙ্খ বাজাও, জোকার উঠাও,—মানতির তোমার জোর আছে গো!"

সাধ আহ্লাদে গড়িয়ে যায় সৌরভি। হেসে বলে, "কারিগরের জোরেই না আমার জোর! আমি তোমারে কই নাই...!"

দেখতে দেখতে চারদিক থেকে লোক এসে ভেঙে পড়লো যোগীবরের উঠোনে। জনসমাগমে দরিদ্রের গৃহাঙ্গন গম্ গম্ কোরতে লাগলো বারোয়ারি তলার রাস-অঙ্গনের মতো। শিল্পী সম্বর্দ্ধনায় জয়ধ্বনি তুলে যোগীবরকে নিতে এসেছে তারা।

স্তুতিবাদ আর অভিনন্দন পেয়ে বিব্রত, বিচলিত বোধ করে যোগীবর। ভস্মমাখা এক অভিমানী ত্রিপুণ্ড্রক সন্ন্যাসী হতাদরে, অনাদরেই থাকে ভালো। এ আবার কি জ্বালা, কি প্রহসন? কিন্তু প্রাচীন চীনা কারিগর ওয়াং লুং-এর হাতে কাঠের ফুলমালা দেখে তার চোখ দ্রব হোয়ে গেল। দেখলো বড় রায়ও এগিয়ে এসেছেন হাসিমুখে।

দু'হাত বাড়িয়ে পয়গম্বর অমনি ছুটে চললো পাহাড়ের দিকে, আলিঙ্গন জানাতে।

বহুমূল্য উপঢৌকনে সম্মানিত কোরলেন বড় রায় যোগীবরকে। আলিঙ্গন জানিয়ে বোললেন, "আর কি চাও, বলো!"

বাষ্পাকুল হলো কারিগরের কণ্ঠ। যথাযোগ্য সম্মানে সেও মাননীয় অতিথিবর্গ ও বড় রায়কে আপ্যায়ন কোরে প্রার্থনা জানালো,—"আর চাই ভরসা।—নিঃস্ব এই কারীগর সমাজের উপর আপনি একটু নেকনজর করেন। ছেনি বাটালি লইয়া ধরাধামে আমাগো একটু সসম্মানে বাঁইচ্যা থাকতে অধিকার দেন,—আর কিছু না।"

প্রসন্ন হোয়ে নিজে যখন হেঁটে এসেছেন, তখন শিল্পীকে তিনি আজ খুশী কোরেই যাবেন। বড় রায় কীর্তিনাশার পার্শ্বস্থ দশখানা গ্রাম তখনই নিষ্কর হিসেবে ঘোষণা কোরলেন। আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন অকপট সৌহার্দের। যোগীবরের বদ্ধ কৃতাঞ্জলি নিজের দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে বোললেন, "রাজানুগ্রহের কোনদিন কোন কার্পণ্য হবে না, কথা দিলাম।"

দয়াধন্য একতারা গ্রাম বড় রায়ের গুণগানে মুখর হলো। আর ধন্য হোলেন বড় রায়। ফিরে যাবার সময় বজরার ওপর থেকে চেয়ে দেখলেন, বরণডালা হাতে মেয়েরা সব পুজো নিয়ে এসেছে মা পদ্মায়। ডাব নারকেল আর ফলফুলের নৈবিদ্য ভাসিয়ে দিচ্ছে তারা স্রোত কোরে ছড়া কেটে পদ্মার জলে। কলার খোলার অগণন প্রদীপগুলি নাচতে নাচতে ভেসে চলেছে আকাশ গঙ্গায়,—কৈলাসের দিকে। এক জাগর স্বপ্ন দেখলেন বড় রায়।

॥ সাত ॥

তারপর একূল ওকূল-দুকূলই ভেঙেছে পদ্মা। শুধু একতারা গ্রামের সূত্রধর সম্প্রদায়ের ভিটেমাটিই নয়, জগৎকিশোরের রাজপ্রাসাদও বিলীন হোয়েছে পদ্মায়। ডোবেনি এক বণিকী স্বার্থ। ভরা বজরা আর গয়নার নৌকো। রানী পালঙ্ক ভাসিয়ে নিয়ে আসে পোদ্দার, ঢাকা থেকে কলকাতা।

রানী পালঙ্ক তার, আর যোগীবর তার আবিষ্কার।

সে দিনও ছিল পূর্ণিমার গণ, আজও পূর্ণিমার গণ। এক গণে গেছে কারিগরীর সার্থক স্বাক্ষর, রানী পালঙ্ক। আর আজকের গণে চলেছে কারিগর নিজে, যোগীবর সূত্রধর। সেদিন রানী পালঙ্কের সঙ্গে যোগীবর ছিল, আরও অনেকে ছিল বজরায়। কিন্তু আজ যোগীবরের সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না; রানী পালঙ্কও না। একাই আজ যাত্রা কোরছে যোগীবর আঁধার মুড়ি দিয়ে, অন্ধকার এক বজরায়।

আঁধার ঠেলে সৌরভিকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে যোগীবর দু'হাতে।

আজ যোগীবরের সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না; রানী পালঙ্কও না।

পূর্ণিমার গণ অথচ এতো অন্ধকার এলো কোথা থেকে পদ্মার বুকে? বিস্ফারিত দুই চোখের তারায় এক অপরিসীম বিস্ময় জাগে যোগীবরের।

নিতাইচাঁদ চেঁচিয়ে বলে, "মিস্তরি দ্যাখ এই যে পোদ্দার আইছে,—তোমারে ডাকত্যাছে—তোমার রানী-পালঙ্কের কথা কয়...।"

গোবিন্দ পোদ্দারের স্বার্থবাহ চোখ দুটোও করকর করে অকারণ। অথচ পোদ্দার বুঝতে পারে না কি হয়, কেন হয়। কিছু মনে পড়ে না পোদ্দারের।

যোগীবর তবু যুঝে চলেছে অন্ধকার, তার কাঠের লতা সৌরভিকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে। হাতের মুঠি খুলে খুলে যাচ্ছে থেকে থেকে। আবার ধরে নিচ্ছে ছিনিয়ে। এবার আসছে বড় রকমের একটা ঢেউ। চক্রাকারে পাক খেতে খেতে আসছে দূর থেকে। গর্জন শুনতে পাচ্ছে যোগীবর। কাটাতে না পারলে ভেসে যেতে হবে এবার।

তৈরী হোয়ে নেয় রানী পালঙ্কের কারিগর।

কাজ করে কেউ কাজ করে
কোথাও অলক্ষ্যে অগোচরে
সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে
সে কাজের শব্দহীন ধ্বনি
কখনো প্রাণের রং নিয়ে
খুঁজে পায় শাশ্বতের বিস্মিত সরণি,
কখনো বা কেঁদে মরে
গন্ধভরা হৃদয়ের গভীর গহ্বরে।

। পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিনের একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

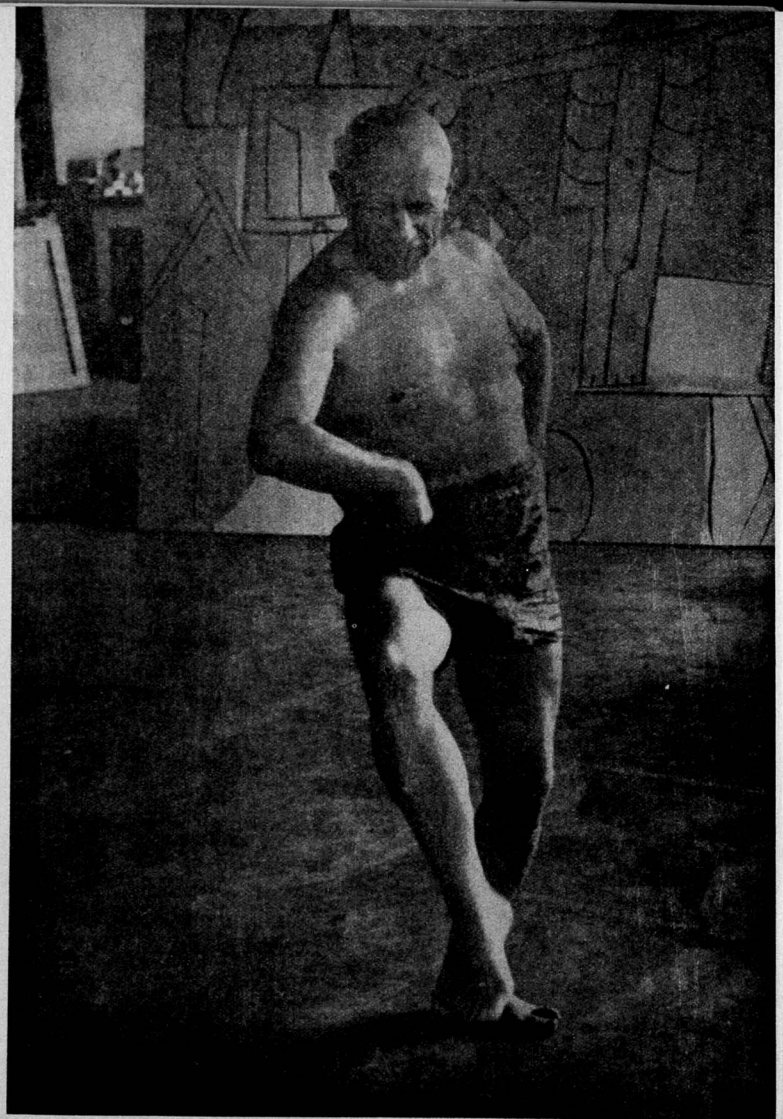

পিকাসো

কল্যাণ ভট্টাচার্য

কল্যাণ ভট্টাচার্য বৃহত্তর পাঠক-সমাজের কাছে স্বল্প পরিচিত হলেও বহুদিন ধরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পকলা সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণায় ব্যাপৃত। সাহিত্য, নাটক এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রায়শঃ প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। বর্তমানে পিকাসো সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত।

এক

জাগতিক অঙ্কে বয়স হোয়েছে অনেক। যতো বছর বয়স ঠিক ততো কটাই রেশম-পাকা চুল আজ অবশিষ্ট-আছে বোধ হয়। লোলচর্ম মুখে আয়ত চোখজোড়ায় যুগোত্তর সৃজনী-শক্তির স্বাক্ষর বর্তমান। লম্বা আঙুল-গুলো, এখনও, এতো বয়সেও সৃষ্টির নিরন্তর তাগিদায় সতত চঞ্চল। এবং তাগিদার দিন-ক্ষণ নেই, নেই মাস-তারিখ-সালের প্রশ্ন।

হ্যাঁ; পাবলো রুইজ পিকাসোর কথাই বোলছি। ঐতিহাসিক এই ব্যক্তিটি শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব নন; সর্ব-কালীন প্রতিষ্ঠান বোললেও অসম্পূর্ণ থেকে যায় আধুনিক শিল্পকলার এই মধ্যমণির বহুধা পরিচয়।

পিকাসোর মতো বিতর্কমূলক শিল্পীর সংখ্যা সংখ্যাতীত নয়, পরন্তু অঙ্গুলিগ্রাহ্য। তাই সমালোচকের দরবারে কখনো তাঁকে দেওয়া হোয়েছে অতুল কৃতিত্বের অকল্পেয় শিরোপা; আবার কেউবা মন্তব্য কোরেছেন যে পিকাসো সেই ধূর্ত শিল্পী যিনি সারা পৃথিবীকে বুদ্ধিমার্গের একটি একমুখো গলির দিকে পরিচালিত কোরেছেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সে উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধ, উষর মরু বা তুষারধবল মেরুর মানুষই হোক, তামাম দুনিয়ার দর্শক তাঁর সৃষ্টি দেখে চমৎকৃত হোয়েছে, অনু-প্রাণিত হোয়েছে। তবে অনেকের মনে হোয়েছে দুর্বোধ্য, তাঁদের মনের মধ্যে সঞ্জাত হয় না-বোঝার ক্ষোভ।

কিন্তু পিকাসোর বিরাটত্ব নিঃসন্দেহে সন্দেহাতীত। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যমান জগতকে এক আশ্চর্য নতুন রূপারোপ কোরেছেন তিনি। প্রচলিত নিয়মাবলীর সংকীর্ণ আওতার বাইরে অহর্নিশ চিন্তা কোরে এবং উপকরণ হিসাবে অতি সাধারণ জিনিস ব্যবহার কোরে—এমন কি প্রয়োজনানু-সারে রাস্তার আবর্জনাও—পিকাসো এই আপাত-অসম্ভব রূপান্তরণ সম্ভব কোরেছেন। আবহমান কাল ধরে নির্বিবাদে চলে এসেছিল ঐতিহ্যের সঙ্গে শিল্পের দাস-সুলভ সম্পর্ক। প্রতিবাদে পথিকৃৎ হোয়েছিলেন পিকাসো। এবং সেই ঐতিহাসিক ধর্মযুদ্ধে বিপ্লবী পিকাসোই বিজয়ী হোলেন। তার ফলে অভূতপূর্ব এক অধ্যায়ের সংযোজনা সম্ভব হোয়েছে। নতুন দিনের শিল্পীরা তাই স্বাধিকার পেলেন একটা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-মূর্ত অভিব্যক্তির সুদুর্লভ সুযোগের। শিল্প ও শিল্পীর সম্ভাবনার তোরণ আজ তাই অবারিত, পরিমিত সুযোগের বাঁধাধরা গণ্ডী হোয়েছে নিঃসীম। দ্বিধামুক্ত কণ্ঠে বলা যায় যে বর্তমান শিল্পীরা এবং তাঁদের উত্তরা-ধিকারীরাও পিকাসোর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশেষ লাভবান হবেন।

দুই

আঠারোশো একাশি সালের পঁচিশে অক্টোবর স্পেনীয় সহর মালাগায় পিকাসোর জন্ম। ইটালীয় মা আর স্পেনীয় বাবা—পিকাসোর ধমনীতে রক্তের এক

অদ্ভুত সমন্বয়। মাইকেলএঞ্জেলো আর ভেলাসকুয়েজের দেশের মধ্যে রচিত হলো এক আত্মিক সেতু। বাবা, অর্থাৎ ব্লাস্কো রুইজ ই ইচেভেরিয়ার পেশা ছিল শিল্প-শিক্ষকতা এবং স্বভাবত তাঁর কাছেই পিকাসোর হাতেখড়ি। মাত্র কয়েকদিন তুলি ব্যবহার কোরেই পিকাসো এক আবদার কোরলেন। ব্লাস্কো যে পায়রা-গুলো মডল্ হিসাবে ব্যবহার করেন, সেগুলো তাঁরও, একই উদ্দেশ্যে চাই। প্রার্থনা শুনে ব্লাস্কো তো স্তম্ভিত। "তুলি ধরতে শেখোনি আর তার আগেই মডল্!" জানি না, কিসের জন্যে তিনি শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন, স্ত্রীর অনুরোধে না পুত্রের সজল অভিমানে। পিকাসোর বয়স তখন আট। আনন্দে আত্মহারা হোয়ে তিনি সে-দিন সবচেয়ে সাদা, মখমল-নরম পায়রাটি নিয়ে স্কুলে গেলেন। বিরতির সময় বন্ধুবান্ধবের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি আর শিক্ষকের তর্জনী উপেক্ষা কোরে কয়েকটি স্কেচ কোরলেন। বাড়ি ফিরে বাবাকে দেখাতে হবে।

করকোঞ্জির লিখন ছিল বোধ হয় যে প্রথম জীবনে পিকাসোকে ঘুরতে হবে। সে শনি-রাহুর দ্বন্দ্বই হোক আর সাংসারিক প্রয়োজনেই হোক, ব্লাস্কো দম্পতি মনোরম মালাগা ছেড়ে পৌঁছলেন পন্টেভেদ্রায়। কিন্তু সেও সাময়িক। কেননা কিছুদিন পরেই তাঁদের আবার দেখা গেল লা করুনায়। এবং এখানেই কিশোর পিকাসোর প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। নিজেই উদ্যোক্তা, স্থানীয় এক ছাতার দোকানের প্রবেশপথে ছবিগুলো ঝুলিয়ে দিলেন পিকাসো। যাযাবরবৃত্তির পুনরাবৃত্তির কল্যাণে এবার বার্সিলোনায়। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে স্কুল অফ ফাইন আর্টের ছাত্র হোলেন পিকাসো। কিন্তু প্রতিভার ক্ষেত্রে স্থান-কাল পরিবেশের প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। তাই চোদ্দ বছরের পিকাসোর সৃষ্টিক্ষমতা চল্লিশোর্ধ্ব শিল্পীরও ঈর্ষাযোগ্য বোলে প্রমাণিত হলো। দক্ষ হাতের বলিষ্ঠ তুলির সুস্পষ্ট টানে জীবন্ত হোতে লাগলো একটির পর একটি ক্যানভাস। কিন্তু বার্সিলোনায় মন টিকলো না। তাই কয়েক মাস পরে পিকাসো এলেন মাদ্রিদে—স্পেনের শিল্পচর্চার পীঠস্থান। ছবি আঁকাই তাঁর একমাত্র নেশা, সুতরাং পেশা নির্বাচনের চিন্তা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজনীয়। তুলি আর রঙ, ইজেল আর ক্যানভাস—ধ্যান-ধারণার স্বর্গ-মর্তের এই তো সহজ ভূগোল! এর মধ্যে অন্য চিন্তার, হোক না সে অনুর, অবকাশ কোথায়?

কিন্তু মাদ্রিদও পিকাসোর প্রার্থিত জিনিসের হদিশ দিতে পারলো না। অহর্নিশ একটা অভাব অনুভব কোরতে লাগলেন। মনে হলো এখানে আলো আছে, আছে হাওয়া, নেই শুধু প্রাণের স্পন্দন। পারিপার্শ্বিককে মনে হলো নিতান্ত ফ্যাকাশে। কিন্তু উপায়? তাই কাজের শেষে প্রায়ান্ধকার সেই ঘরে পরের পর বিনিদ্র রজনী কাটতে লাগলো তাঁর। ক্রমশ অস্থির হোয়ে উঠলেন, দূর থেকে কার আহ্বান যেন কানে বাজলো তাঁর। মর্মে মর্মে অনুভূত হলো মোহময়ী প্যারিসের দুর্বার আকর্ষণ। মানবেতিহাসের রঙ্গমঞ্চ প্যারিস তাঁকে সাদরে ডাকছে, ক্যানভাসে রঙ চড়াতে পারলেন না পিকাসো। লোত্রেক আর সেজানের বিলাসভূমি, ল্যুভ্ আর মমার্তের আন্তরিক আমন্ত্রণে উত্তর না দেবার উপায় থাকলেও তরুণ পিকাসোর তা অজানা। উনিশশো উনিশ সালে উনিশ বছরের পিকাসো রঙিন কল্পনার ঔদার্যবলে অজানা প্যারিসের পথে পা বাড়ালেন। অনুষ্ঠিত হলো তাঁর একক প্রদর্শনী। দর্শক ও সমালোচকের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে প্যারিসের আকাশ-বাতাস সে-দিন মুখরিত হলো। "অত্যন্ত শক্তিমান এই ছেলেটি কোনক্রমে জনতার ভীড়ে হারিয়ে যাবে না; তোমরা দেখে নিও। একদিন সামনে এসে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে।"—খ্যাতিবান শিল্পী আমেদী ওজেফাঁর এই সোচ্চার অভিনন্দনে বিনয়ী পিকাসোর কর্ণমূল আরক্তিম হোয়ে উঠলো। এই স্বীকৃতিলাভের পর স্পেনে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। আরো চার বছর পর থেকে সর্বপ্রতিভার সংগমস্থল প্যারিস তার জমা—খরচের খাতায় আরেকটি নাম বাসিন্দা হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লিখে নিলো:—পাবলো পিকাসো।

সুরু হলো প্যারিস-জীবন; বর্ণোজ্জ্বল জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ। কপর্দকশূন্য পিকাসোর সে-দিন একমাত্র সম্বল ছিল দুর্জ্জেয় আত্মবিশ্বাস। অনেক অনুসন্ধানের পর মমার্ত অঞ্চলে একটা পোড়ো ঘর জুটলো

স্প্যানিশ সাজসজ্জায় পিকাসো ও জ্যাক্‌লিন।

'লা ক্যালিফোর্নি'র বাগানে পিকাসো ও জ্যাক্‌লিন।

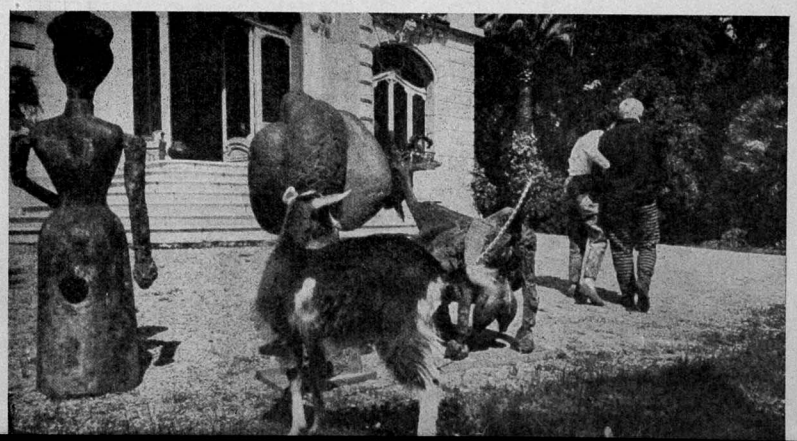

কৃতিম মুষ্টিযুদ্ধে ব্যাপৃত ক্লোদ ও পিকাসো।

অবশেষে। ঢোকবার সময় অন্যমনস্ক হলে দরজার সঙ্গে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। ভাগ্যক্রমে চেহারাটা খাটো বোলে দৈবকে নিশ্চয় ধন্যবাদ দিয়েছিলেন পিকাসো। আট ফুট লম্বা আর ছ' ফুট চওড়া এহেন 'ঘর' নামক গর্তটির একচ্ছত্র অধীশ্বর কিন্তু পিকাসো নন; অংশীদার মাত্র। এক অভাবগ্রস্ত কবিবন্ধু অন্য ভাগীদারটি। একটা পায়া-ভাঙা খাটে দিনের বেলায় ঘুমোতেন পিকাসো, আর রাত্রিতে তাঁর সুহৃদপ্রবর। সারা দিন এক টুকরো রুটি জুটলে তখন অনেক, আস্ত স্যাণ্ডউইচ হলে তো কথাই নেই। জীবন-ধারণের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে পিকাসোর তখন চিন্তা নেই। দিনে, রাতে, সমানে চলেছে একাগ্র এক শিল্পীর দুরূহ তপস্যা। একাদিক্রমে শেষ কোরে চলেছেন তন্ময় পিকাসো। শেষ রাতে, শুকতারার জায়গায় যখন আকাশের গায়ে চলেছে আগামী দিনের আহ্বান প্রস্তুতি, ইজেল ছেড়ে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেন পিকাসো কাচ ভাঙা স্কাই-লাইটের গর্ভপানে। সর্বশক্তির আধার সূর্যদেবের দৃপ্ত রঙ শিল্পীর মন রাঙিয়ে দিতো। অবসাদ আর ক্লান্তির আলিঙ্গন এড়িয়ে, সাময়িক হতাশাকে অগ্রাহ্য কোরে, অনুপ্রাণিত পিকাসো নতুন শক্তি পেতেন। পেতেন অদ্ভুত উদ্দীপনা। মহোৎসাহে মগ্ন হোতেন মহত্তর সৃষ্টির অন্বেষণে।

আজকের বহু আলোচিত এচিং, 'দি ফ্রুগ্যাল রিপাস্ট' মমার্ত-দিনের সৃষ্টি। এচিংটির পটভূমিকা ছিল একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত কাফে। একটি রুগ্ন বাস্তুহারা বোসে আছে, একটি হাত হাড়সর্বস্ব স্ত্রীর কাঁধে রাখা। হাত রাখার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন বিপদে সাহায্য করবার শক্তি আছে জীবনযুদ্ধে পরাজিত সেই দুঃস্থ লোকটির, সস্তা কাঠের টেবলে তাদের খালি প্লেট; খালি বোতল। তাদের জীবনটাই খালি—বিষাদের মূর্ত প্রতীক যেন এই দম্পতিটি।

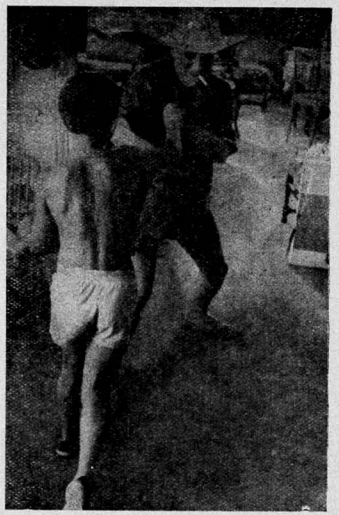

প্রায় আটান্ন বছর আগে বর্ষণমুখর এক সন্ধ্যায় পিকাসো এই এচিংটি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন প্রত্যেক প্যারী-সীয় আর্ট ডিলারের দোরগোড়ায়। আজকের যা 'সৃষ্টি' গতদিনের তা অনাসৃষ্টি। তাই মাত্র পাঁচ ফ্র্যাঙ্কের বিনিময়ে জোটেনি একজনও ক্রেতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি এই এচিংটির একটি মাত্র প্রতিলিপির হঠাৎ উদয় হয়। এবং রসজ্ঞদের দরবারে এর মূল্য নির্ধারণ হয় পঁচিশ হাজার ফ্রাঙ্কে।

দিনের শেষে রাত—বিরক্তিকর এই নিয়মের ব্যতিক্রম কদাচ হয় না। কিন্তু সাফল্যের মাপকাঠিতে পিকাসোর সামনে তখন যেন চিরন্তন অমাবস্যা। দু'দিন এক টুকরো রুটিও পেটে পড়েনি। সদ্য সমাপ্ত ক্যানভাসটি যত্ন কোরে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ান পাবলো। ক্ষুন্নি-বৃত্তির তাগিদায় নয়; রং ফুরিয়ে এসেছে। তারপর দশটা বাছাই করা ক্যানভাস নিয়ে রাজপথে নামলেন পিকাসো। অন্তত একটা ছবিও কি নেবে না আজ? কিন্তু আশার পর হতাশা—চিরকালই তো এই মর্মান্তিক তামাশা চলে এসেছে। কোনো দামে কোনো ডিলার রাজী হোলেন না। আর যাই হোন, নগদমূল্য দিয়ে জঞ্জাল কিনবার মতো মূর্খ তাঁরা নন। এমন সময় বৃষ্টি এলো। নির্মম বৃষ্টির হাত থেকে অন্তত ছবিগুলোকে বাঁচাতে হবে। সাময়িক আশ্রয়ের জন্যে প্রার্থনা করেন পাবলো। ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ কমলেই চলে যাবেন। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অনুরোধ অগ্রাহ্য হয়—না; সম্ভব নয়। মুখ বুজে ক্যানভাসগুলো গুছিয়ে নিয়ে সুরু হয় আবার পথ চলা। তীর-তীক্ষ্ণ বৃষ্টির এ অপমানের চেয়ে ভালো। বৃষ্টি-ভেজা এই ছবিগুলো সুবিখ্যাত 'ব্লু-পিরিয়ড'-এর সমকালীন। উত্তরকালে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর মিউজিয়াম অলংকৃত কোরেছে এই পর্যায়ের ছবিগুলি। এবং এর একটি ছবির দাম শুনলে অনেক সোনা-তেল-ইস্পাতের কারবারীরা হতবাক হোয়ে যাবেন।

ইতিহাসের পাতায় এ উদাহরণের অভাব নেই যে অভাব আর অনটন একাধিক প্রতিভার অপমৃত্যুর কারণ। কিন্তু পিকাসোর বেলায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়নি। দৈনন্দিন টাকা-আনা-পাইয়ের নির্মম প্রতি-বন্ধক ধূলিসাৎ হলো আত্মিক শক্তির কাছে। হতাশা আর নৈরাশ্য যখন পিকাসোকে সাময়িকভাবে বিব্রত কোরছে তখন আলাপ সমবয়সী এক আর্ট ডিলারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। যুবকটির নাম ড্যানিয়েল হেনরী কান্‌ওয়েলার। পরিচয় থেকে অন্তরঙ্গতা। এবং ক্রমে অবিচ্ছেদ্য সখ্যতায় পৌঁছতে সময় লাগেনি। উনিশশো সাতেই ড্যানিয়েল হেনরী বুঝেছিলেন তাঁর শক্তিমান সুহৃদের ক্যানভাস আগামী দিনে ইতিহাস সৃষ্টি কোরবে। অপরিচিত এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর। গত পঞ্চাশ বছর ধরে পিকাসোর প্রতিটি ক্যানভাস তাঁর মাধ্যমে দেখেছে বিশ্ববাসী। ড্যানিয়েল হেনরী আজ আধুনিক শিল্পকলার একজন বিশেষজ্ঞ, আর কোটিপতিও বটে।

এ পর্যন্ত একাধিক নারী পিকাসোর জীবনে এসেছেন। কেউ তুলেছেন অশান্তির ঝঞ্ঝাবাত্যা আবার কেউবা দিয়েছেন শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপন। ভাবতে অবাক লাগে নারী সম্পর্কিত কত নাটকীয় মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে পিকাসো কাটিয়েছেন। সুন্দরী ফার্নান্দ অলিভিয়ের ছিলেন মমার্ত-অধ্যায়ের সঙ্গিনী। পেশায় মডল্ ছিলেন ফার্নান্দ এবং সেই সূত্রেই পিকাসোর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। যুবক পিকাসো সে-দিন এমন ঈর্ষাকাতর

ক্রীড়ারত পিকাসো, পাল্‌মা ও ক্লোদ।

ছিলেন যে, গল্প আছে, ফার্নান্দকে তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে দিতে পর্যন্ত নারাজ ছিলেন। এমন কি ক্যানভাস ছেড়ে বাজারে পর্যন্ত যেতেন গৃহস্থালীর জিনিস-পত্র আনতে। কিন্তু নাটকীয় অন্তরঙ্গতার মতো আকস্মিক বিচ্ছেদ ঘটতেও সময় লাগেনি বেশি। তারপর পিকাসোর জীবনে দেখা দিলেন স্বনামধন্যা ব্যালে নর্তকী ওলগা কোকলোভা। পুরুষ-সুলভ স্থির বুদ্ধি ওলগার পর্যাপ্ত ছিল, ব্যবহারিক জীবনে গাড়ি-বাড়ি-টাকার প্রয়োজন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি বুঝতেন। আর বুঝতেন বোলেই বিচ্ছেদ, আজ না হয় কাল, অবশ্যম্ভাবী হোয়ে দাঁড়াল। মোহময়ী ওলগা সাময়িক-ভাবে সফলও হোলেন। প্যারিস তথা তামাম ইউরোপ স্তম্ভিত হোয়েছিল সে-দিন এই অচিন্তনীয় পরিবর্তনে। বোহেমিয়ানিজমের দুর্গম পথের পথিক পাবলো পিকাসো থেকে বুর্জোয়া রাজপথের ফিটফাট পথচারী মঁসিয়ে পিকাসোকে দেখে। কৃত্রিম পরিবেশে যেন পিকাসোর নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে আসতে লাগলো। উদভ্রান্ত পিকাসো হঠাৎ সন্ধান পেলেন ডোরা মার-এর। আইন-সিদ্ধ বিবাহকে চিরস্থায়ী করার পরিকল্পনা বানচাল হোয়ে গেল ওলগার। উপায়ান্তর না দেখে প্রথমে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পরে আক্রোশ মেটাতে ডোরাকে একদিন জনসমক্ষে অপমান কোরলেন ওলগা। হিংসা বড় মারাত্মক, তাই ভদ্রজাত ওলগা ডোরাকে শারীরিক নিগ্রহ কোরতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার ডোরা আজ পিকাসোর জীবননাট্যের নায়িকা না হলেও অসংখ্য ছবির উপজীব্য ডোরা ও তাঁর প্রসিদ্ধ কালো চুল ভুলে যাওয়া সহজ নয়। ফ্রাঁসোয়া গিয় হোচ্ছেন পিকাসোর চতুর্থ সঙ্গিনী। পিকাসোর চেয়ে বিয়াল্লিশ বছরের ছোট নম্রস্বভাবা ফ্রাঁসোয়া দুই সন্তানের জননী। কয়েক বছর বেশ কেটেছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন নাটকীয়ভাবে মনস্থির কোরলেন ফ্রাঁসোয়া যে অনেক দূর গড়িয়েছে; আর নয়। দুটি সন্তানের হাত ধরে তিনি বেরিয়ে পড়েলেন রাজপথে। যাবার সময় কারণ দর্শালেন, "ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের সঙ্গে এতো দিন কাটিয়ে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত; ভীষণ হাঁপিয়ে পড়েছি।" চিরতরে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো কিছুদিন পরে। যুবতী জ্যাক্‌লিন রোক আজ তাঁর সাম্প্রতিকতম নর্মসহচরী।

রাজনীতি সম্পর্কে পিকাসোর উৎসাহ আজীবন। দারিদ্র্যের বেদনা একদা তিনি মজ্জায় মজ্জায় অনুভব কোরেছেন, সমাজের ওপরতলা আর নীচতলার দুঃসহ ফারাক কাঁদিয়েছে তাঁর শিল্পীমনকে চিরকাল। কি শিল্পে, কি জীবনে, পিকাসো চিরকালই বিপ্লবী। সাম্য-বাদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা কোন নতুন কথা নয়। তাই চুয়াল্লিশ সালে পিকাসো যেদিন সরকারীভাবে কম্যুনিস্ট মতবাদ গ্রহণ কোরলেন, বিশ্ববাসী সেদিন চমকে ওঠে নি। এই ঘোষণা 'সংবাদ' হোলেও অপ্র-ত্যাশিত মনে হয়নি কারোর। প্রচারের উদ্দেশ্যে পিকাসো তাঁর সুবিখ্যাত 'শান্তির পারাবত'কে প্রতীক হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। (আসলে এই পায়রাটির একটি লিথো অঁরি মাতিসের উপহার) কম্যুনিস্ট ব্যক্তিত্ব, মরিস টোরেজ পিকাসোর একজন নিয়মিত অতিথি। অবশ্য কম্যুনিস্ট মুখপত্র 'প্রাভদার' তির্যক সমালোচনা তাঁকে রেহাই দেয়নি। পিকাসোর পক্ষে উনিশশো আটত্রিশ সালটি অবিস্মরণীয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের অবসান হলো; ফ্যাসীবাদী ফ্রাঙ্কোর জুটলো বরমাল্য। সেই দিন, সেই মুহূর্তে, রিপাবলিকান পাবলো পিকাসো দুরূহ প্রতিজ্ঞা কোরলেন যে স্পেনে আর কোনদিন ফেরা নয়। সুদূর ভবিষ্যতেও নয়। খুব কম স্প্যানিয়ার্ড এই একান্ত স্প্যানিশসুলভ প্রতিজ্ঞা কোরতে রাজী হবেন। কিন্তু পিকাসোর কথা স্বতন্ত্র।

জন্মভূমির জন্যে অহর্নিশ মন কাঁদে। কিন্তু উপায় নেই। মাদ্রিদের শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার এই একটি মাত্র পথ আজ খোলা আছে। স্পেনের আহ্বান যখন দুর্বার হোয়ে পড়ে তখন সদা হাস্যময় পিকাসোর মুখ মলিন হোয়ে যায়। অব্যক্ত বেদনায় সারাদিন বিমর্ষ হোয়ে বোসে থাকেন পিকাসো, কিছুই ভালো লাগে না, এমন কি স্টুডিও-ও। গভীর রাতে জ্যাক্‌লিনকে ইঙ্গিতে ডাকেন। কোন কথা না বোলে কয়েকটা স্পেনীয় অঙ্গাবরণ কোথা থেকে নিয়ে আসেন জ্যাক্‌লিন। মামুলী পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কোরে পিকাসো পরেন ক্লোক আর জ্যাক্‌লিন একটি সেভিলীয় ওড়না। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায়, পিকাসোর কোন হুশ নেই। অশ্রুসিক্ত চোখে ভোররাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন একমনে। ভৌগোলিক নৈকট্যের দিক থেকে কতো কাছে। কিন্তু আত্মিক দূরত্ব যে দূরতিগম্য! স্পেন আজ কতো দূরে।

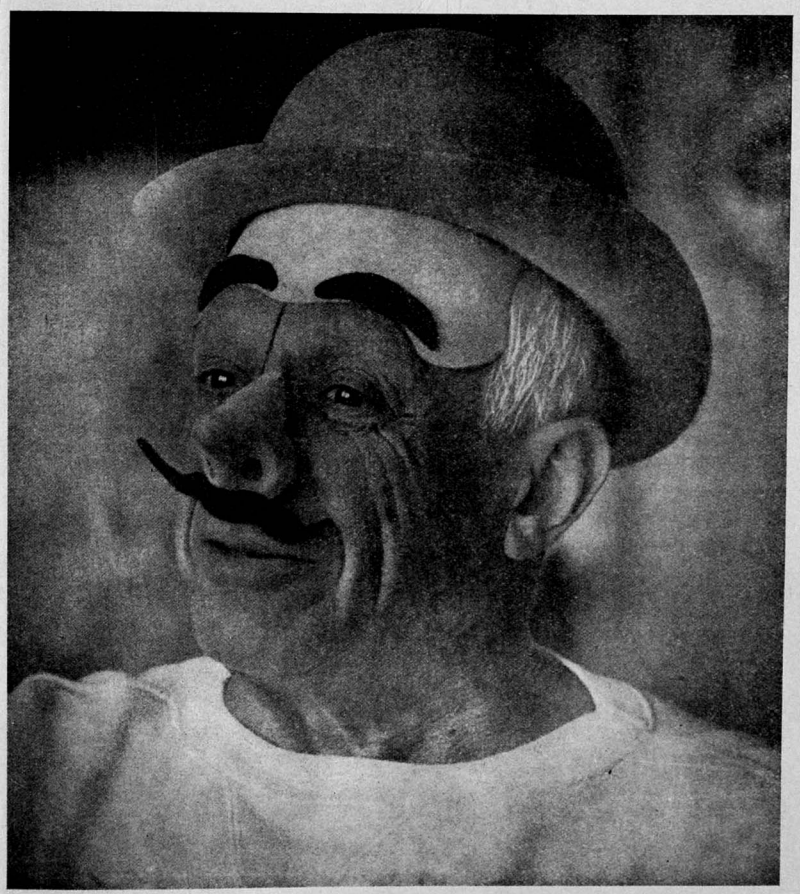

মুখোসের আড়ালে পিকাসো।

তিন

তাই আজ পিকাসো ফ্রান্সে। বোধ হয় আজীবনের জন্যে। বিলাসকেন্দ্র রিভেয়েরার সামান্য দূরে, কান্-এর প্রায় লাগোয়া, শিল্পীর তপোবন। পোষাকী নাম তার 'লা ক্যালিফোর্নি'।

কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হোয়েও ক্যাথলিক চার্চকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন যিনি এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে সারা বছর কাটালেও দুনিয়ার খবরাখবর সম্বন্ধে যাঁর আগ্রহ বিপুল—এহেন চূড়ান্ত অসংগতিপূর্ণ পিকাসোর এই সেই আবাস।

ভূমধ্যসাগরীয় সূর্যের কল্যাণে প্রাচীর-বেষ্টিত বিশাল বাড়িটা সর্বদাই ঝলমল করে। সুন্দর পরিবেশে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পরিবার থাকে বাড়িটায়। প্রবেশপথে শব্দ শুনে তত্ত্বাবধায়ক একবার উঁকি মারবে, আগন্তুক অবাঞ্ছিত না হলে লৌহকপাট হবে ফাঁক। অন্দরমহলের ছাড়পত্র অবশেষে পাওয়া গেল। গালচের মতো নরম ঘাসের ওপর হাঁটতে যখন দ্বিধাবোধ করেন অতিথি, তখনই সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই বেরিয়ে আসেন ত্রিশ বছরের জ্যাক্‌লিন। মিষ্টি হেসে আগন্তুককে মুহূর্তমধ্যে স্বজন কোরে নেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর আছে। "এখনি আসবেন পিকাসো"—জ্যাক্‌লিন জানান।

এ-কথা সুনিশ্চিত যে তৎপর অতিথি এই সাময়িক বিরতির পূর্ণ সুযোগ নিতে ভুলবেন না। বাগানের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে পিকাসোর হরেক সৃষ্টি। প্রথম দর্শনে নীরব বিস্ময়ে শুধু দেখে যেতে হয়; মনে হওয়া স্বাভাবিক এ-কোন্ বিশ্বকর্মার অন্দরমহলে এলাম। পাম গাছের তলায় ব্রোঞ্জ নির্মিত কুটিল প্যাঁচার জ্বলন্ত দৃষ্টি উপেক্ষা কোরলে, দুষ্প্রাপ্য ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহের পাশে দেখা যাবে যে এক প্রাগৈতিহাসিক নারীমূর্তি। শিশুক্রোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখেমুখে স্নেহ আর মমতার লাবণ্যমূর্ত অভিব্যক্তি। অন্য দিকে ব্রোঞ্জের সন্তানসম্ভবা এক নারীর প্রতিকৃতি। অথবা ব্রীড়াবনতা নগ্ন এক যুবতীর প্রতিকৃতি। বাঙ্ময়বন্দী ছবি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, প্রদর্শনীর পর ফিরে এসেছে বোধ হয়।

অবশেষে হাসিমুখে খালি গায়ে বেরিয়ে আসবেন পিকাসো। ভুল বোললাম, তুলি ছাড়া পিকাসোকে বরং ভাবা যায় কিন্তু হাসি ছাড়া নয়। পরনে এমন একটি ট্রাউজার যা একমাত্র তাঁর পক্ষেই পরা সম্ভব। চোখ ধাঁধিয়ে যায় এমন বর্ণোজ্জ্বল, এতো বিচিত্র নক্সাটি। আগন্তুকের চোখেমুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখলে সহাস্যে বুঝিয়ে দেবেন। "চিরকাল আমাকে লম্বা লম্বা ডোরা কাটা ট্রাউজার পরতে হোয়েছে। অত্যন্ত খারাপ লাগতো, কিন্তু দোকানে অন্য কিছু পেতামও না। তারপর হঠাৎ একদিন কুর্বের একটা ছবি চোখে পড়লো। তিনি দেখলাম, এড়োএড়ি ডোরাকাটা ট্রাউজার পরে...তখনি আমি স্যাপোঁকে ফোন কোরলাম। স্যাপোঁ এলো। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম! উঃ কতো দিনের সখ; না, না, মোজাগুলো ওর তৈরি নয়, ওগুলো ব্রিটেনের, খুব সাধারণ। ডোরাগুলো খুব মজার, না?"

ইতিবৃত্ত শেষ কোরে অতিথির অভিমত জানতে চান পিকাসো। তারপর প্রচণ্ড হাসির এক গমক। লা ক্যালিফোর্নির আকাশ বাতাস মুখরিত হয় সেই স্বতঃস্ফূর্ত হাসির প্রশ্নাতীত সারল্যে। সারমেয়কুলের অভিজাত বংশীয় 'বক্সার' ইয়ান আর 'ড্যাশস্যাণ্ড' লাম্প—পিকাসোর দুটি অতি আদরের জীব—পারস্পরিক বিবাদ ভুলে আনন্দে লেজ নাড়তে সুরু করে। পুত্র ক্লোদ আর কন্যা পালুমা বালির প্রাসাদ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়, এতোই সংক্রামক পিকাসোর হাসি। তিনতলার বারান্দা থেকে বক্ বকুম বক্ কোরে হর্ষপ্রকাশ করে আদরের পায়রার ঝাঁক। সুবিখ্যাত সেই ছবিটির বিষয়বস্তু, বহুল পরিচিত ছাগলটি শুধু চমকে ওঠে। লুকিয়ে ক্রোটন খাওয়ার জন্যে কি এত হাসির হুল্লোড়?

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের এই প্রস্রবণের মুখে নবাগতের আড়ষ্টতা কেটে যায়; পরম সমাদরে পিকাসো-সংসার তাঁকে আপন কোরে নিয়েছে। কারণ সভ্য জগতের অসভ্য কৃত্রিমতা সেখানে অনুপস্থিত। অনাড়ম্বর পরিবেশে বাহুল্যের চিহ্নমাত্র নেই।

বাইরের জগতের 'সময় নেই, সময় নেই'—এই আর্তনাদ পিকাসো-ভবনে অশ্রুত। পর্যাপ্ত সময় আছে। আছে কাজের জন্যে, নিছক আনন্দের জন্যে। পিকাসোর জীবন-দর্শন বিদগ্ধোচিত গাম্ভীর্যের মোড়কে মোড়া নয়। সংক্ষেপ এই জীবনদর্শনের সারমর্ম হোচ্ছে—শুধু অনাবিল আনন্দ; সৃষ্টির আনন্দ, নিছক আনন্দের জন্যে আনন্দ।

সাংবাদিক মারফৎ বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করার লোভে এই আপাত-সহজ জীবন-দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়নি পিকাসো। এ জীবন-দর্শন তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি পল অনুপলের উপলব্ধি-প্রসূত। তাই, আজকের কোটিপতি পাবলো আর সে-দিনের নিষ্কপর্দক পিকাসোর এ সম্পর্কে সামান্যতম তারতম্য নেই। পেটে রুটি নেই ঠিক, কিন্তু তাই বোলে আনন্দের খামতিও নেই। গুলীর শব্দ শুনতে ভালো লাগে বোলে যুবক পিকাসো একদা পিস্তল হাতে প্যারিসের পথে বেড়াতেন। বুকচাপা গরমের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে গুলী কোরে ফুটো কোরতেন স্টুডিও বা ঘোড়ার গাড়ির ছাদ। গুলী কোরেই মিশিয়ে যেতেন জনারণ্যে। এবং পুলিশ এলেই মহোৎসাহে লেগে যেতেন দুষ্কৃতিকারীদের অনুসরণে!

ল্যা ক্যালিফোর্নিতে একটি মাত্র নিয়মের প্রচলন আছে। অলিখিত কিন্তু অমোঘ—ভুলেও যেন কোন জিনিস স্থানচ্যুত না হয়! প্রত্যেকটি জিনিসের একটা নিজস্ব জায়গা আছে, এমন কি ধুলো জমে মাঝে মাঝে যে নক্সা হয় তারও। অন্যমনস্ক হোয়ে এই নিয়ম লঙ্ঘন কোরলে পিকাসো তথা পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি হবে। ধুলোর মধ্যে যে সৃষ্টির উপাদান লুকিয়ে আছে এ হয়তো অন্য কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু দৃষ্টিবান পিকাসো মনের মধ্যে সেগুলো অনবরত নাড়াচাড়া করেন। গভীর চিন্তা করেন প্রকৃতির এই নক্সা কি উপায়ে তুলির টানে, পোঞ্জে বা সির মিকে রূপান্তরিত করা যায়।

এ নিয়ম কিন্তু শিশু বা জীবজন্তুর বেলায় প্রযোজ্য নয়। তাঁর মতে পৃথিবীতে শিশুরা এসেছে খেলতে। কান কিছু সরালে তারা—এমন কি ক্যানভাস (!)—পিকাসো দুহাত তুলে স্বগতোক্তি কোরবেন, "উঃ; কি মিষ্টি।"

এবং সেই কারণেই পিকাসোর সঙ্গে প্রত্যেকের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তা সে পালুমা বা পায়রাই হোক। প্রকৃতি ও তার সৃষ্টির সঙ্গে আশ্চর্য এক আত্মিক সম্পর্ক আছে তাঁর। হয়তো নজরে পড়লো অসহায়ভাবে একটা কেঁচো বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখামাত্রই

ক্লাউনের সাজসজ্জায় পিকাসো ও পালুমা।

'লা ক্যালিফোর্নি'র বহির্ভাগের একটি সাংসারিক দৃশ্য। নিরবচ্ছিন্ন অবসরের প্রহর, তাই জ্যাক্‌লিন, ক্লোদ, পালুমা, লাম্প ইত্যাদিকে নিয়ে আসর জমিয়ে বোসেছেন পিকাসো।

ডান পাতায়: জাপানী মুখোস পরিহিত পিকাসো বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রভাত-সূর্যকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

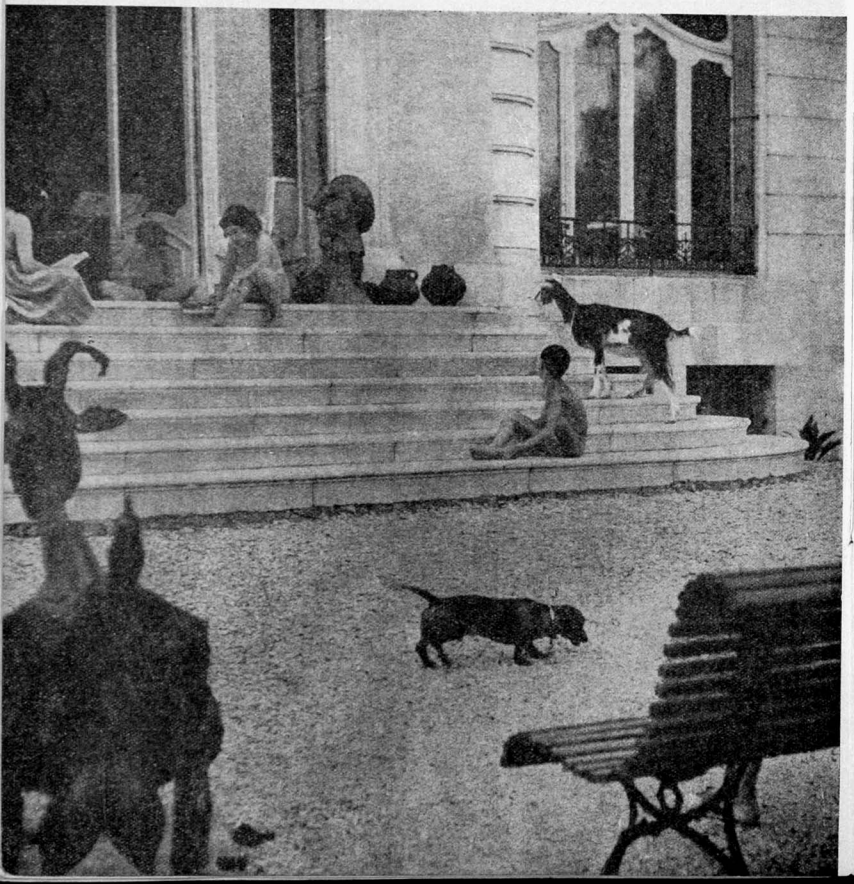

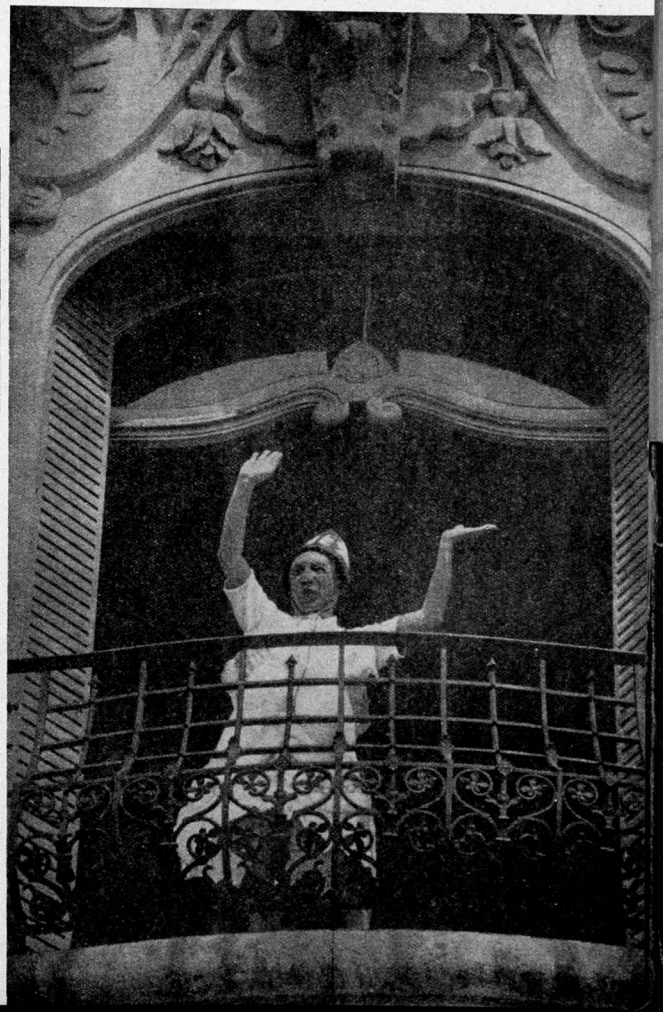

বোলবেন, "আহা, খেতে পাবে না বেচারা।" খাবার ব্যবস্থা কোরতে শোবার ঘরের পাশির খালি খাঁচায় সযত্নে প্রথমে রাখবেন। প্রত্যেক রবিবার তাকে বাইরে এনে প্রচুর জল ছিটোবেন।—"ভাববে বৃষ্টি হাচ্ছে।"

আগেই বোলেছি ক্লোদ আর পালুমার গতিবিধি সর্বত্র। দুজনে নিঃসাড়ে ঢুকলেও পিকাসো কিন্তু বুঝতে পারেন। ক্যানভাসের আড়ালে চট করে একটা মুখোস এঁটে বিকট এক শব্দ কোরবেন পিকাসো। ওরা দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। ভালো কোরেই জানে বাবার সঙ্গে খেলতে গেলে ওরাই আগে ক্লান্ত হবে।

সাধারণত পিকাসোর ঘুম ভাঙে সকাল যখন মধ্যাহ্নের পথে এগোয়। তবে ব্যতিক্রম হলে সূর্যোদয়ের সুন্দর মুহূর্তে। গরম দুধের সঙ্গে একটু কফি আর এক করে রুটি—এই সংক্ষিপ্ত প্রাতরাশ সমাপনান্তে পিকাসো হয়তো কোনদিন বসেন অসংখ্য উত্তরার্থী চিঠির তাড়া নিয়ে কিংবা লাম্পের সঙ্গে একটু খেলেন। আবার তন্দ্রাচ্ছন্নও হন মাঝে মাঝে। কিন্তু ক্লোদ আর পালুমার দুষ্টুমীর কল্যাণে তন্দ্রা কোথায় পালায়। হয় ওদের সঙ্গে খেলতে হবে, না হলে পালমার ছবি দেখতে হবে। ভাবলে আশ্চর্য লাগে; ব্রাঙ্কোর কাছে পিকাসোর শিক্ষারম্ভ আর পালমার হাতেখড়ি পিকাসোর কাছে। তারপর জ্যাক্লিনের তাড়নায় মধ্যাহ্ন ভোজের প্রস্তুতি। অবশ্য নামেই; শিশুর চেয়ে একটু বোধ হয় বেশি খান পিকাসো কিন্তু উৎসাহে বা কার্যক্ষমতা। অনেক যুবকও তাঁর কাছে শিশু।

পুরোন বন্ধুরা এলে অপরাহ্নে বসে আড্ডার আসর। তাঁরা বিদায় নিলে খাবার ঘরের আলো জ্বলবে। পিকাসো তখন ডুবে যান সংবাদপত্রে। 'লা ক্যালিফোর্নির' পরিবেশ তখন নিস্তব্ধ, পায়রাগুলো বারান্দায় ফিরে এসেছে, গোধূলি উত্তীর্ণপ্রায়।

তার অনেক পরে নৈশ ভোজন। কোনক্রমে সামান্য কাঁচা সব্জী, একটু রুটি বা পনীর শেষ কোরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ান পিকাসো।

আর না; এবার স্টুডিও। এতোটুকু শব্দও যেন তাঁকে বিরক্ত না করে, জ্যাক্লিন তৎপর হন হঠাৎ। সামনের দরজাগুলো সব ভেজান হোয়েছে, প্রয়োজনে অর্গলবদ্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। টেলিফোনের তার খোলা আর খোলা বাগানের দরজা। তবে একমাত্র লাম্পের আছে প্রবেশাধিকার। বহির্জগতের সঙ্গে এ বাড়ির সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। যেন সৌর মণ্ডলের অনাবিষ্কৃত এক গ্রহ।

নিস্তব্ধ স্টুডিওতে কাজ কোরছেন পিকাসো। কাজ কোরবেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত, দরকার হলে সূর্যোদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্ত পর্যন্ত। পালুমা ও ক্লোদ, ইয়ান আর সেই ছাগলটা এমন কি লাম্পও এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়বে। শুধু জ্যাক্লিনের প্রতীক্ষার শেষ নেই; খাবার ঘরের ভাঙা চেয়ারে বই নিয়ে বোসে থাকবেন তিনি।

একনাগাড়ে কাজ কোরে যান পাবলো—ক্যানভাস বা উডকাট, এনগ্রেভিং বা এচিং, ভাস্কর্য বা সিরামিক অথবা লিথো—সে যাই হোক নিথর নিশীথে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, দূর থেকে দেখা যায় উজ্জ্বল আলোয় কর্মব্যস্ত পিকাসোকে। বিরল সেই মুহূর্তে মনে পড়া স্বাভাবিক যে কর্মই প্রেমের পার্থিব রূপ।

বম্বের বিখ্যাত শিল্পী হোসেনের অঙ্কিত চিত্র।

শ্রীগৌরী

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক এবং কলকাতার সরকারী সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অবৈতনিক লেকচারার। বর্তমানে ভারতের মুদ্রা ও বাংলার লিপিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণারত।

গৌরী মূর্তির এক অংশ।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতবর্ষে শিল্পীরা মূর্তি নির্মাণের ব্যাপারে সাধারণতঃ মূর্তিতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকগুলিতে লিখিত বিধানের কথা মানিয়া চলিতেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত না এরূপ নহে। ব্যতিক্রম ঘটাও স্বাভাবিক। কারণ, আনন্দই হইতেছে শিল্পের উৎস, আর সৃষ্টির আনন্দে বিভোর শিল্পী পৃথিবীর বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে চলাফেরা করিবেন ইহা আশা করাও অন্যায়।

সৌন্দর্যের পূজারীর রসঘন আনন্দই নয়, অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের প্রভাবও মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ একটি অভিনব দেবী মূর্তি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত এই মূর্তিটি বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরসী কুমার সরস্বতী মহাশয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

আয়ত পাদপীঠের উপর পদ্মাসনা দেবীর বামহস্তে ধান্যমঞ্জরী এবং বরদ-মুদ্রায় বিন্যস্ত দক্ষিণ করে একটি রক্তসদৃশ বস্তু রহিয়াছে। মূর্তিটির মুখশ্রীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীগণের মুখের আকারের প্রভাব বর্তমান। দেবী নানালংকার-ভূষিতা। ইহাদের মধ্যে বাহুদ্বয়ে অধিকাংশে বিস্তৃত বলয় লক্ষণীয়। উপবীতটিও রত্নমণ্ডিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে ধ্যান এবং সাধনমালাতে রত্নযজ্ঞোপবীতের কথা লিখিত আছে। দেবী জটামুকুটধারিণী। কারুকার্য বিভূষিত প্রভাবলীর উপরিভাগে অবস্থিত ছত্রটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মূর্তিটির পশ্চাৎ দিকে একটি গোলাকার মোহর সন্নিবিষ্ট আছে। মোহরে কিছু লিখিবারও চেষ্টা করা হইয়াছে; দক্ষিণ পার্শ্বে গোধা অথবা নকুলের মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। পাদপীঠের সম্মুখভাগে গৌড়ীয় লিপিতে "শ্রীদেবিঃ" (প্রকৃতপক্ষে হইবে শ্রীদেবী) নামটি খোদিত রহিয়াছে।

মূর্তিটির বর্তমানরূপ সাধনমালায় বর্ণিত বসুধারার কথাই প্রথমতঃ স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্তস্থলে (নং২১৩) লিখিত আছে "বসুধারাং ভগবতীং ধ্যায়াৎ কনকবর্ণাং সকলালংকারবতীং দ্বিরষ্টবর্ষাকৃতিং দক্ষিণ করেন বরদাং বামকরেণ ধান্যমঞ্জরীধরাম্ অক্ষোভ্যধারিণীম"। বসুধারার এই রূপের সহিত আলোচ্য মূর্তিটির অনেক সাদৃশ্য বর্তমান। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যায় যে বৌদ্ধদিগের ধনদেব জম্ভলের হস্তে যে নকুলের অবস্থান কল্পনা করা হইয়াছে, সেই দেবতার শক্তি বসুধারার এই সম্ভাব্য মূর্তিটির পাদপীঠেও বোধ হয় সেই জীবটিই অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রভাবলীর উপরে অবস্থিত ছত্র এবং পশ্চাদ্ভাগে মুদ্রিত মোহর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ মোহরের উপর সাধারণতঃ মহাযান বীজমন্ত্র খোদিত থাকে।

এই সকল বর্ণনার দ্বারা মূর্তিটিকে বৌদ্ধ ধনদেবী চিত্র বলিয়া স্থির করা স্বাভাবিক। কিন্তু পাদপীঠে পরিস্কারভাবে 'শ্রীদেবী'র নাম লিখিত থাকায় ইহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী বা লক্ষ্মীর সহিত সংযুক্ত করাই আরও সমীচীন। দেবীর বামকরে অবস্থিত ধান্যমঞ্জরী এবং দক্ষিণকর-স্থিত রক্ততুল্য গোলাকার বস্তুটি লক্ষ্মীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য উপরিলিখিত নকুল অথবা গোধা কখনও লক্ষ্মীর মূর্তিতে অঙ্কিত থাকে না। গোধা সাধারণতঃ গৌরী মূর্তির একটি বিশিষ্ট চিহ্ন রূপ পরিগণিত হয়।

মহাদেবীর কুমারী অবস্থার নাম গৌরী (গৌরী কুমারিকারূপা) এবং এই গৌরী গোধাসনা (গোধাসনা ভবেদ্‌গৌরী)। গৌরীর বিভিন্ন রূপের যে বর্ণনা আছে তাহাদিগের মধ্যে "শ্রী" একটি রূপ। এই শ্রীদেবী গোধাসনা এবং অক্ষমালা পদ্ম এবং অভয় ও বরদ মুদ্রা

গৌরী মূর্তির সামনে।

প্রভাব সবিশেষ বর্তমান ; ভাস্কর সম্ভবতঃ এইস্থলে এই তিন দেবীরই ভাব কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের বাংলায় ধর্ম সম্পর্কে উদারতার এবং বিভিন্ন ধর্মভাবের সমন্বয়ের যে পরিচয় আমরা বিভিন্ন সূত্রে পাইয়া থাকি, তাহারই সত্যতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে আলোচ্য মূর্তিটি। এই দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিলে ইহা বলা যাইতে পারে যে এটি তৎকালীন বাংলা দেশের মূর্তি-কল্পনায় এই সমন্বয়ের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলার শিল্প ও ধর্মের ইতিহাসের উপাদানরূপে মূর্তিটির মূল্য খুব সামান্য নহে।

সংযুক্তা (গোধাসনাঙ্কসূত্রাঙ্কম্ অভয়ং বরদং করম্। শ্রিয়া-মূর্তি তদানাম গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা।)।

যদিও এই মূর্তিতে অক্ষমালা ইত্যাদি অনুপস্থিত তথাপি পাদপীঠে অঙ্কিত গোধা ইহাকে গৌরীর শ্রীরূপ বলিয়া চিহ্নিত করিতে সাহায্য করে। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে আলোচ্য মূর্তিটিকে গৌরীর শ্রীরূপে প্রকাশ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

উপরের আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে মূর্তিটির যথাযথ পরিচয় দেওয়া বর্তমানে সম্ভবপর নয়। ইহাতে বৌদ্ধদেবী বসুধারা, ব্রাহ্মণ্যদেবী লক্ষ্মী এবং গৌরীর শ্রীরূপ,—এই তিন দেবীরই মূর্তি পরিকল্পনার

গৌরী মূর্তির উল্টো দিক।

খেয়াল গানের ইতিহাস

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত সম্পর্কে প্রবন্ধকার বাংলাদেশে খুব বেশি নেই। মুষ্টিমেয় যে কয়জন আছেন, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। সংগীত সম্পর্কে বাংলাদেশের অগ্রণী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন। ব্যক্তিগতভাবে নিজেও একজন সংগীতজ্ঞ।

খেয়াল গান সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে কে এই গানের উদ্ভাবক এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে। উত্তর ভারতের এই অনুপম গীতরীতি নানা বৈচিত্র্যের সম্ভার নিয়ে এতোদিন যাবত যে সংগীতের আসর জমিয়ে রেখেছে তার পশ্চাতে কোনও সুনির্দিষ্ট চেষ্টা না থাকলে আদৌ সম্ভব হোতো কিনা সন্দেহ। "খেয়াল" আরবী শব্দ। বাংলায় তার অর্থ কল্পনা বলা যেতে পারে। কল্পনা-প্রসূত সৃষ্টিতে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু খেয়াল গানের বিচিত্র ধারার মধ্যে স্বাধীন পদক্ষেপেরও গতি নির্দিষ্ট হোয়েছে। এই বিধিগত ধারা যে প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

খেয়াল গানের পূর্ববর্তী কালে সংগীতের প্রতি এমন এক মনোভাব প্রকাশ পায় যার ফলে সকলে ভাবতে থাকেন যে সংগীত তার লক্ষ্যস্থল থেকে অনেকখানি নেমে এসে শুধু নিয়মনিষ্ঠাগত কর্তব্যে পরিণত হোয়েছে। ধ্রুপদ গানের প্রতিষ্ঠা কমে আসবার যুগে এই মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ধ্রুপদ গানের সুনাম ও উৎকর্ষ তার আগে বহু বৎসর অক্ষুণ্ন থাকার কথা অসত্য নয়। ক্রমে বৈচিত্র্যের অভাব প্রকট হোয়ে পড়ে এবং গায়কগণ ধ্রুপদের নিয়মনিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কোরে বসেন। কল্পনা ও স্বাধীনতার বিপুল প্রয়োগ এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হোয়ে ওঠে এবং এ প্রচেষ্টা যে অপ্রাসঙ্গিক সেকথা বলা চলে না। কারণ প্রয়োজনের তাগিদকে ধামাচাপা দেওয়া সাময়িক ভাবে সম্ভব হলেও সর্বসময়ের জন্য সম্ভব নয়।

পাঠান রাজত্বের কায়েমী অবস্থার মধ্যে ভারতে যে সামাজিক বিবর্তনের সূত্রপাত হয় তার ফলেই মনে হয় সংগীতের ক্ষেত্রেও অবস্থানুযায়ী পরিবর্তিত ধারার ভিত্ গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক বোলেছেন "কখনও কখনও হিন্দু রাজারা তাঁদের ব্যক্তিগত সত্তা বজায় রাখতে মুসলমান ধর্ম গ্রহণের লোভ সংবরণ কোরতে পারতেন না। অনুসন্ধান কোরে দেখলে দেখা যাবে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুর বংশধর। সুলতানদের আমলে হিন্দু দলনের ফলেই তাঁদের পূর্বপুরুষরা ধর্মান্তর কোরতে বাধ্য হোয়েছেন। এর ওপর সর্বসময়েই বাহির হোতে মুসলমানদের আগমনের ফলে ভারতে মুসলমানেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রধান সহরগুলিতেই তা নিবদ্ধ থাকে।" এই অবস্থার ছোঁয়াচ সংগীতে না লাগার পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। রাজানুগ্রহ লাভের আকাঙ্খা সংগীতের ক্ষেত্রকে তখন এমন রূপান্তরিত কোরে তোলে যে পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে তার সঙ্গতি ক্রমেই ক্ষীণ হোয়ে পড়ে।

তদানীন্তন শাসকবর্গের দরবারে সংগীতের স্থান হলেও সভাসদদের রুচি অনুযায়ী অনুশীলনের ভিত্ রচিত হলো। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন অভারতীয় এবং আয়াস-বিলাসী। ধ্রুপদ গানের সুবিন্যস্ত ধারা তাঁদের আনন্দ দিতে অসমর্থ হলো এইজন্য যে তাতে হিন্দু সংগীতের পূর্ণ বিকাশ বর্তমান এবং প্রধানত তা দেবদেবীকে আশ্রয় কোরেই রচিত।

তানসেন-এর কবর।

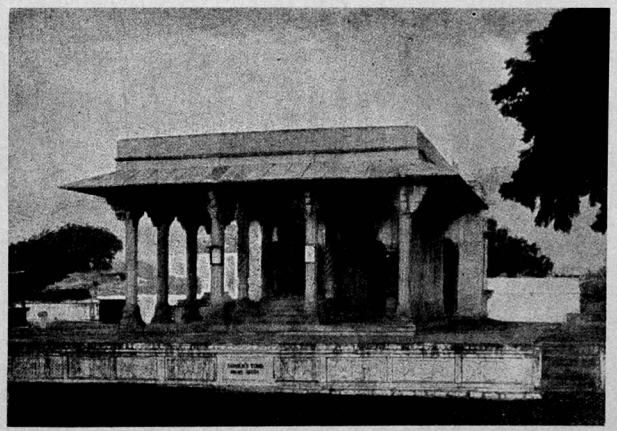

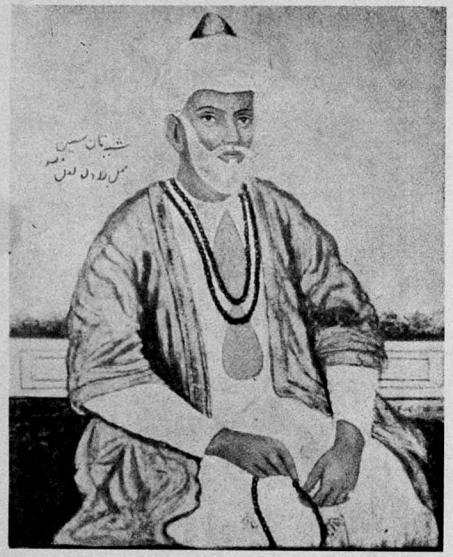

মোগল যুগের বিখ্যাত
সংগীত-শিল্পী তানসেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমান দরবারে ধ্রুপদ গানের কদর মহম্মদ শা (আঠারো শতাব্দী) অবধি অপ্রতিহত থাকে।

অনেকের ধারণা পাঠান সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির দরবারে (তেরো শতাব্দী) হজরত আমীর খসরু কর্তৃক খেয়াল গানের ভিত রচিত হয়। আমীর খসরু ছিলেন একধারে যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ ও সংগীতজ্ঞ। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচনা কোরে দেখলে কোনও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ আমীর খসরুর অনেক পরে রাজা মানসিং, স্বামী হরিদাস, তানসেন প্রভৃতি গুণীগণ দেখা গেছে ধ্রুপদের বহ্নি পূর্ণভাবে প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন। আকবরের দরবারে (ষোল শতাব্দী) ধ্রুপদ ছাড়া অন্য কোনও গীতরীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। ধ্রুপদ গান সৃষ্টির এই হোচ্ছে প্রধান যুগ। তারও আগে খেয়াল গান সৃষ্ট হলে আকবরের মতো সংগীতপ্রিয় সম্রাটের দরবারে তার কোনও স্থান থাকবে না একথা স্বীকার করা যায় না। (ষোল শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালে খেয়াল গানের সৃষ্টি তাই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে আমীর খসরু প্রবর্তিত আরবী সংগীতের প্রভাব তেরো শতাব্দী থেকেই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রকে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ কোরতে থাকে। এই নূতনত্বের পরিসমাপ্তি হয়তো খেয়াল গানে রূপ নিয়েছে, কিন্তু গীতরীতির এই রূপান্তরিত ধারা হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি, ক্রমবিকাশের ফলে অনেক দিন পরে দেখা দিয়েছে। খেয়াল গানের উদ্ভাবক কোনও ব্যক্তি নয়, ক্রমবিকাশের ফলেই ধীরে ধীরে তার সুমহান রূপ গড়ে উঠেছে।

অনেকে আবার মনে করেন পনেরো শতাব্দীতে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী খেয়াল গান সৃষ্টি করেন। তাঁরা মনে করেন এই সুলতানের উৎসাহে খয়রাবাদের লোকগীত হোতে খেয়াল গীতপদ্ধতির উদ্ভব হয়। ইতিহাসে অবশ্য পাওয়া যায় যে শর্কী বংশের সকলেই পারসী ও আরবী সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। সুলতান হুসেন চোদ্দশো সত্তর খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বাহ্‌লোল লোদী কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি নিজে একজন গীতরচয়িতা ছিলেন। পণ্ডিত রতনজানকার এ বিষয়ের প্রতি আলোক সম্পাত কোরে বহুদিন আগে মাদ্রাজ সংগীত একাডেমীর এক আলোচনা সভায় বোলেছিলেন যে হুসেনী তোড়ি ও হুসেনী কানাড়া যে এই সুলতানের সৃষ্ট রাগ তা বিশ্বাস কোরবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু সেই আলোচনা সভায় সি এস আয়ার তার উত্তরে বলেন যে হুসেনী নামক প্রাচীন আরবী সংগীতে একটি স্বরবিন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব তথ্যের উপর নির্ভর কোরলে সুলতান হুসেন শর্কীর খয়রাবাদের লোকগীতের প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ পায় না। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে সুলতান হুসেনের সময়েও ধ্রুপদ গানের প্রভা একটুও ম্লান হয়নি। খেয়াল গানকে তাই ধ্রুপদের পূর্ববর্তী বলা ঠিক হবে কিনা অভিজ্ঞ মহল আশাকরি বিবেচনা কোরে দেখবেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে ধ্রুপদ গানের উত্তরাধিকারী হিসেবে খেয়াল গানের প্রবর্তন যুক্তিসংগত, কেবল বিবর্তনের পরিসর কোনও নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। রাগ ও তালের প্রয়োগ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য কোরলেই বিষয়টি সরল হবে। শারঙ্গদেবের সময় (তেরো শতাব্দী) শুদ্ধ, ভিন্ন, গৌরী, ভেসার এবং সাধারণী নামে যে পাঁচ শ্রেণীর গীতরীতির সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যেই মনে হয় খেয়াল গানের আদিরূপ নিহিত রয়েছে। প্রথম দুটির সঙ্গে ধ্রুপদ-ধামারের তুলনা চলে। তৃতীয়টির সঙ্গে ঠুমরী, চতুর্থটির সঙ্গে টপ্পা এবং পঞ্চমটির সঙ্গে খেয়ালের তুলনাও অবশ্যম্ভাবী। তালের ক্ষেত্রে দেখা যায় খেয়াল গানে যেসব তাল প্রযুক্ত হয় ধ্রুপদের পরিসরে তাদের অনুরূপ তাল বর্তমান। ধ্রুপদের চার কলি সম্বলিত গানে রুচী অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন কোরেই মনে হয় খেয়াল গানের দুই কলির সৃষ্টি হোয়েছে। হিন্দু সাহিত্যের পল্লবিত ধারা ধ্রুপদ গানে নিবিষ্ট হলেও মুসলমানী আমলে শাগরবর্গের মনোরঞ্জনে তা সমর্থ হলো না। তার ফলেই গড়ে উঠলো অধিকতর কম কথার গান, বা দুই তুকের গান যার নূতন নামকরণ হলো খেয়াল। কথার চাইতে সুরের কারুকার্যের প্রতিই এখানে বেশি দৃষ্টি দেওয়া হলো।

খেয়াল গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য তান, ধ্রুপদ গানে যার অস্তিত্ব একেবারে নেই বোললেই চলে। আকবরের সভাগায়ক তানসেন ধ্রুপদ গাইতেন অথচ তাঁর নামের প্রথমে 'তান' কথার প্রয়োগ কেন হলো বোঝা শক্ত। প্রথম জীবনের রামতনু মিশ্রই মুসলমান হওয়ার পর আতা আলী খাঁ নামে পরিচিত হলেন। তারপর এই একই লোক সংগীত পারদর্শিতার জন্য সম্রাট আকবর কর্তৃক তানসেন উপাধিতে ভূষিত হন। ধ্রুপদের উৎকর্ষের যুগে 'তান' শব্দ সম্বলিত নামকরণের তাৎপর্য কি হোতে পারে! তবে কি সম্রাট তানসেনের তানযুক্ত গান শুনে মুগ্ধ হোয়েছিলেন? তাই যদি হয় তাহলে তানসেন ধ্রুপদ গায়ক হিসেবে পরিগণিত হোলেন কেন? ইতিহাসের পাতায় এর কোনও উল্লেখ না থাকায় সঠিক কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ধ্রুপদ থেকে খেয়াল গানের ক্রমবিকাশের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত "তানসেন" নামকরণে পাওয়া যায়।

হিন্দু সংগীতের ক্ষেত্রে তানের উল্লেখ ধ্রুপদের পূর্ববর্তী যুগেও পাওয়া যায়। তেরো শতাব্দীতে লিখিত "সংগীত রত্নাকর" নামক সুবিখ্যাত সগীংতগ্রন্থে তান সম্বন্ধে একটি বিশেষ অধ্যায় আছে এবং তাতে চুরাশিটি বিভিন্ন তানের নাম উল্লিখিত হোয়েছে। সংগীত রত্নাকরে যে সংগীতধারা আলোচিত হোয়েছে তা ধ্রুপদের পূর্ববর্তী কিম্বা হয়তো ধ্রুপদ গীতপদ্ধতির

আমীর খসরু।

প্রাথমিক অধ্যায়। তখন তানের প্রয়োগ সম্বন্ধে বাস্তব আকারের কিছু না থাকলে সংগীতগ্রন্থে আলোচিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে সঠিক কোনও নমুনা বর্তমানে পাওয়া অসম্ভব, কারণ তখনকার শাস্ত্রের কিছু কিছু পুঁথি একালে পাওয়া গেলেও সংগীতের নমুনা বা গঠনপ্রকৃতি স্বরলিপির অভাবে কালের কোলে বিলীন হোয়ে গেছে। তাই পণ্ডিতরা বর্তমানে পুরাতন পুঁথি নিয়ে যতোই মাতামাতি করুন না কেন, তদানীন্তন সংগীতের বাস্তব রূপ সম্বন্ধে কেউই কিছু হদিশ দিতে পারেন না এবং সেইজন্যই সংগীত রত্নাকরের তান কি ধরনের ছিল তার সঠিক বিন্যাস ও প্রয়োগবিধি কালগর্ভ থেকে উদ্ধার করা আজকের দিনে সম্ভব নয়। পুরাতন সংগীতের ব্যবহারিক দিক এমনভাবে ভারতের বুক থেকে মুছে গেছে যে তার উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই বোললেই চলে। থাকলে হয়তো দেখা যেতো যে ক্রমবিকাশের ফলেই যুগে যুগে সংগীতের ব্যবহারিক পদ্ধতির পরিবর্তন সাধিত হোয়েছে।

খেয়াল গানের পূর্ণ রূপায়ণ সম্রাট মহম্মদ শার (সতেরোশো উনিশ—আটচল্লিশ) আমলে গড়ে ওঠে। দরবারের সংগীতজ্ঞ নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন তানসেন কন্যাবংশীয়। ধ্রুপদ গান ও বীণ যন্ত্রে তাঁর সমান অধিকার ছিল। দরবারের আর একজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন গোলাব খাঁ। ইনিও ছিলেন ধ্রুপদী এবং তানসেনের পুত্রবংশীয়। দরবারের নিয়ম অনুযায়ী গোলাব খাঁ ধ্রুপদ গান কোরতেন এবং নিয়ামৎ খাঁ তাঁর সঙ্গে বীণ বাজাতেন। বহুদিন এইভাবে সঙ্গত করার পর নিয়ামৎ খাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে যন্ত্রীদের সম্মান গায়কদের সমান নয়। দরবারে গায়কদের উৎকর্ষের প্রতিই সকলের দৃষ্টি, যন্ত্রীরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যায়। সম্মানদানের এই বিচিত্র ধারা তাঁকে এতোই মর্মাহত কোরে তুললো যে প্রায় দুই বৎসর আর তিনি দরবারে অংশ গ্রহণই কোরলেন না। নিভৃতে থেকে তিনি এই সময়ে জানি রসুল ও গোলাম রসুল নামে দুটি অনাথ বালককে নূতন ধরনের সংগীত শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই ধরনের গানে ধ্রুপদের অস্থায়ী ও অন্তরা মাত্র রক্ষিত হলো, বাকি অংশ সঞ্চারী ও আভোগ বর্জিত হলো এবং গানের সুরের মধ্যে তান সংযুক্ত হলো। অবশ্য এই ধারা নিয়ামৎ খাঁর নিজস্ব বলা চলে না। পূর্ববর্তী যুগে আমীর খসরু প্রবর্তিত এক বিশিষ্ট গীতপদ্ধতির ছোঁয়াচ এতে পাওয়া যায়। নাম তার গুল্‌নকস্‌। এই ধরনের গানে বিভিন্ন প্রকৃতির তান আমীর খস্‌রু প্রবর্তিত করেন। কিন্তু গুল্‌নকস্‌ স্থায়ী হয়নি এইজন্য যে গানের ভাষা ছিল বিশুদ্ধ পারসীতে যা সাধারণের তেমন বোধগম্য হোতো না। কবিতার ক্ষেত্রে এসব গান উচ্চস্থানীয় হলেও প্রসারের ক্ষেত্রে তা পঙ্গু হোয়ে পড়লো এবং পরে তা স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলো। গুল্‌নকসের গঠনপ্রকৃতি ছিল খেয়ালের মতো দুই অংশে বিভক্ত, অস্থায়ী ও অন্তরা দিয়ে যার নামকরণ করা যেতে পারে। এখানে ধ্রুপদের মতো গমক ও টপ্পার মতো বোলতানেরও প্রয়োগ বিধিবদ্ধ ছিল। খেয়াল নাম তখন না থাকলেও খেয়ালের সমপ্রাকৃতিক ধারা আমীর খস্‌রু প্রবর্তিত গুল্‌নকসে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, নিয়ামৎ খাঁ এই ধারাকেই সচেতন কোরে তুলে উপরোক্ত অনাথ বালকদ্বয়ের কণ্ঠে নবভাবে রূপায়িত কোরলেন। এই ধরনের গান নিয়ামৎ খাঁ নিজেই রচনা কোরতেন। তাঁর এই নিভৃত প্রচেষ্টাই যে পরবর্তী যুগে ভারতীয় সংগীতে এক বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিলো তার কথা এখন বোলবো।

অনাথ বালকদ্বয় নব গীতপদ্ধতিতে পারদর্শী হলে নিয়ামৎ খাঁ সম্রাট মহম্মদ শাকে শোনাবার জন্য আগ্রহী হোলেন। যথাসময়ে আসরের ব্যবস্থাও হলো। গান শুনে সম্রাটের আনন্দ সীমা রইলো না। তারপর যখন তিনি শুনলেন যে নিয়ামৎ খাঁই এই নব গীতপদ্ধতির স্রষ্টা তখন তাঁকে 'শা সদারঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত কোরলেন এবং ধ্রুপদীদের উপরে তাঁর স্থান কোরে দিলেন। নিয়ামৎ খাঁর অন্তরে যে-আঘাত এতদিন ধূমায়িত ছিল তার এতদিনে পরিসমাপ্তি হলো। তারপর থেকেই সদারঙ্গ নাম সংগীত আসরের মধ্যমণি হিসেবে পরিগণিত হোতে লাগলো।

বিপরীত পন্থীরা (ধ্রুপদী) সদারঙ্গের এই নব গীতপদ্ধতিকে 'খেয়াল' অর্থাৎ যথেচ্ছাচার আখ্যা দিলেন এবং সেই নামেই এ শ্রেণীর গান আজও পরিচিত। কিন্তু সদারঙ্গ নিজে কখনও এ গান দরবারী মজলিসে কোরতেন না। ধ্রুপদ গানই ছিল এবিষয়ে তাঁর প্রধান সহায়। খেয়াল গানের প্রচলন তিনি কোরলেন উপরোক্ত অনাথ বালকদ্বয়ের সহযোগিতায়। এই খেয়াল গানের ক্ষেত্রেও দুনী লয়ের গানগুলি মনে হয় প্রথম প্রচেষ্টার ফল নয়। পরবর্তী যুগে তাদের সৃষ্টি সম্ভব। প্রথম দিকের খেয়াল গানে ধ্রুপদী ধারার খানিকটা রূপ ফুটে ওঠা অস্বাভাবিক নয়, কারণ ধ্রুপদের প্রভাব তখন অনস্বীকার্য। ধ্রুপদ গানের প্রতি সদারঙ্গের প্রীতির আর একটি নিদর্শন হোচ্ছে, তিনি তাঁর দুই পুত্র ফিরোজ খাঁ ও ভূপৎ খাঁকে খেয়াল গান শিক্ষা দেন নি। তাঁর এই দুই উপযুক্ত পুত্র পরবর্তী কালে আদারঙ্গ ও মহারঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

আজকাল গোয়ালীয়র ঘরানার নাম খেয়াল গানের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। এই ঘরানার সংস্থাপক হদ্দু খাঁ ও হস্সু খাঁর খেয়াল শিক্ষণ উপরোক্ত অনাথ বালকদ্বয়ের বংশধরদের কাছ থেকে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে সদারঙ্গের সময় থেকে খেয়াল গানের একটা সুনির্দিষ্ট ধারা গড়ে উঠেছে। তার আগে যেসব ধারার কথা আলোচিত হোয়েছে তার সঙ্গে খেয়াল গানের সম্পর্ক থাকলেও তা মুখ্য নয়। প্রচ্ছন্ন আকারের প্রভাব সংগীতের ক্ষেত্রে সবসময়েই চলে এবং তার ফলেই নবীন সৃষ্টির স্রোত প্রবাহিত হয়। এই স্রোতের টানে ব্যক্তির নাম এসে পড়ে আকস্মিক ভাবে এবং তাঁকে আশ্রয় কোরেই প্রগতির ভিত্ রচিত হয়। কিন্তু উপমার আশ্রয় নিয়ে বলা চলে সংগীতের প্রবহমান ধারার মধ্যে তাঁর স্থান বিচিত্রবর্ণ পার্বত্য উপলখণ্ডের মতো।

"আমি এ পৃথিবী গানে গানে ভরে যাবো
বিনিময়ে তার কিছু নাহি জানি পাবো॥
তবু কেহ যদি কাছে এসে গান শোনে ভালোবেসে
তবে আমি কোন প্রতিদান নাহি চাবো॥
কাছের ভুবন যদি যায় দূরে সরে
আমার সেতার তবু রবে সুরে ভরে।
সাথীহারা ভরা রাতে বাণীহারা বেদনাতে
আমি পৃথিবীর স্বপ্নের গান গাবো॥"

খবরাখবর

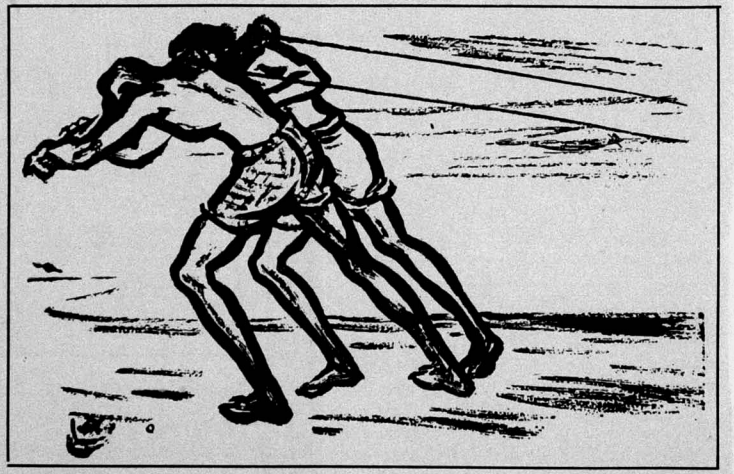

পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীনের একটি রেখাচিত্র।

মাস কয়েক আগে দিল্লীর প্রতিথযশা তরুণ শিল্পী এ, এস, কুলকার্নী তাঁর একক প্রদর্শনীর জন্যে মেক্সিকো গিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে সম্ভাবনাপূর্ণ এই শিল্পীর বিদেশ যাত্রায় সুন্দরম্ অতীব আনন্দিত হোয়েছে। সাম্প্রতিক একটি মার্কিন সংবাদপত্রের সংবাদানুযায়ী শিল্পী কুলকার্নীর প্রদর্শনীকে বিদেশের রসিক মহল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনে বর্তমান বছরের কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হোয়েছে। নতুন কার্যকরী সমিতির সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, সত্যজিৎ রায় এবং হিরণকুমার সান্যাল।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির কার্যাবলী পর্যালোচনা কোরলে দেখা যাবে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যে শুধু কলকাতা নয়; ভারতবর্ষও গৌরব বোধ কোরতে পারে। এবং সঙ্গত কারণও যথেষ্ট আছে। চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রের বিচার, শিল্প হিসাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—আর কোনো প্রতিষ্ঠান করেন বোলে আমাদের অজানা। সর্বকালীন যে-সব সৃষ্টি সেই সব চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয় পুনঃপ্রদর্শন; এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের বক্তৃতার ব্যবস্থা কোরে, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি অসংখ্য চিত্রমোদীর শুধু ধন্যবাদার্হ নন, শ্রদ্ধা অর্জনেরও যোগ্য দাবীদার। একমেবদ্বিতীয়ম্ এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর কল্যাণ কামনা করে সুন্দরম্।

অধ্যাপক সত্যেন বসু ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হওয়ায় বিশ্বভারতীর বহুজন ঈপ্সিত উপাচার্যের পদটি শূন্য হোয়েছিল। সম্প্রতি জানা গেল যে স্বনামধন্য তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় উক্ত পদের জন্য মনোনীত হোয়েছেন। নক্কারজনক আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের (যার প্রায়শঃ বহিঃপ্রকাশ বাংলার মুখ কালো কোরেছে) কল্যাণে বিশ্বভারতী আজ বিপর্যস্ত।

পাকিস্তানের হস্তশিল্পের কয়েকটি নমুনা।

প্যারিসে সম্প্রতি তরুণ ভারতীয় শিল্পী শান্তি শার একটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়েছে। উপরের ছবিতে শিল্পী, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার পানিক্কর এবং কয়েকজন ফরাসী চিত্রসমালোচককে দেখা যাচ্ছে।

রাহুকরতলগত বিশ্বভারতীর এই অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচন নিঃসন্দেহে সুস্থ চিন্তার পরিচায়ক। এই নির্বাচনকে সুন্দরম্ আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বভারতীকে রাহুমুক্ত অবস্থায় দেখবার আশা পোষণ করে।

আর একটি কথা। এই নির্বাচনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে এক শ্রেণীর দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা সন্দেহ প্রকাশ কোরেছেন। নির্বাচন সম্পর্কে সন্দিহান এই পত্র-পত্রিকাগোষ্ঠীর বক্তব্য আমাদের কাছে যুক্তিবর্জিত বোলেই প্রতিভাত হচ্ছে। যাই হোক, সুন্দরম্ এই প্রসঙ্গে বিনীত আবেদন জানাচ্ছে যে অন্তত একবারও যেন সবাই ব্যক্তিগত দলাদলি, ঈর্ষা, ও দ্বেষের উপরে উঠে, ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় ব্যাপৃত না হোয়ে—নব নির্বাচিত উপাচার্যকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেন।

শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের চায়ের মতো এমন প্রিয় সঙ্গী আর দুটি নেই। আর এদেশে পানীয় হিসাবে যদি মর্যাদা দিতে হয় তবে চাকেই সেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। চা হলো সত্যিকারের জাত পানীয়। দুঅর্থেই, জাত পানীয় আর জাতির পানীয়, ইংরাজিতে যাকে বলে ন্যাশনাল বেভারেজ।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছে বাঁচার তাগিদ, শিল্প সৃষ্টির মূলে আছে চা-এর তাগিদ, চা নাহলে যেন শিল্প সৃষ্টি হোতে চায় না। চা পানান্তে স্রষ্টা যে উৎসাহ-উদ্দীপনা পান, সৃষ্টিতে প্রেরণা পান, আনন্দ পান, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেন।

মেজাজ শরিফ কোরতে হলে চা চাই ; এবং শিল্পসৃষ্টির পশ্চাতে থাকে একটি উদ্দীপনাময় শরিফ মেজাজ। শিল্পী সাহিত্যিকরা তাই চাকে ভালবাসেন, অত্যন্ত আপনজনের মতোই ভালোবাসেন। দেশবিদেশের স্বনামধন্য লেখকরা তাই শতমুখে চায়ের প্রতি তাঁদের প্রীতি-প্রশংসা অর্পণ কোরে গেছেন, অন্য কোন খাদ্যসামগ্রী বা পানীয় বুদ্ধিজীবী শিল্পী বা সাহিত্যিকদের কাছ থেকে এত কৃতজ্ঞতা, এত তারিফ পায়নি।

উপরের ছবিতে কারুশিল্প শিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরতা এক মহিলা শিক্ষার্থীকে দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন রঙের সঠিক সংমিশ্রণের উপর অনেক সময় বাজার-দর নির্ভর করে, তাই প্রত্যেক শিক্ষণ কেন্দ্রে এই বিষয়ে যত্ন নেওয়া হোচ্ছে।

কয়েক মাস আগে কলকাতায় যখন বালুচর সাড়ীর প্রদর্শনী হয়, তখন সেন্ট্রাল টী বোর্ড সেখানে একটি মনোরম স্টল বা বিপণি কোরেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে বাঙালী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকেই এসেছিলেন। প্রদর্শনীতে আরও অনেক বিপণি বিচিত্র সামগ্রী-সম্ভারে আকর্ষণীয় হোয়ে সজ্জিত ছিল। কিন্তু দেখা যেত ভিড় ওই একটি জায়গাতেই বেশী রকমের। ওই টী স্টলেই শিল্পী আর সাহিত্যিকেরা, তাঁরাই তো ভিড়ের, একটি মস্ত অংশ। দিব্যি জমিয়ে বোসে থাকতেন ছোট ছোট টেবিল ঘিরে। গল্প কোরতেন, হাসতেন, আর সিগারেট টানতেন। আর চা-তো অনবরত চলছেই। এক কথায় বেশ আড্ডা জমাতেন, সে আড্ডার উৎস ছিল চা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিক, গোপাল ঘোষ, রথীন্দ্র মৈত্র প্রমুখ চিত্রশিল্পী, ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত এঁদের প্রায়ই দেখা যেত ওই জটলাটিতেই, প্রায়ই এঁরা ওখানে আড্ডা জমাতেন।

বাঙালীর নিজস্ব বোলতে এখনো যা আছে তা হলো আড্ডা। আর এটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একমাত্র দায়ী চা। সুতরাং চায়ের প্রতি বাঙালীর, বিশেষত বাঙালী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কৃতজ্ঞতা নিঃসীম, নিরন্ত। এই কারণেই চায়ের খবরাখবর প্রকাশে সুন্দরম্ উৎসাহ বোধ করে এতো।

সে-দিন কলকাতাস্থিত পাকিস্তান ডেপুটি হাই-কমিশনারের দপ্তর থেকে দুটি শিল্প সম্পর্কিত বই সুন্দরম্ পেলো। একটি সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীনের অ্যালবাম এবং অন্যটি পাকিস্তানের সাম্প্রতিক হস্তশিল্প ও কারুকলা সম্পর্কিত অসংখ্য চিত্রশোভিত একটি বই। কলকাতার রসিকমহলের কাছে জয়নুল আবেদীন নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। আবেদীনের বর্তমান অ্যালবামটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং তাঁর বলিষ্ঠ চিত্রাবলী পুনরায় দেখবার সুযোগ পেয়ে সুন্দরম্ অত্যন্ত আনন্দলাভ কোরেছে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক হস্তশিল্প ও কারুকলা বিষয়ক বইটি পাঠ কোরে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শিল্পীদের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। শিল্পী আবেদীনের অ্যালবাম এবং পাকিস্তানের হস্তশিল্প ও কারুকলা সম্পর্কিত বইটির কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি এই প্রসঙ্গে প্রকাশ কোরতে পেরে সুন্দরম্ তৃপ্তিলাভ কোরেছে।

আর-একটি কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাগরপারের শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শিল্প-কলা সম্পর্কিত সংবাদের স্বল্পতাহেতু খবরাখবর প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ভবিষ্যতে পাকিস্তানের শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে কোনো সংবাদ পেলে সুন্দরম্ অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ কোরবে।

শ্রীমতী উমা দাস, বাংলাদেশে অল্প যে ক'জন মহিলা-শিল্পী আছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। চিত্রাঙ্কন ছাড়া বয়নশিল্পেও তিনি অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আর্টিস্ট্ হাউসে তাঁর শিল্পকর্মের একটি উল্লেখ্য প্রদর্শনী চলছে। তাঁর শিল্পকৃতিসমূহের একটি বিশদ বিবরণ 'সুন্দরম্'-এর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশের বাসনা ছিল, কিন্তু সময় এবং পরিসরের স্বল্পতাহেতু সে বাসনা সাময়িকভাবে অপূর্ণ রাখতে হোয়েছে। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা শ্রীমতী দাসের শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে শিল্পানুরাগী পাঠকদের বিস্তৃত পরিচয় কোরিয়ে দেবার আশা রাখি।

দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী বরাভয় নিয়ে আসছেন বাঙালীর ঘরে। শরতের নির্মেঘ আকাশের নির্মল নীলিমায়, কাশের শুভ্র স্বচ্ছ হাসিতে, ভরা নদীর কলোচ্ছাসে, বিহগকুলের কাকলি-কুজনে আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষিত হচ্ছে। সমাসন্ন মাতৃপূজার পবিত্র লগ্নে বাঙালী পুনর্বার সমবেত হবে সখ্য-প্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে। জগন্মাতার কাছে সংগ্রামে বিজয় বরলাভের প্রার্থনায় মুখর হবে।

দেশবাসীর সেই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত করি।

অজস্র দুঃখ, অসংখ্য সমস্যায় তীব্র তিক্ত বাঙালীর জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠুক।

★

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ ॥

টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন

—লিমিটেড্—

বেলঘরিয়া—২৪ পরগণা।

Government Registered

SALE DEPOTS

AND

PRODUCTION CENTRE

DYE HOUSE

Addresses :

(1) School Bagan Road, Bolpur, Birbhum.

(2) 139A, Surendra Nath Banerjee Road (Opposite Regal Cinema), Calcutta-13.

(3) 85, Rash Behari Avenue, Calcutta-26.

In all our Sale depots we give Government Rebate.

* Interior decorator of 'Paschim Banga Khadi Kendra' as well as their chain shops all over West Bengal.

* Oldest organisation of decorating and furnishing fabric in West Bengal.

HANDLOOM TEXTILES

DOOR CURTAINS, SAREES, BED-COVERS, TABLE-CLOTHS, ETC.

ART OBJECTS

FLOWER VASES, IVORY CARVINGS, CERAMICS, BRASSWARES, AND TERRACOTTA TOYS, ETC.

HANDICRAFTS

LADIES HANDBAGS, HAND-PAINTED CALENDARS & GREETING CARDS, BATIK WORKS.

FOR INTERIOR DECORATION, FURNISHING AND ORIENTAL FURNITURE

Contact :

15B, CANAL STREET, ENTALLY,
CALCUTTA - 14
Phone: 24-3574

BOLPUR CO-OPERATIVE
CRAFTS & INDUSTRIES LTD.

জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ

কারণ

গুণে অতুলনীয়

বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ
সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

KALIPADA NATH & CO.

Khata, News Paper & Foreign Magazine Dealers

167 E. Rashbehari Avenue, Cal. - 19

JASHODA BHABAN.